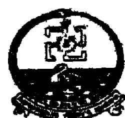


স্বামী অভেদানন্দ

(ফ্রাঞ্চ্ ডোরাক-কর্তৃক অঙ্কিত)

ভারতীয় সংস্কৃতি

স্বামী অভেদানন্দ



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক : স্বামী আত্মানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তৃতীয় সংস্করণ
অগ্রহায়ণ—১৩৬৪

কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা—৯
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ভারতের প্রাচীন গৌরব

এবং

জাতীয় স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে

গভীর সহৃদয়তা

এবং

ঐকান্তিক প্রার্থনা সহকারে

ভারতবাসীর করকমলে

উপহার।

ইহাতে শুধু তাঁহার বহুমুখী পাণ্ডিত্যই নয়, ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গিই বিশেষভাবে প্রকাশিত। ভারতের দিক্‌চক্রকে উদ্ভাসিত করিয়াই বিশ্ব-সভ্যতার প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল এবং ভারত হইতেই তাহা সমগ্র বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রীসদেশীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা ভারতীয় আদর্শের ছাঁচে গঠিত হইয়াছে এবং ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, শিল্প, ভাস্কর্য ও সকল-কিছুর বীজ ও প্রেরণাই ইহারা পাইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে—ইহাই স্বামিজী মহারাজের এই অভিনব পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিষয়ে কিরূপে একে অপরের কাছে ঋণী তাহা ভারতের বাণীমূর্তিরূপে স্বামী অভেদানন্দই বোধ হয় সর্বপ্রথমে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে ঐতিহাসিক প্রমাণের নজির উপস্থাপিত করিয়াছেন। অবশ্য ঠিক তাঁহারই পরে অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ পাশ্চাত্যবাসীর সম্মুখে *Eastern Religions and Western Thought* সম্বন্ধে (১৯৩৬-১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে) মনীষাপূর্ণ ও তুলনামূলক বক্তৃতা প্রদান করিয়া ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত *The Legacy of India* পুস্তকে পাশ্চাত্য মনীষী এইচ. জি. রলিন্‌সন্ (H. G. Rawlinson)-এর সুচিন্তিত *India in European Literature and Thought*—প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য।

স্বামী অভেদানন্দের নির্ভীক তেজস্বিতা ও স্পষ্টভাষণের উদাহরণও অতুলনীয়। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার অগ্রগতির দিক দিয়া চিন্তা করিলে চলিবে না, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের পঙ্গু ও অচল আবহাওয়ার কথাই আমাদের স্মরণ করিতে হইবে! স্বামী অভেদানন্দ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও পরাধীন ভারতবাসীরূপেই সেই সময় আমেরিকার স্বাধীন ও সভ্যসমাজে যেভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও শাসননীতির বিশ্লেষণ ও তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বদেশপ্রাণতা, অসীম সাহস, তেজস্বিতা ও সর্বোপরি নির্যাতিত ও অসহায় ভারতবাসীর প্রতি সমবেদনা ও নিবিড় ভালবাসার ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। আজিকার কথা ছাড়িয়া দিয়া ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের সমগ্র বিশ্বের সমাজে এবং বিশেষ করিয়া সে যুগে ভারত ও ভারত-

সাম্রাজ্যশাসকদের কঠোর আবেষ্টনী ও ক্ষুব্ধ দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া স্বামী অভেদানন্দের স্পষ্টভাষণের দুঃসাহসিকতা বিস্ময়েরই বিষয়! নিস্পৃহ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও লাঞ্ছিত ভারতবাসী হিসাবে তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতা-ভগ্নিগণের দুঃখ-কষ্টের অংশ গ্রহণকে তিনি মোটেই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও দেশের আকুলপ্রাণতাকে কোনদিনই অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই, বরং দেশপ্রেমিকতা ও বিশ্বমৈত্রীর অপূর্ব আলোকেই তাঁহার অন্তর চিরদিন সমুজ্জ্বল ছিল। প্রাচীন ভারতের গৌরবকাহিনী ও জাতীয় স্বাধীনতার পুনরুদ্‌বোধনের জন্য তিনি বরং এই পুস্তক ঐকান্তিক প্রার্থনায় ভারতবাসার করকমলেই উপহার প্রদান করিয়াছেন। স্বামিজী মহারাজের কল্যাণকামনা সর্বতোভাবে সার্থক হউক। ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ভারতের সুদিন আবার ফিরিয়া আসুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬
১০ই বৈশাখ ১৩৫৩

প্রকাশক

॥ তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন ॥

'ভারতীয় সংস্কৃতি'-গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হওয়ায় পুনরায় এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। স্বাধীন ভারতবাসী যে স্বামিজীর উপাদানপূর্ণ গ্রন্থটিকে আরো সশ্রদ্ধ সমাদর দান করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি! ভারতবর্ষ এখন পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত এবং এই মুক্তির জন্যই স্বামী অভেদানন্দজী আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে ভারতেরই একজন ব্যথিত নাগরিক-রূপে শাসক পাশ্চাত্যজাতির সম্মুখে ভারতের নগ্ন নিদারুণ কাহিনী ব্যক্ত করিয়া ভারতের মুক্তি-স্বাধীনতা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
কলিকাতা
৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

প্রকাশক

॥ ভূমিকা ॥

স্বামী অভেদানন্দ সম্প্রতি 'ব্রুকলীন ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অফ্‌ আর্টস্‌ য়্যাণ্ড সায়েন্সেস্‌' মন্দিরে যেসকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। এই সমস্ত বক্তৃতায় ভারতের সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অতি মূল্যবান বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমেরিকা যথার্থভাবে যে সকল বিষয় অবগত হইতে চাহেন এই সমস্ত বক্তৃতায় তাহা বিদ্যমান। ভারতবাসীর দ্বারা প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও এই বক্তৃতাগুলি বৈদেশিক সংস্কারের বর্ণলেপে অনুরঞ্জিত নহে। বক্তৃতাগুলিতে আমি যাহা পাইয়াছি তাহাতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, পাশ্চাত্যদেশের সভ্যতার প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া আমরা প্রাচ্য ভারত হইতে শিক্ষণীয় বিষয় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিতে পারি।

ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক,
২৬শে এপ্রিল, ১৯০৬

ফ্রাঙ্কলিন ডব্লিউ হুপার,
ব্রুকলীন ইন্‌ষ্টিটিউট
অফ্‌ আর্টস্‌ ও সায়েন্সেসের ডিরেক্টার

॥ অবতরণিকা ॥

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রথম ছয়টি প্রবন্ধ 'ব্রুকলীন ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্‌ আর্টস্‌ য়্যাণ্ড সায়েন্সেস্‌'-এ বক্তৃতাকারে পঠিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীবৃন্দ সম্বন্ধে আমেরিকাবাসীদের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহা দূরীভূত করিবার জন্য আমি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় সকল বিষয়ের তথ্য বিবৃত করিয়াছি এবং ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি হিন্দু, আমেরিকান এবং য়ুরোপীয় সুধীগণের উক্তি আমার বিবৃতির-স্বপক্ষে উদ্ধৃত করিয়াছি, এজন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট ঋণী। বিশেষতঃ মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই. মহোদয়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। তিনি তাঁহার রচিত 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতা', 'ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাস' এবং 'ভিক্টোরিয়া যুগের ভারতবর্ষ' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইংলণ্ডে থাকিয়া যে সকল মূল্যবান তথ্যরাজি অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে আমি তাহা আমার বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

নিউ ইয়র্ক
১০ই মে, ১৯০৬

গ্রন্থকার

ভারতীয় সংস্কৃতি

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

সম্বন্ধে ঋগ্বেদ ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অভিমত—মধ্যযুগে তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের অপরিণামদর্শিতা—'জাতিধর্ম' কি—হিন্দুগণ স্বার্থত্যাগপরায়ণ—সমাজের গোষ্ঠি এবং তাহার বিভাগ ও কর্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি—আরিয়ানরা যখন ভারত আক্রমণ করে তখন তাহারা অসভ্য ছিল না—মহাভারতে জাতির কথা—জাতি বিভাগ বংশ পরম্পরাগত হইয়াছে—তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব—বৌদ্ধধর্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবনতি ও ভারতে মুসলমান্ আক্রমণ—বর্তমান সামাজিক অবস্থা ও তাহার পরিবর্তন—ভারতে সামাজিক পুনসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে—বেদান্তের উদার ধর্মই ভারতের সমাজকে আবার নবশক্তি দান করিতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

হিন্দু সভ্যতার আদি ইতিহাস ঋগ্বেদে পাওয়া যায়—ভারতীয় সমাজে চারিবর্ণের কর্তব্য—রামায়ণ ও মহাভারতে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উল্লেখ—গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে ভারতের কথা—গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ—ভারতে কৃষি, শিক্ষা, শাসন ও সৈন্যবিভাগের সুব্যবস্থা ছিল—হিন্দুগণের মধ্যে যুদ্ধনীতি—মনু ও আপস্তম্বের সমাজশাসননীতি—মনুসংহিতা অনুসারে রাজার কর্তব্য—চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, হিয়েন-সাঙ ও তাঁহাদের লিখিত ভারতের বিবরণ—ভারতের পল্লীতে পঞ্চায়েৎ-প্রথা—ভারতের সমাজশৃঙ্খলা ও স্যার মনিয়ার উইলিয়ামস্—৬০০ শত বৎসরব্যাপী মুসলমান-শাসনের সময় রাজনৈতিক সত্যসমূহ অক্ষতই ছিল—ভারতীয় ও ইংরাজশাসন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরাজ বণিকগণ—লর্ড ক্লাইভ ও মোগলরাজ—ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত—লর্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নীতি—১৭৭০ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষ—১৮৮০ ও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কমিশন—বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দুর্ভিক্ষের বিবরণ—দুর্ভিক্ষ-কমিশনের সভাপতি স্যার ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সেই সময়ে বিবৃতি—গভর্ণর-

গভর্ণমেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া—১৮২২ খৃষ্টাব্দে স্যার টমাস মনরো—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের শাসন কর্তা লর্ড এল্‌ফিন্‌ষ্টোন—পল্লী-অঞ্চলে 'পাঠশালা'-র প্রবর্তন—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে পাচিয়াপ্পা কলেজ—আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অক্‌লাণ্ড—নারীশিক্ষার প্রবর্তন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিষ্ঠান—১৯০১ খৃষ্টাব্দে লোকগণনার হিসাব অনুসারে শিক্ষার হারের বিবরণ—অবৈতনিক শিক্ষার বিস্তারে অসম্মতি রেভারেণ্ড সাণ্ডারল্যাণ্ড ও ভারতীয় শিক্ষা—লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিল্'—ভারতবর্ষ শিক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, সে ইউরোপ ও আমেরিকা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়—পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্য ভারতবাসী ইংরাজ সরকারের নিকট ঋণী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা—

একের উপর অন্যের প্রভাব পৃ° ২২১—২৭০

ভারতবর্ষই ভারতীয় সভ্যতার জন্মভূমি—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 'প্লিনী, ষ্ট্রাবো, মেগাস্থিনিস, হিরোডোটাস, পরফাইরি এবং অন্যান্য মনীষীগণের ঐতিহাসিক বিবরণ—পিথাগোরাসের ভারতে আগমন—ইজিপ্টবাসী ও গ্রীকগণ সৃষ্টিসম্বন্ধে চারিটী মূল উপাদান স্বীকার করিতেন—গ্রীকগণ ও আরববাসিগণ সংখ্যাবিজ্ঞান ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন—বীজগণিত সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবাসী ভারতের নিকট ঋণী—লিওনার্ড দা পিসা প্রথমে ইউরোপে বীজগণিত প্রবর্তন করেন—ভাস্করাচার্য ও বীজগণিত—চীন ও আরববাসিগণ ভারত হইতে অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন—সঙ্গীতবিদ্যার জন্মভূমি ভারত—ভারতই পাশ্চাত্য জগৎকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছে —হিন্দুজাতি সম্বন্ধে হেরোডোটাস, সক্রেতিশ, প্লেটো ও প্রোঃ গ্রীগস্— প্লেটো ও উপনিষৎ—য়্যারিষ্টটল ও হিন্দু ন্যায়দর্শন—থেলিস্, পার্মেনাইডেস্ ও ইলিয়াটিক মতবাদ—এনাকসামেনডার ও হেরাক্লিটাস ভারতের নিকট

ঋণী—পরফাইরির বিবরণ—প্রোঃ গার্বে ও নিও-প্লেটোনিজম্—ফাইলো জুডিয়া ও ভারতীয় দর্শন—শব্দব্রহ্ম (Logos)-তত্ত্ব খৃষ্টানগণ ভারত হইতে পাইয়াছেন—বৌদ্ধযুগে সম্রাট অশোক ও বৌদ্ধ প্রচারকগণ—খৃষ্টান ঐতিহাসিক মাহাফি—ইহুদীয় ধর্মসম্প্রদায় এসিনী—সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও ইজিপ্টে বৌদ্ধ শ্রমণগণ—বৌদ্ধ প্রচারকগণের প্রভাবে এসিনীসম্প্রদায়ের উৎপত্তি—জন. দি. ব্যাপটিষ্ট্ এসিনী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন—ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ ও বৌদ্ধ অনুষ্ঠান—সিনপ্টিক্ গস্‌পেল অনুসারে যীশুখৃষ্টের জীবনী—কুমারী মেরী ও যীশুর অলৌকিক জন্ম—অবতারবাদ হিন্দুর তথা ভারতের নিজস্ব—যীশুখৃষ্ট ও বুদ্ধ—রোমান ক্যাথলিক, নস্‌টিক্‌স্ ও ম্যানিসিয়ান্ ধর্ম-সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে উৎপন্ন—অরিগেন ও জাষ্টিনিয়ান—কারাইটিস্ ও অন্যান্য ইহুদী-সম্প্রদায়—পাণিনি ও তাঁহার ব্যাকরণ—সোপেনহায়ারের দার্শনিক মতবাদ বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক ধর্মের নিকট ঋণী—দারাসিকো ও উপনিষৎ—কর্লাইল, চার্লস উইল্‌কিন্স, এমার্সন ও গীতা—যীশুখৃষ্ট, থোরো ও বেদান্ত—মিসেস এডি ও ভগবদ্গীতা—পর্তুগীজ ও ডাচ্ খৃষ্টানগণ—চীন, জাপান, তিব্বত ও বর্মায় বৌদ্ধধর্ম—তাও এবং কন্‌ফুসিয়াসের ধর্মে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব—পারসিক ও ভারতবাসী—সভ্যতার বীজ ও কেন্দ্রই ধর্ম—খৃষ্টান সভ্যতার নিকট ভারত কতটুকু ঋণী—ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে ভারতীয় সভ্যতার রূপ।

প্রথম পরিশিষ্ট

(১৯০৬—১৯২৮)

ভারতের ইতিহাসে সঙ্কটময় পরিবর্ত্তন—অসহায় প্রজাপুঞ্জ ও রাজশক্তি—শিক্ষাবিভাগের পরিবর্ত্তন ও তাহার পরিচয়—১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার বিবরণ—১৯০৬—১৯০৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগে সরকারের ব্যয়—মিঃ কোটম্যানের বিবৃতি—১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহামতি গোখলে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যার এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার আইন—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে

সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্যার স্যাডলার, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর জীয়াউদ্দিন আহম্মদ প্রভৃতিকে লইয়া গঠিত 'কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন'—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীদের হার—স্যাডলার কমিশনের মন্তব্য—১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার তারকনাথ পালিত প্রভৃতির বদান্যতা ও প্রচেষ্টা—এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা—আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়—পাটনা, রেঙ্গুন, ঢাকা, দিল্লী, নাগপুর, অন্ধ্র ও আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—'বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন' (বোলপুর), 'গুরুকুল' ও 'সবরমতি' শিক্ষাকেন্দ্র, দাক্ষিণাত্যে অধ্যাপক কার্ভের 'নারী-বিশ্ববিদ্যালয়'—১৯০৪ খৃষ্টাব্দ ও লর্ড কার্জ্জন—১৩১২ সালে 'রাখীবন্ধন'—ভারতে নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার—লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত—স্বাধীনতা ও ডক্টর অ্যানি বেশান্ত—মহাত্মা গান্ধী ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন—জালিনওয়ালাবাগ ও জেনারেল ডায়ার—মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপত রায় ও স্বরাজ আন্দোলন—১৯২৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসের আন্দোলন—লিগ্ অফ্ নেশন ও ভারতীয় স্বাধীনতা—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের ঘোষণা ও নীতি—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সাইমন কমিশন বর্জ্জন—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও বিশ্বের দরবারে কংগ্রেসের বাণী।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার ধ্বংসাবশেষ—আদিম অধিবাসী ও তাহাদের বিবরণ—সিন্ধু-উপত্যকায় শ্বেতকায় মানব—অসুর ও দাস জাতি—পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের অভিমত—'আরিয়ানদের ভারতে আগমন—শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিন্ধু-উপত্যকার খননকার্য—প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমত—ইষ্টকনির্মিত বাড়ী, পয়ঃপ্রণালী, স্নানগৃহ প্রভৃতির আবিষ্কার—

সিন্ধুনগরবাসিগণ সোনা, রূপা ও তামার কাজ জানিত—শ্রমশিল্প ও কারুকার্য—লিপিমালা ও চিত্রাক্ষর—আরিয়ানরা বৈদিক নহে—রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ও ফাদার হেরাস্‌এর অভিমত—সিন্ধু-উপত্যকার শব-সৎকার প্রথা সম্বন্ধে—ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নৃতত্ত্ববিদ্‌ ও সমাজতাত্ত্বিকগণের অভিমত—দ্রাবিড়গণ বিশ্বামিত্রের বংশধর—দ্রবদিড়ম্‌সাম—'পণি' বণিক—সুমেরিয়ায় গর্দ্দভবাহিত গাড়ী—স্যার জন্‌ মার্শাল ও সিন্ধু-উপত্যকায় বৈদিক দেবতা—বৃক্ষ-উপাসনা বৈদিক—শিবলিঙ্গ তথা বৈদিক উপাসনা—শিব কে? মহেঞ্জোদড়ো শীল ও নারীমূর্ত্তি—অদিতি ও গৌরীপট্ট—লিঙ্গপুরাণে 'সুরতরু' যূপ-উপাসনা হিন্দুসমাজে বর্ত্তমান ছিল—গরুড়ধ্বজ বা গরুড়স্তম্ভ—বৈদিক যূপ ও শিবলিঙ্গের বিভিন্ন আকৃতি—শিবোপাসনা ও জ্যোতিঃবৃক্ষ—মহেঞ্জোদড়োয় পশুর উপাসনা—ইউনিকর্ণ ও সূর্য—আর্যগণই সিন্ধু-সভ্যতার মূল প্রবর্তক—'আর্য' শব্দে কি বুঝায়—সিন্ধু-উপত্যকায় সাংস্কৃতিক ধারা—মহেঞ্জোদড়ো নগরীর ধ্বংসের কারণ কি—দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য—প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা এখনও হিন্দুসমাজে বর্তমান।

ভারতীয় সংস্কৃতি

প্রথম অধ্যায়

॥ ভারতবর্ষের দার্শনিক মতবাদসমূহ ॥

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহুশতাব্দী পূর্বে এমনকি ইহুদী ধর্মের প্রবক্তা মূশার অভ্যুদয় ও ধর্মপ্রচার কালেরও[১] বহুশত বৎসর পূর্বে—যে সময়ে এখনকার অ্যাংলো-স্যাকসন জাতিদের পর্বতগুহাবাসী ও অরণ্যচারী পূর্বপুরুষগণ নানা প্রকার বর্ণে নিজেদের দেহে উলকি পরিয়া কাঁচা মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করিত এবং পশুচর্মের দ্বারা দেহকে আচ্ছাদন করিত, সেই সুদূর অতীতে ভারতের দিকচক্র উদ্ভাসিত করিয়া সভ্যতার উদ্ভিন্ন আলোক দেখা দিয়াছিল। যখন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির আপন

১। বর্তমান কালের প্রখ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদদের মতানুসারে ইহুদী ধর্মের প্রবক্তা ও সমাজশাস্ত্রপ্রণেতা মূশার অবস্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দী। এ সম্বন্ধে ইহুদীজাতির ধর্মমত ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর ক্যুয়েনেন লিখিয়াছেন :

"মিশর দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া মূশার নেতৃত্বে আপনাদের বাসস্থান অন্বেষণের জন্য ইহুদীদের অন্য দেশ গমন (Exodus) সম্বন্ধে একজন মনীষী বলেন, এই ঘটনার কাল ১৩২১ খৃষ্টপূর্বাব্দ। ইহা ছাড়া অন্য দুইজন পণ্ডিতের এ সম্বন্ধে অভিমত যে, ঐ ঘটনার কাল যথাক্রমে ১৩২০ এবং ১৩১৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ। অবশ্য এই ঘটনার সঠিক সময় নির্ণয় করা অসম্ভব। এই সকল বিভিন্ন মত সত্ত্বেও আমার বিশ্বাস যে, খুব সম্ভবতঃ ১৩২০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ইহুদীরা মিশর হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল।"

—ডক্টর ক্যুয়েনেন প্রণীত *Religion of Israel* নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বজাতি যাযাবর ইহুদীদিগের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মুশা জাভেজ্ (Jahveh) প্রদত্ত দশবিধ আদেশবাণী (Ten Commandments) প্রচার করা হয় তাহারও বহুকাল পূর্বে প্রাচীন বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের আর্য ঋষিগণের দ্বারা সর্বোচ্চ আদর্শের নীতিবিজ্ঞান রচিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দ এই নীতিবিজ্ঞানের উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহা সাধন ও প্রচার করিবার জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ক্যালডিয়া, ফিনিসিয়া, ব্যাবিলোনিয়া ও পারস্যবাসিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় উপকথাসমূহ দ্বারা মানবজাতির উৎপত্তি ও বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনায় সেমিটিক জাতীয় পণ্ডিতেরা যে সময়ে নিরত ছিলেন, সেই সময়েরও পূর্বে ভারতবর্ষে দার্শনিক মনীষিগণ এক আদ্যাশক্তি প্রকৃতি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্রমবিকাশ এবং নিতান্ত নিম্ন-শ্রেণীর জীব অভিব্যক্তির ক্রমিক নিয়মানুসারে মানবত্বের স্তরে উন্নীত হয়—এই বৈজ্ঞানিক মত প্রচার করিয়াছিলেন।

ভারতের বাহিরে অনেক দেশের লোকেদের ধারণা যে, ভারতবাসীরা (হিন্দুরা) পুতুল-পূজক হিদেন্, ইহাদের নিজস্ব কোন দর্শনশাস্ত্র, নীতিগ্রন্থ, বিজ্ঞান অথবা ধর্মপুস্তক নাই এবং খৃষ্টান মিশনারীদের অনুগ্রহের ফলেই নাকি এ বিষয়ে তাহারা যাহা কিছু শিখিয়াছে। কিন্তু ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশে চিকাগো মহানগরীতে জগতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের বিরাট সম্মিলন হওয়ার ফলে সেইদিন হইতে এ দেশের (আমেরিকার) শিক্ষিত নরনারীর মন হইতে উক্ত ভ্রান্ত ধারণা চলিয়া গিয়াছে। বরং তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, একমাত্র ভারতবর্ষই পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের প্রথম ও প্রকৃত উৎপত্তির স্থান। ভারতবর্ষ হইতেই সর্বপ্রথম জগতের সকল প্রকার ধর্মবিশ্বাস উদ্ভূত হইয়াছে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলার এবং ডক্টর পল্ ডয়সেন্ প্রমুখ প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ পাশ্চাত্য মনীষিগণ এবং আমেরিকার শিক্ষিত সমাজ এখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে এক মহান দার্শনিক জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। প্রাচীন অথবা আধুনিক যে কোন প্রকার দার্শনিক মতবাদ হউক না কেন এখনও পর্যন্ত তাহাদের সন্ধান ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় দার্শনিক মতবাদ সমূহের ইতিহাস সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ ও সুবিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক ভিক্তর কঁজি (Victor Cousin) লিখিয়াছেন ঃ

"প্রাচ্য মহাদেশের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গৌরবময় অমর রচনাবলী বর্তমানে ইউরোপে ক্রমশঃই প্রচারিত হইতেছে যে সকল পাঠ করিলে আমরা তাহাদের মধ্যে এমন গভীর ও মহান সত্যসকল দেখিতে পাই যে, ইউরোপীয় প্রতিভাপ্রসূত রচনাসমূহও তাহাদের তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তুলনা করিয়া দেখা যায়—ইউরোপীয়দের এই সব লেখা ভারতীয় মনীষিদের রচনা-পদ্ধতির সহিত অনেক স্থানেই অগ্রসর হইতে পারে নাই। সেইজন্য আমরা মানব-সভ্যতার ও উচ্চশ্রেণীর দর্শনশাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া প্রাচ্য মহাদেশের নিকট শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ি।"[১]

ইহা ছাড়া তিনি অন্য একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

"সর্ববিধ দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের সারমর্ম ভারতেই বর্তমান।"

আপনারা দেখিতে পাইবেন, ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোন দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র কোনও দেশের অধিবাসীদের জাতীয় জীবনে এমন সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষই একমাত্র স্থান যেখানে

১। *Works of Victor Cousin, Vol. I, p. 32.*

যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে রাজ্যশাসনকারী নৃপতি-বর্গের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধর্মসংঘ, দার্শনিক সভা ও জন-সম্মিলনের অধিবেশন হইত। এই সভায় কেবলমাত্র ধর্মযাজক, পুরোহিত, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণই যোগ দিতেন না, পরন্তু বহু রাজা, সেনাপতি এবং সৈনিকগণ, বণিক ও কৃষকসকল—এমন কি উচ্চশ্রেণীর বিদুষী মহিলারাও এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্যে অংশ গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ সহস্র বৎসর হইতে দুই সহস্র বৎসর পর্যন্ত এই কালের মধ্যে যোগসাধনার ফলে শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ভারতের প্রাচীন ঋষিবৃন্দ এমন সব প্রয়োজনীয় নিগূঢ় প্রশ্ন অনুশীলন করিতেন, যাহা সকল যুগের দার্শনিক পণ্ডিতগণের মনকে বিশেষভাবে আলোড়ন করিয়া থাকে। ঐ সকল প্রশ্ন হইতে জানা যায়, ভারতের ঋষিবৃন্দের কী অদ্ভুত মনীষা ছিল এবং যে কোন পদার্থের মূলতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিষয়ে তাঁহারা কী প্রকার জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ "যখন মৃত্যু সকল বস্তুকে গ্রাস করে, মৃত্যুকে তখন কোন্ দেবতা গ্রাস করিবেন ? মানুষের মধ্যে এমন কোন্ অংশবিশেষ আছে যাহা দেহ ধ্বংস হইয়া গেলেও নষ্ট হইয়া যায় না ? দেহত্যাগের পর মানুষের প্রাণশক্তির কী অবস্থা হয় ? আত্মার স্বরূপ কী ? জীবের প্রকৃত স্বরূপ কী ? সমস্ত বস্তু যাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথচ যাহা সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাহা কী ?"[২]

২। বিদেহ জনকরাজার যজ্ঞসভায় আর্তভাগ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে এই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ 'যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদিদং সর্বং মৃত্যোরন্নং কা স্বিৎ সা দেবতা যস্যা মৃত্যুরন্নমিতি।'—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।২।১০। আর্তভাগ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ঃ 'যজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি।'—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।২।১১

এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও সমাধান কালে প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ ন্যায়ের যুক্তি ও তর্কবিচারপ্রণালী আবিষ্কার করেন এবং প্রতিপদে এই প্রণালী পরিচালিত আপনাদের চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বনে বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই উন্নত বিচারবুদ্ধি হইতেই ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্রের সূচনা। এই সকল সত্যান্বেষীদের মন সর্বতোভাবে অযৌক্তিক আচার-অনুষ্ঠান, মতবাদ, গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত ছিল। কোন প্রকার ধর্মমতে অথবা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (সগুণ) ঈশ্বরে কাহারও বিশ্বাস আছে কি-না—এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহারা কখনও কাহাকেও প্রশ্ন করেন নাই। কী উপায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে যথার্থভাবে জানা যায়, জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ কী এবং জন্মমৃত্যুর সমস্যা সমাধান কেমন করিয়া করা যায় —এই সমস্তই ছিল তাঁহাদের প্রধান প্রশ্ন। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবেশে সক্রিয়ভাবে যাবতীয় আধ্যাত্মিক, দার্শনিক আলোচনা ও বিচার প্রবল আকারে দেখা দিয়াছিল। সেই প্রাচীনকালে এই সকল প্রশ্নের উত্তর ভারতের নির্মলচিত্ত দার্শনিক মনীষিগণ কর্তৃক যেভাবে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। মনে হয় ভারতের এই প্রাচীন মনীষিগণ প্লেটো (Palto), স্পিনোজা (Spinoza), বার্কলে (Berkeley),

'অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষেতি।' —বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৩।৫।১

এই দার্শনিক বিচারসভায় তৎকালীন বহু ঋষি, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, এবং বচক্নুতনয়া ব্রহ্মবাদিনী গার্গী প্রভৃতি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দর্শন ও ধর্মসম্বন্ধীয় বহু দুরূহ জটিল প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

হিউম (Hume), হেগেল (Hegel), সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer), হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), হেকেল (Haeckel) প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত তাঁহাদের জন্মগ্রহণের বহুশতাব্দীপূর্বেই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে ভারতবর্ষে বহুপ্রকার দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল, যথা, নিরীশ্বরবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, শূন্যবাদ ও জড়বাদ। ইহা ছাড়া বহুদেববাদ, দ্বৈতবাত, একেশ্বরবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, প্রেততত্ত্ববাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতিও ছিল। বর্তমানে এই মতগুলিকে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের দার্শনিকগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপরিণামি সত্তা কী, তাহা জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় ঘটনার আদি কারণ কী? মানবজীবনের পুরুষার্থ কোথায়? জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কী? এই সকল প্রশ্নই ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুদের আলোচনার বিষয় ছিল। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক মনীষিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ঐকান্তিকভাবে সত্যান্বেষী ছিলেন। সত্যান্বেষণের তীব্র অভিলাষ ও অবিশ্রান্ত অনুরাগের দ্বারা চালিত হইয়া এবং কোনপ্রকার নির্যাতন ভয়ে ভীত না হইয়া তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ আবিষ্কার ও তাহাদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে সকল শ্রেণীর মানবেরই চিরকাল চিন্তার স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল।

বৈচিত্র্যশীল এই জগৎ ও তাহার অন্তর্গত নানাপ্রকার বস্তু যে একই মূল পদার্থ হইতে ক্রমিক অভিব্যক্তির ফলেই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে এ তত্ত্ব সত্যদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। একই সময়ে যাবতীয় জীব ও জড়বস্তুসকল শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে

—এই প্রকার অবৈজ্ঞানিক মত তাঁহারা সমর্থন করেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের একস্থানে জনৈক ঋষি তাঁহার পুত্রকে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির রহস্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "হে সৌম্য, অনেকেরই বিশ্বাস শূন্য অথবা অবস্তু হইতে এই জগতের উৎপত্তি। কিন্তু তুমি কি বলিতে পার কেমন করিয়া অবস্তু (অনস্তিত্ব) হইতে বস্তুর (অস্তিত্বের) উৎপত্তি সম্ভব?"[৩] উপনিষদের এই বাণী হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়, ইহুদীদিগের ন্যায় প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণ নিয়ম ও শৃঙ্খলাপূর্ণ এই বর্তমান জগতের শূন্য (অনস্তিত্ব) হইতে হঠাৎ এক দিনেই উদ্ভব—এই যুক্তিহীন মতকে স্বীকার করেন নাই। বরং তাঁহারা জগতের ক্রমিক অভিব্যক্তির নিয়মকেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অনেকে প্রায়ই এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই ক্রমিক অভিব্যক্তির দার্শনিক মতবাদ পাশ্চাত্ত্য দেশের আধুনিক মনীষীদের প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন; প্রাচীনযুগে ইহা নাকি কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু যাঁহারা বেদ প্রভৃতি হিন্দুদের প্রাচীন রচনাবলী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন এ রহস্য হিন্দুরা প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই অবগত ছিলেন।[৪] অধ্যাপক হাক্সলেও ইহা সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন: "হিন্দুগণের কথা আর কি বলিব, পল অফ টারসুসের (Paul of Tarsus) বহুযুগ পূর্বে ইহারা ক্রমবিকাশবাদের

৩। 'তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত। কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি।'

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।২।১।২

৪। 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ।'—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, ব্রহ্মানন্দবল্লী।

বৈজ্ঞানিক নিয়মসম্বন্ধে অবগত ছিলেন।"[৫] স্যার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ামস্ (Sir Monier Monier Williams) তাঁহার *Brahminism and Hinduism* নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন: "বাস্তবিক যদিও আমাকে কালাতিক্রমদোষে (anachronism) দোষী বলা হয়, তাহা হইলেও আমি বলিব, স্পিনোজার (Spinoza) জন্মগ্রহণের দুই সহস্র বৎসর পূর্বেও স্পিনোজার এবং ডারুইনের (Charles Darwin) বহু শতাব্দী পূর্বেও ডারুইনের সিদ্ধান্ত হিন্দুরা অবগত ছিলেন। যে কোনও দেশের যে কোনও ভাষায় জগতের 'ক্রমিক অভিব্যক্তিবাদ' বা 'evolution' এই শব্দ উদ্ভাবিত হইবার বহু পূর্বে এবং আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত হইবার বহু শতাব্দী পূর্বে হিন্দু মনীষিগণ ক্রমিক অভিব্যক্তিবাদের দার্শনিক তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন।"[৬] এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। যদি আমরা ভারতের পূর্বকালীন ঋষিদের স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তায় উদ্ভাবিত দার্শনিক তত্ত্বসকল বিচার করিয়া দেখি তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, দার্শনিক চিন্তার সমগ্র ইতিহাসে যে সকল অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সে সব তাঁহাদের জানা ছিল।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই দৃশ্যমান জগতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য ভারতের ঋষিবৃন্দের জিজ্ঞাসু মনে যে সমস্ত সমস্যা ও সমাধান দেখা দিয়াছিল তাহারই ফলে ষড়দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দর্শনশাস্ত্রগুলির আবার প্রত্যেকটির বহু শাখা ও প্রশাখা আছে। বৈশেষিকদর্শন-প্রণেতা মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন: অণু ও পরমাণুর সংযোগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে

৫। Tyndal Huxley : *Soience and Hebrew Tradition*, —P. 150.

৬। Sir M. M. Williams : *Brahminism and Hinduism*

ছয়টি পৃথক্ পৃথক পদার্থে বিভক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎ এবং জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উক্ত পদার্থগুলি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সে পদার্থগুলি যথাক্রমে: (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য অর্থাৎ জাতি, (৫) বিশেষ—যাহা পদার্থের একত্ব বা এক পদার্থের অন্য হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন করে, (৬) সমবায় বা নিত্যসম্বন্ধ, অর্থাৎ অবিভাজ্যত্ব।[৭] কাহারও কাহারও মতে অভাব অর্থাৎ অনস্তিত্ব হইল সপ্তম পদার্থ। ইহাদিগের প্রত্যেকটি আবার বহুভাগে, বিভক্ত, যথা, দ্রব্য নয় প্রকার: (১) ক্ষিতি, (২) অপ্, (৩) তেজঃ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল, (৭) দিক, অর্থাৎ স্থান, (৮) আত্মা, (৯) মন।[৮] গুণ ভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। এই সকল পদার্থ গুণযুক্ত। গুণ চতুর্বিংশতি প্রকার। যথা: রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, ব্যাপকত্ব বা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম, এবং শব্দ।[৯] পদার্থসকল পাঁচ প্রকার কর্মের অধীন। যথা: (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমনশীলতা।[১০] যাহাই জ্ঞানগ্রাহ্য তাহাই পদার্থ, গুণ কিংবা কর্ম। সামান্য দ্বিবিধ: পর ও অপর। তন্মধ্যে যাহা দ্রব্যগুণে

৭। 'ধর্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং **।
—বৈশেষিক ১।৪

৮। 'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।'
—বৈশেষিক ১।৫

৯। 'রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথকত্বং সংযোগবিভাগৌ পরাত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ।'—বৈশেষিক ১।৬

১০। 'উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং গমনমিতি কর্মাণি।'
—বৈশেষিক ১।৭

সমবেত অথবা গুণকর্মে সমবেত হইয়া আছে, সেই সত্তার নাম 'পর'। 'অপর' এই শব্দের দ্বারা দ্রব্যত্বাদি বুঝায়।[১১] বিশেষ সকলের অন্ত নাই। সমবায়ের কোনও দ্বিতীয়ত্ব নাই, উহা একটীমাত্র।

মহর্ষি কণাদের মতে প্রথম চারিটি সমষ্টি পদার্থ বলিয়া ধ্বংসপ্রবণ। কিন্তু তাহাদের উপাদান সূক্ষ্ম ও দৃষ্টির অগোচর অণুগুলি নিত্য। তাহারা জৈব, অজৈব, উদ্ভিজ্জ অথবা ধাতব পদার্থের উপাদানস্বরূপ, অথবা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভবের যন্ত্রস্বরূপ। মহর্ষি কণাদের মতানুসারে অণুসকল পদার্থের অবিভাজ্য অংশ। দৃষ্টিশক্তির গোচর হওয়ার মত আয়তন ইহাদের নাই। এ বিষয়ে তিনি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের সহিত একমত। গ্রীক দার্শনিকদিগের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার মত ভিন্ন। কেন না গ্রীক দার্শনিকগণ অণুসকলকে চক্ষুর গোচর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ দুইটি অণুর সংযোগে যাহা গঠিত তাহাও চক্ষুর অগোচর। ইহাকে দ্ব্যণুক বলা হয়। এইরূপ তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে যে ত্রসরেণু গঠিত হয়, তাহার দৃষ্টিগোচর হইবার ব্যাপকতা বা আয়তন আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়াছেন। অণুসকলের এই সমষ্টি ধ্বংসশীল ও অনিত্য, কিন্তু ইহাদের যাহা অবিভাজ্য উপাদান সেই অণুসকল সূক্ষ্ম ও নিত্য।

প্রাচীন গ্রীসদেশবাসী এম্‌পিডোক্লিস্ (Empedocles) ও ডিমো-ক্রিটাসের (Democretus) বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতের মনীষীদের দ্বারা আবিষ্কৃত এই অণু-পরমাণুর তত্ত্ব যে কত বিস্ময়কর, তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখেন ? পরমাণুবাদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের আধুনিকতম

১১। 'সামান্যং দ্বিবিধং পরমপরং চ। তত্র পরং সত্তা অপরং সত্তা-ব্যাপ্যং দ্রব্যত্বাদি।—উপস্কার

"তত্র পরসামান্যং সত্তা। দ্রব্যত্বাদিকং তু পরসামান্যম্।—বিবৃতি

সিদ্ধান্ত প্রাচীন ভারতের সিদ্ধান্তকে একপদও অতিক্রম করিতে পারে নাই।

পরমাণুসকল ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট নয়, ইহাই বৈশেষিকদর্শনের উক্তি। এই পরমাণুগুলিও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য ও সনাতন। কিন্তু যে শক্তিবলে এই পরমাণুগুলি একসঙ্গে সংযুক্ত হয় সেই শক্তি ঈশ্বরের। ঈশ্বর সগুণ, জ্ঞানময়, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র প্রভু ও নিয়ন্তা। এই দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে আকাশ, কাল, দিক, আত্মা এবং মন বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত নিত্য পদার্থ। কণাদের মতে মন অণুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম পদার্থ।[১২] কিন্তু ইহা সর্বব্যাপী আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। মন এবং আত্মা নিত্য হইলেও অসংখ্য।[১৩] আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক। ইহা বুদ্ধি (জ্ঞান), সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম—এই নয়টি গুণযুক্ত। পঞ্চম পদার্থ 'বিশেষ' এই শব্দ হইতেই বৈশেষিকদর্শনের নামকরণ করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগৎপ্রপঞ্চের কারণ পরম্পরার প্রকৃত জ্ঞানলাভ দ্বারা সিদ্ধি ও মুক্তিলাভই বৈশেষিকদর্শনের লক্ষ্য।

বৈশেষিকদর্শনের পর মহর্ষি গৌতমের ন্যায়দর্শন। যদিও সাধারণতঃ ন্যায়দর্শনকে তর্কবিচারপ্রণালীর শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা হয় তথাপি ইহা একাধারে তর্কশাস্ত্র এবং দর্শন। অন্যান্য হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের ন্যায় জড়জগৎ, আত্মা এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান ও চরম মুক্তিলাভই

১২। জীবাত্মা এবং সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষের কারকের নাম মন।

১৩। 'ব্যবস্থাতো নানা।—(বৈশেষিক ৩।২।২০)। জ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্য আত্মা। আত্মা দুই প্রকার—পরমাত্মা বা ঈশ্বর ও জীবাত্মা। ক্ষিতি ও অঙ্কুরাদির কর্তারূপে ঈশ্বর অনুমেয়। জীবাত্মা এক নহে, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন।

ইহার উদ্দেশ্য। যদিও মহর্ষি কণাদের পরমাণুবাদের উপর এই ন্যায়দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত তথাপি ষোলটি বিচার্য পদার্থের আলোচনায় ইহার সূচনা করা হইয়াছে। সেই ষোলটি পদার্থ যথাক্রমে: (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন, (৭) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প অর্থাৎ কুতর্ক, (১২) বিতণ্ডা অর্থাৎ আপত্তি, (১৩) হেত্বাভাস (fallacy) অর্থাৎ ভ্রান্তযুক্তি, (১৪) ছল, (১৫) জাতি অর্থাৎ ভ্রমাত্মক সাদৃশ্য এবং (১৬) নিগ্রহস্থান অর্থাৎ তর্কে অসামর্থ্য।[১৪] ইহাদের প্রত্যেকটির অভ্রান্ত তত্ত্বনির্ণয়ই ন্যায়শাস্ত্রের লক্ষ্য। গৌতমের মতে জ্ঞানের উপায় চারিটি: (১) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতি, (২) অনুমান, (৩) উপমান বা সাদৃশ্য এবং (৪) শব্দ বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ বাচনিক প্রমাণ।[১৫]

জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থের সংখ্যা দ্বাদশটি যথা: আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়, বুদ্ধি, মন, ইচ্ছা (প্রবৃত্তি), দোষ, প্রেত্যাবস্থা, প্রতিক্রিয়া, দুঃখ এবং অপবর্গ (মুক্তি)।[১৬] এই সকল পদার্থ এবং জ্ঞানের উপায়সমূহ প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র ও বিশদভাবে ন্যায়ের মূলনীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট পদার্থগুলি তাঁহার ন্যায়দর্শন বা তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত। তর্কশাস্ত্রে ইহাদের সম্বন্ধে

১৪। 'প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।'
—ন্যায়দর্শন ১।১

১৫। 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃপ্রমাণানি।'—ন্যায়দর্শন ১।৩

১৬। 'আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।'—ন্যায়দর্শন ১।৯

বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেইজন্যই ন্যায়শাস্ত্র একাধারে তর্ক ও দর্শনের শাস্ত্র। গৌতম 'ভারতের য়্যারিষ্টটল্' বলিয়া অভিহিত। তিনিই হিন্দু তর্কশাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তক। তাঁহার প্রবর্তিত তর্ক-প্রণালীই কালক্রমে একটি সম্পূর্ণ তর্কশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত হিন্দু নৈয়ায়িকগণ অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুলিখিত বহু গ্রন্থ রচনার দ্বারা ইহার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। গৌতম-প্রণীত ন্যায়শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—যুক্তি-বিচারের একটি অভ্রান্ত প্রণালী স্থাপন এবং অবয়ব বাক্য (Syllogism) রচনার দ্বারা নির্ভুল সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন। হিন্দু ন্যায়ের অবয়ব-বাক্যাবলী পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা: (১) প্রতিজ্ঞা, (২) হেতু, (৩) উদাহরণ, (৪) উপনয় এবং (৫) নিগমন।[১৭] ইহা হইতে দুইটি অংশ বাদ দিলে য়্যারিষ্টটলের (Aristotle) অবয়ব-বাক্যাবলীতে পরিণত হয়। য়্যারিষ্টটলের অবয়র-বাক্যের মূল বাক্যের সংযোগকে হিন্দু-তর্কশাস্ত্রে 'ব্যাপ্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নিত্য সহচরজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। মিষ্টার ডেভিস্ (Mr. Davies) হিন্দুদের তর্কশাস্ত্রসম্বন্ধে বলিয়াছেন: "যুক্তি-তর্কের নিয়মগুলি হিন্দু তর্কশাস্ত্রকারগণ পাশ্চাত্ত্য নৈয়ায়িকগণের ন্যায় অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।" ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকে গৌতম-প্রণীত তর্কশাস্ত্র এবং গ্রীক তর্কশাস্ত্রের এই প্রকার সাদৃশ্য দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীকগণ তর্ক ও দর্শনশাস্ত্রের মূল নিয়মগুলি হিন্দুদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন:

"সময়ের পূর্বাপরবৃত্তান্ত লক্ষ্য রাখিয়া মত প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, হিন্দুগণ তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবক, তবে

১৭। 'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ।—ন্যায়দর্শন ১।৩২

গ্রীকগণ বহু উৎকর্ষ সাধনদ্বারা ইহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং এই কথা অন্যান্য অনেক বিজ্ঞান সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে।"[১৮]

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাসের সময় হইতেই গ্রীক ও হিন্দুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনের সূচনা হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পিথাগোরাস হিন্দুদের দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়নের জন্যই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিত-গণের প্রতি এমন প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন অলেকজাণ্ডার অনেক হিন্দু দার্শনিক পণ্ডিতকে গ্রীসে লইয়া গিয়াছিলেন। বৈশেষিক ও ন্যায় এই দুই দর্শন একে অন্যের পরিপূরক। আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহুস্থানে জৈনগণের অনেকে বৈশেষিক ও ন্যায়-দর্শনের পক্ষপাতী।

ইহার পর মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শন। সম্ভবতঃ যীশুখৃষ্টের সাতশত বৎসর পূর্বে কপিলের অবস্থিতি কাল। ভারতের ক্রমবিকাশবাদের প্রথম প্রবর্তক এই কপিল। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত কপিলের দার্শনিক মতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল পরমাণুবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে পরমাণু এই সুনিয়ন্ত্রিত জগতের আদিভূত কারণ নহে। জগতের উৎপত্তির কারণই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি। লাটিন ভাষায় *Procreatrix* এই শব্দটি জগতের উৎপত্তিকারিণী মহাশক্তিকে বুঝাইয়া থাকে। কপিলের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকৃতি নিত্যা। কপিল অণুগুলিকে শক্তির কেন্দ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে এই

১৮। Sir R. C. Dutt: *Civlization in Ancient India,* Vol. I, p. 292.

অণুগুলিকেই *Ions* ও *Electrons* বলা হয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই দুই বিপরীত শক্তির যুগপৎ কার্য্যের ফলেই যে জগতের উৎপত্তি—এই তত্ত্ব কপিলই সর্বপ্রথম প্রচার করিয়াছিলেন।[১৯] ইহাকেই আবার এম্‌পিডোক্লিস অণুর মিলন ও বিচ্ছেদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমা প্রকৃতি অর্থাৎ অনাদি অনন্ত মহাশক্তি হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মের ফলে এই সুশৃঙ্খলাপূর্ণ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে—এই সত্যই কপিল ন্যায় ও বিজ্ঞানের যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন।[২০] মহর্ষি কপিলের সাংখ্য-মতবাদের নিকট ঋণী নহেন পৃথিবীর প্রাচীন যুগে রচিত এমন কোন দর্শনশাস্ত্রই নাই। গ্রীকগণের এবং প্লেটোর মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিতগণের (Neo-Platonists) ক্রমবিকাশবাদের উপর কপিলের সাংখ্যদর্শনের সম্পূর্ণ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক ই. ডবলিউ. হপ্‌কিন্স্ (Prof. E. W. Hopkins) বলেন: "প্লেটোর দর্শনশাস্ত্র সাংখ্যের চিন্তাসম্পদে পরিপূর্ণ। সেই ভাবগুলি পিথাগোরাসের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া প্লেটো নিজের দার্শনিক মতকে রূপদান করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে পিথাগোরাসের দার্শনিক মত বলিয়া যে সমস্ত ভাব পরিচিত, তাহার সমস্তই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল (Vide L. Schroeder : *Pythagoras*)। যদি হিন্দু ও গ্রীকদিগের দার্শনিক মতের মাত্র দুই এক স্থানেই ঐক্য

১৯। 'রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ।' —সাংখ্যসূত্রম্ ২।৯

২০। 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতের্মহান মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি*।' —(সাংখ্যসূত্রম্ ১।৫৯)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। ইহা অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতি হইতে ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে মহতের উৎপত্তি হয়। মহৎ হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়গণ। তন্মাত্র হইতে এই মূল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

দেখা যাইত, তাহা হইলে সেই সব বিষয় প্রণিধানযোগ্য নহে বলিয়াই না হয় মনে করা যাইত ; কিন্তু ভারতবর্ষীয় ও গ্রীকদেশীয় দার্শনিক মত দুইটির মধ্যে এই প্রকার অধিকাংশ স্থলেই ঐক্য থাকায় প্লেটো সাংখ্যদশন অনুসরণ করিয়াছেন, এই কথাই বলিতে হইবে।" অধ্যাপক হপ্‌কিন্‌স্ আবার বলিয়াছেন : "প্লেটো এবং তাঁহার শিষ্যগণ-কথিত দার্শনিক মতসকল কিংবা খৃষ্টান জ্ঞানযোগ (Christian Gnosticism) ভারতীয় ভাব ধারার নিকট ঋণী। খৃষ্টীয়ান জ্ঞানযোগি-গণের স্বর্গ এবং আধ্যাত্মিক লোকের বহুত্ববাদের যে ধারণা তাহার মূল সূত্রও ভারতবর্ষ হইতেই আসিয়াছে। সাংখ্যমতে আত্মা ও জ্যোতি একই পদার্থ। গ্রীক দার্শনিক পণ্ডিতগণও আত্মা ও জ্যোতির একত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই ধারণা গ্রীকেরা ভারতবর্ষ হইতেই পাইয়া-ছিলেন। সাংখ্যদর্শনে উক্ত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ পাশ্চাত্য জ্ঞানযোগিগণের (Gnostics) 'তিনটি শ্রেণী' (Three Classes) রূপে গৃহীত হইয়াছে।"[২১]

জন্ ডেভিস্ তাঁহার প্রণীত "হিন্দুদর্শনশাস্ত্র" (Hindu Philosophy) নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন : "কপিলের এই সাংখ্যই জগতের প্রথম দর্শনশাস্ত্র। জগতের মুল কারণ কী ? প্রকৃতি কী ? মনুষ্যের সহিত ইহার কী সম্বন্ধ এবং তাহার ভবিষ্যৎ নিয়তিই বা কী—এই সকল রহস্য বিষয়ে চিন্তাশীল মানবের মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয়, মহর্ষি কপিলই সর্বপ্রথম যুক্তির দ্বারা সেই সকলের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।" জার্মাণ দার্শনিক পণ্ডিত শোপেনহাওয়ার (Schopen-hauer) এবং হার্টম্যানের (Hartmann) ব্যাখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধে মিষ্টার ডেভিস্ আরও বলিয়াছেন যে, "কপিলের চিন্তাধারাকে অনুসরণ

২১। H. W. Hopkins : *Religions of India*, pp. 559-560

করিয়া দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে যেটুকু অংশ জড়বাদ, এই সকল তাহারই পরিপূর্ণ রূপ কিন্তু বিষয়বস্তু একই। সুতরাং বুঝিতে হইবে, দুই হাজার বৎসর পূর্বে মানবের চিন্তাধারা যে পথে পরিচালিত হইত, এতদিন পরেও তাহা ঠিক সেই পথেই পরিচালিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, কোনও নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রশ্নের মীমাংসায় মানুষের চিন্তাধারা বরং তাহা অপেক্ষা আরও নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে। মানুষের আত্মার অস্তিত্ব এবং আত্মাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ইহা সম্পূর্ণরূপে কপিল স্বীকার করিয়াছেন। এই আত্মাকেই জার্মাণ দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) নিষ্প্রপঞ্চ, অবিনাশী ও পারমার্থিক সত্তা বলিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যদেশবাসী আমাদের ও জার্মাণদের আধুনিকতম দর্শনশাস্ত্র সকলে মানুষকে ক্রমিক উন্নতির ফলে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুগঠিত যন্ত্র ভিন্ন আর অন্য কিছু মনে করিতে পারে না।"

সাংখ্যদর্শন ও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ইহাদের উভয়েরই চরম সিদ্ধান্তের মধ্যে সাদৃশ্য ও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতই ইহা বিস্ময়ের বিষয়! সাংখ্যের সিদ্ধান্ত হইল: (১) অসৎ বা সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইতে কোনও পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব নয়;[২২] (২) কারণের মধ্যে কার্য সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ কার্য কারণেরই অভিব্যক্তি বা রূপান্তরমাত্র;[২৩] কার্য যখন কারণের অবস্থায় লয় প্রাপ্ত অর্থাৎ ফিরিয়া যায় তখন তাহাকে নাশ বলে।[২৪] (৪) প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ সকল অবস্থায় ও কালে এক ও অপরিবর্তনীয়;[২৫] (৫) এই মূল প্রকৃতি

২২। 'নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।' —সাংখ্যসূত্রম্ ১।১।১৪

২৩। 'উপাদাননিয়মাৎ।' ঐ ১।১।১৫

২৪। 'নাশঃ কারণলয়ঃ।'— সাংখ্যসূত্রম্ ১।১২১

২৫। 'পারম্পর্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিরণুবৎ।' —সাংখ্যসূত্রম্ ৬।৩৫

হইতেই জগতের সৃষ্টি।[২৬] সূক্ষ্মভাবে পরিবীক্ষণ, পরীক্ষা ও অতিসূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের সহায়ে কার্য হইতে কারণের অনুসন্ধান ও নির্ণয় দ্বারা মহর্ষি কপিল এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

যদিও কপিল একজন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই[২৭] তথাপি তাঁহার প্রবর্তিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত নাস্তিক মতের অনুসরণকারী নহে। কারণ, ইহাতে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, নিত্য ও অব্যয় 'পুরুষ'-রূপী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।[২৮] এই 'পুরুষ' বা আত্মা প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন।[২৯] বিভিন্ন প্রকার বৌদ্ধদর্শনের অভিমতও কপিলের এই সাংখ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জৈনদর্শনের আজ্ঞেয়বাদের ভিত্তিও এই সাংখ্যতত্ত্বের উপর স্থাপিত। জৈনমতালম্বী-দের সংখ্যাও ভারতে অল্প নয়। আধুনিক যুগে ভারতের যে সকল প্রতীক বা প্রতিমাপূজার প্রথা প্রচলিত আছে তাহারও অন্তরালে সাংখ্যের 'পুরুষ-প্রকৃতিবাদের' তত্ত্ব নিহিত আছে।

সাংখ্যের পর পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্র। কপিলের প্রবর্তিত সাংখ্যদর্শনের ক্রমবিকাশতত্ত্ব পতঞ্জলি স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, পরিদৃশ্যমান এই বিরাট জগৎ মূলা প্রকৃতির ক্রমবিকাশ হইতে উদ্ভূত। তাঁহার মতে এই স্বতন্ত্র আত্মা বা 'পুরুষ' বহু এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিত্য, অনন্ত ও অমর। কিন্তু পতঞ্জলির

অর্থাৎ জগতের সকল পদার্থের উপাদান কারণ প্রকৃতি। সুতরাং পরমাণুর ন্যায় প্রকৃতি সর্বত্র সমান নিয়মে কার্য উৎপন্ন করে।

২৬। 'মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্।' —সাংখ্যসূত্রম্ ২।১০

২৭। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ। ঐ ১।৯২

২৮। 'শরীরাদিব্যাতিরিক্তঃ পুমান্।' ঐ ১।১৩৯

২৯। 'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।' ঐ ১।১৪৯

যোগশাস্ত্র ও কপিলের সাংখ্যদর্শনের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যোগ শাস্ত্রে এক বিশ্বজনীন পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর নিরাকার, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, ক্লেশাদি সম্পর্ক-রহিত, নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ ও নিষ্কাম।[৩০] পতঞ্জলি সাংখ্যের মনোবিজ্ঞান গ্রহণ করিয়াছেন এবং অতি বিশদভাবে চিত্তের বৃত্তিসমূহের আলোচনা করিয়াছেন। কপিল ও পতঞ্জলি উভয়েই আবার মনকে প্রকৃতির সূক্ষ্ম বস্তু-বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ মন অচেতন প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত, ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে তাঁহারা পাশ্চাত্যের অধুনাতন জড়বাদী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত সকলের পূর্বসূচনা করিয়া গিয়াছেন। তবে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী দার্শনিক-গণের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ এই যে, হিন্দু দার্শনিকগণের মতে চিত্ত বা মন শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে উচ্চশ্রেণীর মনোবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের মতে চিত্তের বৃত্তিগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত যথা: প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।[৩১] প্রকৃত জ্ঞান ঐন্দ্রিক পর্যবেক্ষণ, অনুমিতি ও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে লাভ করা যায়। এই সকল এবং অন্যান্য মানসিক বৃত্তিসমূহ পতঞ্জলি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্তের বিভিন্ন বিকার বিশ্লেষণ করিয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার কিরূপে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা যায়, সেই সব সাধনপদ্ধতিও তিনি ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। যে প্রকৃতির সহিত পুরুষ বর্তমানে একীভূত হইয়া আছেন সেই প্রকৃতির গুণ ও অন্যান্য বন্ধন হইতে পুরুষকে মুক্ত-

৩০। 'ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।
—পাতঞ্জলযোগসূত্রম্ ১।২৪

৩১। 'প্রমাণ-বিপর্যয় বিকল্প নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ।—পাতঞ্জলযোগসূত্রম্ ১।৬

করাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য। ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। চিত্তের একাগ্রতা, ধারণা, ধ্যান, প্রাণায়াম, দিব্য শ্রবণশক্তি (অতীন্দ্রিয় শব্দসকল শ্রবণ), পরচিত্তে দূর হইতে প্রভাব বিস্তার (অলৌকিক শক্তি)[৩২] এবং অন্যান্য বহুপ্রকার বিভূতি কিরূপে লাভ করা যায় ও কিরূপে এই জীবনেই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিতে পারা যায় এই সকল উপায় পতঞ্জলি তাঁহার যোগশাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

পাতঞ্জলদর্শনের ন্যায় পূর্ণ মনোবিজ্ঞান পৃথিবীতে আর কোনও দেশে পাওয়া যায় না। আধুনিক ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানকে প্রকৃতপক্ষে *Psychology* আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ *Psyche* অর্থে আত্মা বুঝায়, অথচ ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বলেন: আত্মা (*Psyche*)-বর্জিত মনোবিজ্ঞান (*Psychology*) অধ্যয়ন বৃথা। ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানকে বরং শারীর বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। আমার বন্ধু কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাইরাম কর্‌সন্ এই কথাই বলেন। পতঞ্জলি প্রণীত মনোবিজ্ঞানকেই প্রকৃত মনোবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এখন পর্যন্তও ভারতের নানা প্রদেশে যোগশাস্ত্রের মতাবলম্বী অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

জৈমিনির ‘পূর্বমীমাংসা’ হিন্দুদের অন্যতম দর্শন। ‘মীমাংসা’ অর্থে তত্ত্বান্বেষণ ও ‘পূর্ব’ অর্থে অগ্রবর্তী বুঝায়। পূর্বমীমাংসায়

৩২। (ক) ‘কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।’—পাতঞ্জলযোগসূত্রম্ ২।৪৩

(খ) ‘কায়াসিদ্ধিঃ অণিমাদ্যাঃ; তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাৎ শ্রবণ দর্শনাদ্যেতি।’

—ব্যাসভাষ্যম্

তাহা ছাড়া পাতঞ্জলদর্শনে আরও বলা হইয়াছে: ‘প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্।’—(পাতঞ্জলযোগসূত্রম্ ৩।১৯); অর্থাৎ প্রত্যয়ে চিত্তসংযম করিলে পরিচিত্তের জ্ঞান হয়।

বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের উপদেশ ও ক্রিয়াদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, সর্বতোভাবে বেদোক্ত এই সকল বিধি নিষেধ প্রতিপালন করা প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ; যেহেতু ইহা ভগবান কর্তৃক প্রতিভাত হইয়াছে। জৈমিনির মতে বেদবাক্যগুলি যেমন নিত্য সেই বাক্যগুলি ও তাহাদিগের অর্থের মধ্যেও তেমনি নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। অতএব বেদ অপৌরুষেয়। জ্ঞান বিকাশের উৎস কোথায়, বাক্য এবং চিন্তা ইহাদের পরস্পরে কী সম্বন্ধ এবং কিরূপে বাক্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বা এই জগৎ কিরূপে বাক্য বা ভাবের অভিব্যক্তি—ইহাই জৈমিনি বুঝাইয়াছেন। আমরা গাভী বলিয়া পশুবিশেষকে দেখিয়া থাকি, ইহার কারণ, বেদে 'গো' (সংস্কৃত 'গৌঃ') শব্দ আছে। যদি বেদে এই শব্দ না থাকিত, তাহা হইলে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে গাভী বলিয়া কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব থাকিত না। বর্তমান যুগে এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিলে অবশ্য আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। কিন্তু যদি আমরা এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া গভীরভাবে ইহা আলোচনা করি এবং শব্দ ও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে মহর্ষি জৈমিনির এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট প্রতিভাত হইবে। সূর্য যে বর্তমান আছে তাহার কারণ বেদে 'সূর্য'-শব্দের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ বিরাট মনে বা অব্যক্তে (Cosmic mind-এ) এই শব্দ (Logos) অবিনশ্বর ভাব-রূপে নিহিত আছে বলিয়াই সূর্য তাহার আংশিক অভিব্যক্তিরূপে রহিয়াছে।

পূর্বমীমাংসাদর্শনে দ্বাদশটি অধ্যায় আছে। ইহার প্রথম অধ্যায় চারিটি পাদে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও স্মৃতি এই চারিটি বিশিষ্ট শব্দসমূহের প্রমাণ স্থাপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ও ঐ প্রকার চারি পাদে বিভক্ত। উহাতে কর্মভেদ,

উপোদ্‌ঘাত, প্রমাণ, অপবাদ ও প্রয়োগভেদ রূপ অর্থ নিরূপিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায় আটটি পাদে বিভক্ত। উহাতে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্যাদি বিরোধ, প্রতিপত্তি-কর্ম, অনারভ্যাধীত, প্রধানোপকারক প্রযাজাদি, যাজমান-চিন্তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের চারি পাদে প্রধান প্রযোজকত্ব, অপ্রধান প্রযোজকত্ব, জুহূপর্ণতাদি ফল, রাজসূয়গত অক্ষদ্যূতাদি আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের চারি পাদে শ্রুত্যাদিক্রম, উৎকর্ষাপকর্ষ, প্রাবল্য ও দৌর্বল্য চিন্তা নিরূপিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অষ্ট পাদ আছে। উহাতে ধর্ম, দ্রব্যপ্রতিনিধি-কল্পন, প্রায়শ্চিত্ত, সত্রদেয়, বহ্নিবিচার প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ের চারি পাদে প্রত্যক্ষ বচনাতিদেশ, নাম-লিঙ্গাতিদেশ বিচারিত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ের চারি পাদে স্পষ্ট, অস্পষ্ট ও প্রবল লিঙ্গ, অতিদেশ ও অপবাদ বিচারিত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ের চারি পাদে উহবিচারের আরম্ভ, সামোহ, মন্ত্রোহ ও তাহার প্রসঙ্গাগত বিচার ব্যবস্থিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে আটটি পাদ আছে। উহাতে বাধ, হেতু, দ্বার, লোপবিস্তার, বাধের কারণ ও কার্যের একত্ব গ্রহাদি সামপ্রকীর্ণ এবং নঞ্‌-অর্থ বিচারিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়ের চারি পাদে তন্ত্রোপোদ্‌ঘাত, তন্ত্রাবাপ, তন্ত্রপ্রপঞ্চন ও আবাপপ্রপঞ্চন আলোচিত হইয়াছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের চারি পাদে প্রসঙ্গ-তন্ত্রের নির্ণয়, সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচারিত হইয়াছে।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম সূত্রে: 'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা' অর্থাৎ ইহার পরে ধর্ম কাহাকে বলে ?—এই প্রকার জিজ্ঞাসা দ্বারা প্রথম অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক অধিকরণে বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি এই পাঁচটি অবয়ব নিরূপিত হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাতে পাঁচটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে; যথা: (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান, (৩) উপমান, (৪) অর্থাপত্তি, (৫) শব্দ। কুমারিল ভট্টের মতে 'অভাব' ষষ্ঠ প্রমাণ। এই সকল প্রমাণের দ্বারা যে উপায়ে মনুষ্য অপৌরুষেয় বেদবাক্যের অনুশাসন অনুযায়ী অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিয়া স্বর্গাদি রূপ পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে তাহাই মীমাংসাদর্শনের উদ্দেশ্য।

পূর্বমীমাংসাকে 'কর্মদর্শন' বলা যাইতে পারে। ইহাতে মানুষের প্রতিদিনের বিধিবিহিত কর্তব্য কর্ম যথা: যজ্ঞ, পূজা ও ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধীয় পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের প্রকৃত কর্ম কী এবং কোন্ উপায়ে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলে আমরা আমাদের বাঞ্ছনীয় ফল লাভ করিতে পারি—এই সকল তত্ত্ব পূর্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বলা যাইতে পারে, যেমন আমাদের যদি স্বর্গলাভ কাম্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে কতকগুলি নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে এবং এই সকল ক্রিয়া যথাযথ ও বিধিসঙ্গতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যে অজ্ঞাত, অপূর্ব ও অননুভব্য ফল লাভ হইবে তাহারই প্রভাবে আমরা স্বর্গ-লোকের অধিকারী হইব। জৈমিনির মতে ঈশ্বর মানুষের কর্মফলদাতা নহেন। 'অপূর্ব'-এর দ্বারা কর্মই কর্মফল আনয়ন করে। এই জন্যই অনেকের ধারণা যে, জৈমিনি নিরীশ্বরবাদী।

এখানে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। বেদবর্ণিত দেবতাগণ শরীরী বা সচেতন পদার্থ নহেন। যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দিষ্ট

হইয়াছে, সেই দেবতা সেই মন্ত্রেরই স্বরূপ। মন্ত্রের অতিরিক্ত কোন দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই।

যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি কী প্রকার? এবং যদি সেই কর্মই অন্য কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারই বা কী দোষ হইবে?—এই সকল সূক্ষ্ম বিচারে পূর্ব-মীমাংসা পরিপূর্ণ। কেহ কেহ হয়তো এই প্রকার বিধি-ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানসকলকে নিষ্ফল মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু প্রার্থনার সফলতায় যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, ক্রিয়া ও তাহার প্রতিক্রিয়ার নিয়ম এবং কার্য ও কারণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে যাঁহাদের ধারণা আছে, তাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থাকে অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ এই সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেও কিছু না কিছু সত্য আছে। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা ও দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেক সঞ্চালনেরও যখন এক একটা ফল আছে, তখন এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান কখনই নিষ্ফল হইতে পারে না। এই সকল ক্রিয়ার ফল কী? আমাদের জীবন ইহাদের দ্বারা কীভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে? —আমরা বিষয় কাজে এরূপ ব্যস্ত যে, এই সূক্ষ্ম প্রশ্নগুলি আলোচনা করিতে চাই না, কিন্তু এখনও অনেক চিন্তাশীল মনীষী ও তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা, প্রকৃতির এই সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্বসকল উপলব্ধি করিয়াছেন। পূর্বমীমাংসার যুক্তিতর্ক সম্বন্ধে অধ্যাপক কোলব্রুক্ (Prof. Colebrook) বলেন: যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যেক ক্রিয়াসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা হইতেই সত্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। বিচারের এই সকল সূত্র সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মের (Philosophy of Law) উৎপত্তি হয় এবং এই মীমাংসাদর্শনেই ইহার বিচার ও আলোচনা করা হইয়াছে। যদিও পূর্বমীমাংসা সাধারণতঃ

দর্শনশাস্ত্ররূপে অভিহিত তথাপি ইহাকে বেদের ভাষ্য বলা যাইতে পারে। কারণ জৈমিনি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের প্রকৃত অর্থই যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইজন্যই পূর্বমীমাংসা বৈদিক মতাবলম্বীদিগের নিকট, বিশেষতঃ হিন্দু পুরোহিতদিগের নিকট অতিশয় প্রিয় বস্তু।

বেদান্ত বা উত্তরমীমাংসা ষড়দর্শনের মধ্যে চরম। এই বেদান্তই ব্রহ্মসূত্র, বাদরায়ণসূত্র ও ব্যাসসূত্র নামে প্রচলিত আছে। ভগবান্ বাদরায়ণ ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস একই ব্যক্তি কি-না সে বিষয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ থাকিলেও সাধারণের বিশ্বাস যে, দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত বেদবিভাগকারী মহাভারত ও পুরাণাদির রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই ব্রহ্মসূত্রপ্রণেতা ভগবান বাদরায়ণ ব্যাস। বেদের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষদ্‌সমূহের বিভিন্ন উপদেশগুলি একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াই মহর্ষি ব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের কর্মকাণ্ডমূলক অনুশাসিত বিধি, প্রয়োগ ইত্যাদির সামঞ্জস্য করিয়া পূর্বমীমাংসা রচনা করেন। মহর্ষি বেদব্যাস আরণ্যক ও উপনিষদের উপদেশ-গুলির পারম্পর্য, ভাব ও গূঢ় অর্থের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য বেদান্তদর্শনকে চারি অধ্যায়ে এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে আবার চারিটি পাদে বিভক্ত করিয়াছেন।

বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত ভারতের প্রখ্যাতনামা আচার্যগণ এই বেদান্তদর্শন বা ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্নপ্রকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে পাণিনির গুরু ভগবান উপবর্ষ-রচিত ভাষ্য অতিশয় প্রাচীন। ভগবান বোধায়নও ব্রহ্মসূত্রের উপর একটি 'বৃত্তি' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান উপবর্ষ-রচিত 'ভাষ্য' ও বোধায়ন-রচিত 'বৃত্তি' এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। বৌদ্ধযুগের অবনতিকালে খৃষ্টীয় সপ্তম

শতাব্দীতে ভগবান শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপর 'শারীরকভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়া আচার্য শঙ্কর বেদবিরোধী নাস্তিক ও শূন্যবাদী বৌদ্ধগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। বেদের মহিমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মকে আবার উজ্জীবিত করিলেন। শঙ্করের পরবর্তী আচার্যগণ তাঁহার অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া নিজ নিজ দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিলেও ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারার জন্য তাঁহার নিকট প্রত্যেকেই তাঁহারা ঋণী। আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত দশনামী[৩৩] সন্ন্যাসীসম্প্রদায় আবার ভারতে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈবাদি ধর্মসঙ্ঘ এবং অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতমতাবলম্বী দার্শনিকগণের গুরু। জ্ঞানের ভাস্বর মূর্তি আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। এক্ষণে বেদান্তের অন্য ভাষ্যকার আচার্যগণের প্রচারিত বেদান্তসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আমরা চেষ্টা করিব।

ভারতের ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ ও বৈদান্তিক আচার্যেরা আপন আপন সাম্প্রদায়িক ধর্মাদর্শ ও দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ ব্যাখ্যা অনুসারে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমৎ রামানুজাচার্য ইঁহাদের অন্যতম। তিনি ভগবান বোধায়নের 'বৃত্তি' অবলম্বন করিয়া স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত মাদ্রাজ অঞ্চলে শ্রী-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আচার্য রামানুজের দার্শনিক মত বিশেষভাবে প্রচলিত। আচার্য রামানুজের

৩৩। আচার্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসীসম্প্রদায় দশটি শাখায় বিভক্ত বলিয়া শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসীদের 'দশনামী' বলা হয়। সেই দশটি শাখার নাম গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, বন, তীর্থ, অরণ্য, সমুদ্র, পর্বত ও আশ্রম।

মতে জীব ও জড়ে পরিপূর্ণ এই জগৎ কখনও মিথ্যা 'মায়া' নহে। ইহা অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অচিন্ত্য শক্তিমান ব্রহ্মেই অবস্থিত। ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ তিনি অনন্ত কল্যাণগুণের আকর এবং তেজঃ, বল, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীর্য, শক্তি প্রভৃতি গুণের সমষ্টি। তিনি স্বীয় আনন্দশক্তির মাত্র এক কণার দ্বারা সমস্ত জীবকে ধারণ করিতেছেন। তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও পরাৎপর। তাঁহাতে কোন দোষ বা ক্লেশের লেশমাত্রও নাই।[৩৪] এই দিক দিয়া সেইজন্য ব্রহ্মকে নির্গুণও বলা যাইতে পারে।

ব্রহ্ম সবিশেষ অর্থাৎ স্বশক্তি দ্বারা শুদ্ধচিৎ, চিদচিৎ ও অচিদ্‌রূপে প্রকাশমান। শুদ্ধচিৎকেই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর (Personal God) বলা হয়। জীব অচিৎ। শুদ্ধচিৎস্বরূপ পরমেশ্বরের সত্তার সহিত জীব কেবল চিদংশে (চৈতন্যসত্তায়) অভিন্ন। রামানুজের মতে জীব চিদ্রূপে পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইলেও পরমেশ্বর চিদ্‌ঘন আর জীব চিৎকণা মাত্র। এই জড় জগৎই অচিৎ (matter)। জীব (চিৎ) ও জড় (অচিৎ) উভয়েই কিন্তু সেই পরমেশ্বরের শরীর। সগুণ ব্রহ্মই সকলের ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী।[৩৫] সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম তাঁহার অধীনে।[৩৬]

৩৪। 'সমস্তকল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ।'
'তেজোবলৈশ্বর্যমহাববোধ সুবীর্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥
পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।'
—শ্রীভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১

৩৫। 'এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যামী।'
—মাণ্ডুক্য উপনিষদ ৬

৩৬। 'বশী সর্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ।'
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ৩।১৮

পরমেশ্বর লোকপাল, লোকের অধিপতি, সকলের ঈশ্বর ও সর্বভূতের আত্মা।[৩৭] তিনি অংশী ও সর্বজীবের নিয়ন্তা এবং জীব তাঁহার অংশ। তিনি স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদবর্জিত। তাঁহাতে কেবলমাত্র স্বগতভেদই বর্তমান। ইহাই বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বা রামানুজের ব্যাখ্যাত দার্শনিক মতবাদ। শ্রীমৎ রামানুজ আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, বিবর্ত বা অধ্যাসবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ ও পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন এবং জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ ও জড় জগতের সত্তা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও তিনি জীব ও ব্রহ্মে স্বগতভেদ অস্বীকার করেন নাই। চিদ্রূপে জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মস্বরূপ নহে ইহাই তিনি বলিয়াছেন। আচার্য শ্রীবল্লভ[৩৮] (বিষ্ণুস্বামী মতানুযায়ী) বিশুদ্ধ ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রের 'অণুভাষ্য' প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম। তিনি প্রপঞ্চাতীত ও পরমতত্ত্ব। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির বিযুক্ত জীব তাঁহার বিভূতি। তিনি আপন ইচ্ছাতেই নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমব্রহ্ম নিরবয়ব—তাঁহার কোন অংশ হয় না; সুতরাং তাঁহার অংশ কল্পনা করাও অনুচিত। বদ্ধাবস্থায় জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলেও মুক্তি লাভের দ্বারা দ্বৈতবিবর্জিত হইয়া সে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে ও শুদ্ধ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। মুক্ত অবস্থাতে জীবের সহিত ব্রহ্মের

৩৭। 'এষ লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশ্বরঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ, স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।' —কৌষীতকী উপনিষৎ ৩।৯

৩৮। শ্রীবল্লভ ত্রৈলঙ্গদেশীয় লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র ছিলেন।

অংশাংশিভাব বা স্বগতভেদ থাকে না। ইহাকেই 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' বলে। এই মতাবলম্বিগণ বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত। গুজরাট, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, মালোয়া, আজমীর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এই সম্প্রদায়ের অনেক বড় বড় আখড়া (মঠ) আছে।

শ্রীবল্লভাচার্যের পূর্ববর্তী আচার্য শ্রীমধ্ব আবার জীবের সহিত ব্রহ্মের চিদংশে বা জ্ঞানাংশে অভিন্নত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রহ্ম-সূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। তাঁহার মতে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরমব্রহ্ম। তিনি সগুণ এবং জীব ও জড় জগৎ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। বল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মে ও জীবে এবং জীবে ও জড়ে বিজাতীয় ভেদ নিত্যসিদ্ধ। এই ভেদ পাঁচ প্রকার: (১) জীবে ও পরমেশ্বরে ভেদ, (২) জীবগণের পরস্পরে ভেদ, (৩) জড়জগতে ও পরমেশ্বরে ভেদ, (৪) জীবে ও জড়ে ভেদ এবং (৫) জড়ে ও জড়ে পরস্পর ভেদ। জীব সামীপ্যমুক্তি লাভ করিলেও এই সকল ভেদ তাহাতে বর্তমান থাকে। সুতরাং এই মতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধির কোন আশাই নাই। শ্রীমৎ মাধ্বাচার্যের এই দ্বৈতবাদমূলক ভাষ্য 'পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন' নামে অভিহিত।

ব্রহ্মসূত্রের 'গোবিন্দভাষ্য'-প্রণেতা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতাবলম্বী হইলেও স্বীয় ভাষ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বা বাসুদেবের অংশ। সমুদ্রে ও তরঙ্গে, অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গে এবং সূর্য ও সূর্যকিরণে যে সম্বন্ধে, জীবের সহিত ব্রহ্মেরও সেই সম্বন্ধ নিত্যসিদ্ধ। অচিন্ত্য শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় জীবের স্ব-স্বরূপত্ব বিস্মৃতিই বন্ধনের হেতু। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই অংশ জীব— এই তত্ত্বের উপলব্ধিতে মুক্তি হয়। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মের সহিত স্বরূপতঃ অভেদ, কিন্তু পরিচ্ছন্নত্ব-ভেদে অনাদি ও নিত্যসিদ্ধ।

স্বরূপগত শক্তির প্রভাবেই ব্রহ্ম যেন আপনাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে দর্শন করেন। এই শক্তি অচিন্ত্য, সুতরাং ভেদাভেদও অচিন্ত্য। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বিশেষভাবে প্রচলিত।

দ্বৈতাদ্বৈতমতের প্রবর্তক শ্রীনিম্বার্কস্বামী 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামে বেদান্তসূত্রের এক ভাষ্য রচনা করেন। জগতের সৃষ্টি ও লয়কর্তা ব্রহ্ম জগৎ হইতে অতিরিক্ত সত্তা, সুতরাং জগৎও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদসম্বন্ধ বর্তমান। ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ, জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন উপাদান নাই, সুতরাং ব্রহ্ম হইতেও জগৎ অভেদ। বস্তুতঃ জগৎ গুণাত্মক ও ব্রহ্ম গুণী। গুণী হইতে গুণের পৃথক অস্তিত্ব অসম্ভব, অথচ গুণী প্রকৃতপক্ষে গুণাতীত বা গুণাতিরিক্ত। অতএব ব্রহ্ম সগুণ এবং নির্গুণ উভয়ই। নিম্বাদিত্যের [৩৯] মতে ব্রহ্ম (১) অক্ষর, (২) পরমেশ্বর, (৩) জীব, (৪) জড় এই চারি প্রকারে অভিব্যক্ত। জগতের সহিত ব্রহ্মের ভেদাভেদ সম্বন্ধে—ইহাই নিম্বার্কাচার্যের প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ভগবৎপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য শারীরক ভাষ্য রচনা করিয়া বেদান্তের অদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করের পরবর্তীকালের দার্শনিক মতবাদসমূহ আলোচনা করিলে শ্রীরামানুজপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের উপর তাঁহার চিন্তার প্রভাব

৩৯। নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্কস্বামী পূর্বে নিয়মানন্দাচার্য নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি নারদ ঋষির শিষ্য হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। কথিত আছে যে, কোন সময়ে তিনি তাঁহার আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষের উপর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন চক্র আবাহন করিয়াছিলেন এবং ঐ চক্র রাত্রিকালে সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য আখ্যা প্রদান করেন।

পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমধ্ব ভিন্ন প্রায় সকল বৈষ্ণবাচার্যগণই জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপগত অভেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ জীব ও ব্রহ্মে স্বগতভেদ বা অংশাংশী সম্বন্ধ স্বীকার করিলেও অধিকাংশের মতে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ব্রহ্ম নিরবয়ব, অখণ্ড ও সচ্চিদানন্দ; তাঁহাতে কোনও অংশ থাকিতে পারে না। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে স্বগতভেদ কিরূপে থাকিতে পারে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্তিত "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে এই মতের সহিত ভেদাভেদবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রণীত বিভিন্ন ভাষ্য পাঠ করিলে অবধারণ করা যায় যে, দার্শনিক তত্ত্বের বিচারে বৈষ্ণবাচার্যগণ পরোক্ষে বা অপরোক্ষে বরং আচার্য শঙ্করের মতকেই সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পর ইহাও সত্য যে, শ্রীরামানুজ হইতে নিম্বার্কাচার্য পর্যন্ত সকল বৈষ্ণবাচার্যদিগের পরস্পরের মতের মধ্যে যে পরিমাণের পার্থক্য বিদ্যমান, আচার্য শঙ্করের সহিত তাঁহাদের মতের তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে আচার্য শঙ্করের প্রবর্তিত অদ্বৈতমতের আলোচনার অভাবে এবং অদ্বৈতজ্ঞান ও মায়াবাদের তাৎপর্য বুঝিতে না পারায় সাধারণের মনে ভগবান শঙ্করাচার্যের মত সম্বন্ধে একটি অসঙ্গত ও ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আশা করি, ইহা শীঘ্র দূরীভূত হইবে।

জ্ঞানাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য অদ্ভুত বিচারশক্তির বলে প্রতিপক্ষের মত সর্বত্র খণ্ডন করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আপনার অদ্বৈতমত স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ নিত্য, সত্য, এক বা অদ্বিতীয় ও নির্গুণ ব্রহ্মই পরমার্থিক সত্তা; সুতরাং জীব, জগৎ ও ঈশ্বর স্বরূপে বা পরমার্থিব সত্তায় ব্রহ্ম

হইতে অভিন্ন—ব্রহ্ম অতিরিক্ত ইহাদের আর কোন পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্ম নিজ মায়াশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা সগুণ ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হন। জগতের মহাপ্রলয়ের অবস্থায় মায়া অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে লীন বা সুপ্ত থাকে। "একো-ঽহং বহু স্যাম্'—আমি এক, বহু হইব, সগুণ ব্রহ্মে এই সঙ্কল্প উঠিবামাত্র শক্তির বিকাশ ও স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির আরম্ভ হইল। মায়াশক্তিসমন্বিত সগুণ ব্রহ্মই নিজ মায়া বা প্রকৃতি হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন —"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" মিথ্যা অবিদ্যারূপিণী এক শক্তি প্রকৃতি বা মায়া 'সৎ'-ও নহে অথবা শশশৃঙ্গবৎ 'অসৎ' এবং 'সদসৎ'-ও নহে, পরন্তু অনির্বচনীয়স্বরূপ।[৪০] ব্রহ্মজ্ঞানে অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার নাশ হয়—যেমন রজ্জুজ্ঞানে সর্পভ্রম বিদূরিত হয়। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ ত্রিগুণময়ী মায়ার বিকার মাত্র। মায়া বা অজ্ঞানের দুইটি শক্তি, একটি 'আবরণ' ও অপরটি

৪০। 'অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয় সুধীয়ৈব মায়য়া, যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে॥
সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সঙ্গাপ্যসঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো, মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা॥'

—বিবেকচূড়ামণি ১১০-১১১

অব্যক্ত নামধেয়া পরমেশ্বরের শক্তি অনাদি। অবিদ্যারূপিণী সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণী এই মায়া সমস্ত জগৎকে প্রসব করেন। সুধীগণ কার্য দেখিয়া মাত্র এই মায়ার অস্তিত্বকে অনুমান করেন।

এই মায়া সৎ-ও নহে, অসৎ-ও নহে, সদসৎ-ও নহে। ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিন্নও নহে, সঙ্গ নহে, অসঙ্গ নহে, সঙ্গাসঙ্গও নহে। ইনি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্বচনীয়রূপা।

'বিক্ষেপ'। আবরণশক্তি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপশক্তিতে এক অদ্বিতীয় সত্তা বহুরূপে প্রতীয়মান হয়।[৪১]

প্রকৃতির পরিণাম হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী। ব্রহ্মে মায়ার গুণত্রয় অধ্যস্ত হওয়ায় এক অখণ্ড সত্তাই খণ্ডরূপে প্রতীয়মান হয়। এক জ্ঞানই সত্য, বহু জ্ঞান কাল্পনিক বা মিথ্যা। এই তত্ত্বই আচার্য শঙ্করের অধ্যাসবাদ।[৪২]

ব্রহ্ম নির্গুণ ও দেশ-কাল-নিমিত্ত দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মায়াবশতঃ পরিচ্ছিন্নের ন্যায় মায়াধীশ সগুণ ঈশ্বর, জীব ও জগৎ-রূপে বিবর্তিত হন। তিনিই আবার মায়াকে নিজের বশে রাখিয়া জগৎরূপে ইন্দ্রজাল দেখান এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া অবিদ্যাপাশবদ্ধ মায়াধীন জীব হন; অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের প্রথম বিবর্ত মায়াধীশ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের বিবর্তই মায়াবদ্ধ জীব। ইহাই শঙ্করেরর বিবর্তবাদ। জীব আত্মস্বরূপকে জানিলে অজ্ঞানের কার্য

৪১। 'অস্য অজ্ঞানস্য আবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়ম্ অস্তি। আবরণশক্তিঃ তাবৎ * * অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানম্ অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণম্ অবলোকতৃ-বুদ্ধি-পিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্। * * বিক্ষেপশক্তিস্তু * * অজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশাদিপ্রপঞ্চম উদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং 'বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎসৃজেৎ'।'—বেদান্তসার

৪২। 'কোঽয়ম্ অধ্যাসো নাম ইতি; উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। * * সর্বথাঽপি তু 'অন্যস্য অন্যধর্মাবভাসতাং' ন ব্যভিচরতি। তথা চ লোকে অনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদ্ অবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদ্ ইতি। * * তম্ এতম্ এব লক্ষণং অধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে *।'—বেদান্তসূত্রম্, অধ্যাসভাষ্যম্।

দূর হয় ও আপনাকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হইয়া মোক্ষলাভ করে।[৪৩] এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন: "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

প্রকৃতপক্ষে জীব কখনও অখণ্ড ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কেবল মিথ্যা-জ্ঞানবশতঃ জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। যতদিন এই মিথ্যাজ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি থাকে ততদিন জীব জন্ম ও মৃত্যু ভোগ করে। শ্রুতিও বলিয়াছেন: "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"; "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দার্শনিক চিন্তার সর্বোচ্চ চরম স্তরে মানব-মনকে লইয়া যায়, এইজন্য ইহা অন্যান্য বেদান্তমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে অবশ্য আর একটু বিশদভাবে বর্ণনা করা আবশ্যক।

শঙ্করের মতে পারমার্থিক বা নিরপেক্ষ সত্তাই (Absolute Reality) নিত্য ও সত্য ব্রহ্মস্বরূপ, ব্যবহারিক বা সাপেক্ষ সত্তাই (Relative reality) অনিত্য, অসত্য, জগৎ বা মায়া। মায়ার অনির্বচনীয়া শক্তির প্রভাবে নাম-রূপাদি বিকার বা উপাধিগুলির উৎপত্তি হয়

৪৩। মনে রাখিতে হইবে যে, অদ্বৈতবাদ পক্ষে জীবই ব্রহ্ম এই অভিন্নাত্মক অনুভূতিরূপ জ্ঞান ও মোক্ষলাভ ভিন্ন বস্তু নয়। অথবা প্রথম ক্ষণে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান ও দ্বিতীয় ক্ষণে মোক্ষ লাভ এইরূপ ক্ষণান্তরে মোক্ষও বেদান্তের তাৎপর্য নয়। অদ্বৈত বেদান্তে অভেদ জ্ঞানের অনুভূতি ও মোক্ষলাভ একই বস্তু। ইহা ক্রিয়াজন্য উৎপাদ্য বা অনুষ্ঠানসাপেক্ষ নয়; ইহা স্বয়ংপ্রকাশ, অনন্যসাপেক্ষ ও সিদ্ধবস্তু। এজন্য মোক্ষের কখনও লাভ বা প্রাপ্তি হয় না। মোক্ষ—লাভ বা প্রাপ্তির স্বরূপই।

বলিয়া উহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই।[৪৪] উহারা কল্পিত বা মিথ্যা হইলেও উহাদের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে, তাহা কিন্তু মিথ্যা বা কল্পিত নহে, তাহা শাশ্বত। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। জগতের উপাদান-সত্তা ব্রহ্ম প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন। নাম ও রূপ ধ্বংস হইলেও জগতের উপাদান-সত্তা ব্রহ্মের কখনও নাশ হয় না, যেমন নাম ও রূপ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহার উপাদান মৃত্তিকার নাশ হয় না।[৪৫] ঘটের অস্তিতের পূর্বে নাম ও রূপ ছিল না এবং পরেও তাহারা থাকিবে না। কিন্তু মৃত্তিকা পূর্বেও ছিল, আবার পরেও থাকিবে। সুতরাং এই জগতের নাম ও রূপই মিথ্যা, কিন্তু নাম ও রূপে অনুস্যূত রহিয়াছে যে সত্তা তাহা কখনও অসৎ নহে! সেই সত্তাই অপরিণামী সচ্চিদানন্দ নামে অভিহিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মেরই অভিন্ন শক্তি। এক প্রকৃতি বা মায়াই এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাকে অবলম্বন করিয়া নানা আকারে পরিণত হইয়াছে। আর এই জগতের প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে যে ব্রহ্ম ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন তাঁহাকে জানিতে না পারিয়া প্রত্যেক পদার্থের পরস্পর ভেদজ্ঞানই শঙ্করের মতে অবিদ্যা। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর

৪৪। 'তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে।'

—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।৭

সৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ নাম-রূপের আকারে অনভিব্যক্ত ছিল। পরে বীজরূপে অবস্থিত জগৎ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল।

৪৫। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।'

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।১।৪

কোন দ্বিতীয় নিত্য বস্তু নাই। এই ব্রহ্মই অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপী ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। নাম ও রূপযুক্ত এই জগতের পারমার্থিক সত্তা (Absolute existence) নাই, তাহার ব্যবহারিক সত্তা মাত্র আছে। দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত নিষ্প্রপঞ্চ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই মায়ার আবরণে দেশ, কাল ও নিমিত্তের ভিতর দিয়া পরিচ্ছিন্ন রূপে কর্তা, ভোক্তা; জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং বিষয় ও বিষয়ীরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। 'জগৎ মিথ্যা' অর্থে জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই, ইহা আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্রের মত অলীক এই প্রকার ভাব প্রকাশ করে না। ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে, পারমার্থিক সত্তা নাই। যতক্ষণ দেশ, কাল ও নিমিত্তের ভিতর আমরা বাস করি ততক্ষণই জগতের এই ব্যবহারিক সত্তা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি। পারমার্থিকতার দিক হইতে ইহার কোন সত্তা থাকে না, জগৎ ব্রহ্মেই পর্যবসিত হইয়া যায়। এই দেশ, কাল ও নিমিত্তের অপর নামই 'মায়া'। ব্রহ্মের উপলব্ধি হইলে নাম, রূপ ও উপাধির পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাইয়া সমস্ত পরিচ্ছিন্ন অথবা আপেক্ষিক জ্ঞান (Relative knowledge) এক অখণ্ড জ্ঞানে (Absolute Knowledge) পর্যবসিত হয়। ইহাই আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈত তত্ত্বের সারমর্ম।

সর্বাবয়বসম্পন্ন প্রাঞ্জল ও বিশদ তর্ক এবং যুক্তি দ্বারা প্রতিপক্ষের মত (শূন্যবাদ, ভেদবাদ, নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি) খণ্ডন করিয়া স্বমত প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করিবার শক্তি ভগবান শঙ্করাচার্যের সত্যই অতুলনীয়! তাঁহার সুতীক্ষ্ণ যুক্তির নিকট অপর মতাবলম্বীর যুক্তি নিতান্ত শক্তিহীন ও নিষ্প্রভ।

* * *

আধুনিক ভারতে বেদান্তের বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুযায়ী দার্শনিক

মতবাদ প্রচলিত থাকিলেও আচার্য শঙ্করের প্রতিপন্ন অদ্বৈত মতই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সত্যান্বেষী ব্যক্তিদিগের একান্ত আগ্রহের বিষয়। ভগবান শঙ্করাচার্যের আশ্চর্য তর্কশক্তি ও দার্শনিক মনীষার নিকট ভারতের নিরীশ্বরবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধেরা—জৈন, সাংখ্যবাদী, বৈশেষিক মতাবলম্বী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের দার্শনিক পণ্ডিতগণ সকলেই পরাস্ত হইয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করের রচিত বেদান্তের ভাষ্য পড়িয়া আধুনিক যুগের জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যদেশীয় পণ্ডিতগণও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ জার্মাণ মনীষী ডক্টর পল্ ডয়সন্ (Dr. Paul Duessen) এবং মোক্ষমূলার (Max Mueller) প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও ভগবান শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।[৪৬]

ষড়দর্শনের মধ্যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতমতই দার্শনিক চিন্তার চরম অভিব্যক্তি। বৌদ্ধযুগের অবসানে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল জাতির লোকের উপরই বেদান্তের শক্তিশালী প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বেদান্তে বিশেষ আকৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়েরই মূলভিত্তি এই বেদান্তসূত্র। মানবের চিন্তা অদ্বৈত বেদন্তাতত্ত্ব অপেক্ষা আর উচ্চতর স্তরে উঠিতে পারে নাই। অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বেদান্তদর্শনে গ্রীক্ দার্শনিক

৪৬। পণ্ডিত পল্ ডয়সন্ আচার্য শঙ্করের ভাষ্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন: 'Sankara's commentaries are equal in rank to Plato and Kant.'

অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলিয়াছেন: 'Sankara the author of the great commentary knows how to reason accurately and logically and would be able to hold his own against any opponent whether Indian or European.'

পিথাগোরস্ (Pythagoras) ও ইলিয়াটিক (Eleatic) সম্প্রদায়ের যাবতীয় দার্শনিক উচ্চতত্ত্ব সমূহ পাওয়া যায়। প্রফেসার হপ্‌কিন্স্ বলেন : "থেলেস্ (Thales) ও পারমানিডাস্ (Parmenides) ব্যাখ্যাত সকল প্রকার দার্শনিক চিন্তার ও তত্ত্বের সহিত হিন্দুদার্শনিকগণ বহু পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। গ্রীক্ ইলিয়াটিক্ (Eleatic) দর্শন যেন উপনিষদেরই ছায়া। খুব সম্ভব অ্যানাক্সমেণ্ডার্ (Anaxamander) ও হিরাক্লিটাসের (Heraclitus) দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তন গ্রীস্ দেশে প্রথম হয় নাই।' ফ্রেডারিক স্কেলেগেল্ (Frederic Schlegel) লিখিয়াছেন : "বেদান্ত প্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্মের একত্ববাদ মানুষকে সংসারের ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্যেও তাহার প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব অনুভূতির জন্য সর্বদা কর্মতৎপর হইতে উৎসাহিত করিতেছে। ভারতীয় দর্শনের সহিত তুলনায় পাশ্চত্ত্য দার্শনিক প্রতিভার পূর্ণবিকাশ এবং গ্রীক্ যুক্তিবিজ্ঞানের আদর্শ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্যের সম্মুখে নির্বাণোন্মুখ প্রদীপশিখার ন্যায় ম্লান বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।"

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অদ্বৈত বেদান্তমতে দেশ, কাল ও নিমিত্তের অতীত জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও সম্বন্ধরহিত সচ্চিদানন্দের অক্ষয় উৎসস্বরূপ নিস্প্রপঞ্চ এক অনাদি অনন্ত সত্তা বিদ্যমান। সংস্কৃত ভাষায় এই অনাদি অনন্ত নির্বিশেষ সত্তাকে ব্রহ্ম (অর্থাৎ বৃহৎ বা অনন্ত) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্লেটো (Plato), কাণ্ট (Kant) প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মনীষিগণ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সেই এক অনাদি নাম ও রূপহীন পরমব্রহ্মের সন্ধান করিয়া তাঁহাকে নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী এক এক নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই অচিন্ত্য ও অবিকারী চিৎসত্তাকেই প্লেটো 'পরমমঙ্গল' (Good) বলিয়াছেন। শোপেনহাওয়ার

ইহাকেই 'অসীম ইচ্ছাশক্তি' (Will), স্পিনোজা (Spinoza) 'জগতের মূলসত্তা' (Substantia) বলিয়াছেন। কাণ্টের 'স্বরূপ সত্তা' (Thing-in-itself), এমার্সনের 'পরমাত্মা' (Over-soul), হার্বার্ট স্পেন্সারের (Herbert Spencer) 'অজ্ঞেয়তত্ত্ব' (Unknowable) সমস্তই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মেরই বিভিন্ন আখ্যামাত্র। এই পরমব্রহ্মই খৃষ্টানদিগের 'স্বর্গস্থ পরমপিতা' (Heavenly Father) ও মুসলমানদিগের 'আল্লা'। নিত্যমুক্ত অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এই অবিনাশী সত্তাই বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি দেবমানবগণের প্রকৃত স্বরূপ। এই এক ব্রহ্মসত্তাই বিশ্বচরাচরে সর্বত্র ওতঃপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত। পরমব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন। ইনিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ ও প্রকৃত অধিষ্ঠান।

তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা দেখা যায় যে, কাণ্টের দার্শনিক মতবাদ অপেক্ষা বেদান্তেই অনেক গভীর ও সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, কাণ্ট আপনার দার্শনিক পরিভাষা অনুযায়ী 'অহং' Ego-এর সংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আকর ও মননাত্মক পদার্থনিচয়ের (forms of intuition) যেভাবে সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত, ইহা বেদান্তে প্রমাণিত হইয়াছে। বেদান্তপ্রতিপাদ্য পরমাত্মা 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' —বাক্য ও মনের অগোচর। অন্যদিক দিয়াও কাণ্টের মতবাদ হইতে বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপসত্তা (Thing-in-itself of the objective Reality) ও অতীন্দ্রিয় পারমার্থিক সত্তা (Thing-in-itself of the subjective Reality) যে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, ইহা কাণ্টের দার্শনিক মতবাদে প্রতিপন্ন হয় নাই।[৪৭] বৈদান্তিকগণ ভিন্ন জগতের

৪৭। স্বামী অভেদানন্দ-প্রণীত *Path of Realization* পুস্তকের Search after Truth অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কোন দার্শনিকই পারমার্থিক ও ব্যবহারিক সত্তার স্বরূপগত ঐক্য ও অভিন্নত্ব এমন স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইখানেই বেদান্তের অপরূপতা। বেদান্তের এই অপরূপতা লক্ষ্য করিয়াই জার্মাণ পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলিয়াছেন: "পৃথিবীর যাবতীয় দর্শনের তুলনায় বেদান্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে বেদান্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই এমন কোনও দর্শন নাই।"[৪৮] অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই স্থূল ও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও জীবাত্মা ও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির প্রতীয়মান অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র বেদান্তদর্শনই দৃঢ়তা ও সাহসের সহিত বলিয়াছে:

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি নাহং।"

*   *   *

"অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো,
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্॥"[৪৯]

বেদান্তদর্শন ভিন্ন আর অন্য কোন দর্শনে আত্মার মহিমা ও তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এমন গভীরভাবে আলোচনা হয় নাই। এবিষয়ে আচার্য শঙ্করের প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন-জগতে এক অপূর্ব স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্যান্য দার্শনিকদের কথা দূরে থাকুক, এমন কি, প্লেটো (Plato), কাণ্ট (Kant), স্পিনোজা (Spinoza) হেগেল (Hegel), শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে এত উচ্চ স্তরে উঠিতে পারেন নাই। ভারতের ঋষিবৃন্দ কিন্তু অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি

৪৮। F. Max Mueller: *Six Systems of Indian Philosophy.* p. 223.

৪৯। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য: নির্বাণষটকম্ ১, ৬

দ্বারা মনোরাজ্যকে অতিক্রম করিয়া 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে অবাধে বিহার করিতেন। বেদান্তের আলোচনাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মোক্ষমূলারও (Max-mueller) বলিতে বাধ্য হইয়াছেন: "আদি ও অন্তে সেই বিশুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ 'একমেবাদ্বিতীয়ং' আত্মা বা ব্রহ্মের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চিত হইয়া এবং সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ঝঞ্ঝা ও বজ্রাঘাতে অবিচলিত ও অকম্পিত থাকিয়া স্তরের পর স্তর দার্শনিক চিন্তার অভ্রভেদী মহাসৌধ রচনা করিতে ও পরমতত্ত্বের উপলব্ধি বিষয়ে উপদেশ করিতে বেদান্তই একমাত্র সক্ষম হইয়াছে। আমাদের পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ—এমনকি প্লেটো, হিরাক্লিটাস্, কাণ্ট, হেগেল পর্যন্তও দার্শনিক চিন্তার এত উচ্চস্তরে উঠিতে পারেন নাই।"[৫০]

অদ্বৈত বেদান্তে যদিও স্বর্গ ও মর্ত্য, মানুষ ও ঈশ্বর, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন তথাপি তাহাদের ব্যবহারিক সত্তাকে অস্বীকার করা হয় নাই। অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্তমতে পারমার্থিক সত্তায় তাহাদের নানাত্ব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ব্যবহারিক সত্তায় পরস্পরের মধ্যে আপাত ভেদ স্বীকার করা হয়। তাহা ছাড়া বেদান্ত বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার ও চরম সিদ্ধান্তগুলির সহিতও তাহার যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে একথাও বলে যে, সত্য কখনও বহু নয়, এক; তবে তাহা ভিন্ন রূপে এবং বিচিত্রভাবে আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র। ইহা ছাড়া বেদান্ত কেবল বিজ্ঞানের কার্য-কারণসূত্রে গাঁথা অনুমান-প্রতিপন্ন ঘটনাবলীর নির্ণয় করিয়া বহির্জগতের একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা মাত্র আবিষ্কারেই ক্ষান্ত

৫০। F. Max Mueller: *Six Systems of Indian Philosophy*, P. 239.

হয় নাই, অথবা যে প্রাকৃতিক ঘটনাবৈচিত্র্যের দ্বারা এই বিরাট বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা তাহাদের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ ও সার্বভৌমিক নিয়ম দ্বারা যাচাই করাই বেদান্তের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু জানাজানির এ পার্থিব রাজ্য হইতে মানব-মনকে অতীন্দ্রিয় ও অপার্থিব এক জ্ঞান-সাম্রাজ্যে লইয়া যাওয়াই তাহার চরম উদ্দেশ্য।

এখন আমরা যে রাজ্যে বাস করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ জানাজানির আপেক্ষিক জগৎ, কাজেই যে দর্শন কেবল এই পার্থিব জগতেরই নিয়ম-কানুন উপদেশ দিয়া থাকে, তাহা কখনও সর্বোচ্চ দর্শন হইতে পারে না। তবে পার্থিব জ্ঞানরাজ্যের নিয়ম-পদ্ধতিও আমাদের জানা উচিত; কেননা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সংসারে আমরা বাস করিতেছি। কিন্তু তথাপি পরিচ্ছিন্ন এই ঐন্দ্রিয়িক রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উন্নীত হইবার আকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ প্রচেষ্টা থাকা আমাদের কর্তব্য। আর এইরূপ আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টায় যে কোন দর্শন আমাদের সহায়তা করিয়া থাকে তাহা অবশ্যই সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে পরিগণিত; কেননা সাধারণ দর্শনশাস্ত্র অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান কিছুই বলিতে পারে না, তাহা এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানরাজ্যের পরিধিতেই আমাদের সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র বেদান্তদর্শনই মানুষের মনকে বিষয়জ্ঞানের পরপারে অদ্বৈত অনুভূতির ভূমিতে লইয়া যায়—যেখানে মানবের 'ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ'—সকল সন্দেহ ছিন্নবিছিন্ন হইয়া যায় ও সকল সমস্যার সমাধান হয়। বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলিকে ভিত্তি করিয়া ভারতের অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি ও সাধক পণ্ডিতগণ তর্ক-যুক্তির সহায়ে জীবাত্মার ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নির্ণয় এবং সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্রকৃত যাহা দর্শনশাস্ত্র তাহার মতবাদ কোন রূপেই হেঁয়ালিপূর্ণ না হইয়া সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও সরল হওয়া চাই। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহা এই জগতের জটিল সমস্যাসমূহ এমনই ভাবে বুঝাইয়া দিবে যাহা আপেক্ষিক জ্ঞানসম্পন্ন বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহের সাধ্যাতীত। সত্যকার দর্শনশাস্ত্র মানবজীবনের চরম লক্ষ্যকে প্রতিহত না করিয়া বিশ্বজনীন ধর্মের সর্বোচ্চ ভাবের সহিত সর্বদা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে। ব্যাপকভাবে বলিতে গেলে যাহা প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র তাহার অবশ্যকরণীয় এই তিনটিই থাকা চাই। যেমন প্রথমতঃ জড়বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া কতকগুলি সার্বজনীন নিয়ম আবিষ্কার দ্বারা জগতের সমস্ত রহস্য বিশ্লেষণ করা। দর্শন-শাস্ত্রের এই কার্যব্যাপার হার্বার্ট স্পেন্সার অতি সুন্দরভাবে সমাধা করিয়াছেন। কিন্তু জীবনের যে সমস্ত জটিল ও দুরূহ সমস্যার সমাধানে বড় বড় মনীষীরাও হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন সেগুলির মীমাংসা করা দূরে থাকুক, তিনি তাহার কোন আলোচনা পর্যন্তও করেন নাই। অথচ এই সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধানের উপরই মানব-জীবনের সার্থকতা অনেক পরিমাণেই নির্ভর করে। কাজেই আত্মার অশান্তিকর সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সাধন করিয়াছে যেসব দর্শনশাস্ত্র তাহা অধ্যয়ন ও সেই আদর্শ অনুযায়ী জীবন গঠন করা মানুষ-মাত্রেরই কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি নির্ধারণও দর্শনশাস্ত্রের একটি বিশেষ কার্য। কোন পুস্তক পাঠ করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে পাঠকদের জ্ঞান থাকিতে পারে। কিন্তু সেই জ্ঞানের কোথা হইতে উৎপত্তি সে সম্বন্ধে অনেকেরই হয়তো জানা নাই। জগতের বহু বিখ্যাত মনীষীও এই সম্বন্ধে উত্তর দিতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যান। মন কি পরিমাণে ও কিভাবে এই জগৎকে জানিতে পারে? এ জ্ঞানের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং জ্ঞানলাভের উপায় কি?

—এই সব প্রশ্ন দর্শনশাস্ত্রের যে শাখা মীমাংসা করিয়া থাকে তাহাকে *Epistemology* বা জ্ঞানতত্ত্ব নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কাণ্ট, হেগেল, ফিক্টে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশের সুবিখ্যাত দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রের এই দিকটি লইয়া বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক জর্জ ক্রুম রবার্টসন, তাঁহার *Elements of General Philosophy* গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "জ্ঞানতত্ত্বই প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র। কারণ দর্শনশাস্ত্রের এই শাখাই বস্তু ও বস্তুর সত্তা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান, বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়—এই সকল বিষয় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে। জ্ঞানতত্ত্ববিৎ এইপ্রকারে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় বস্তুর বাস্তব সত্তা খুঁজিবেন। কারণ জ্ঞানতত্ত্বসম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ কোনও বস্তুর গুণ, কর্ম, স্বভাব ও স্বরূপ লইয়াও আলোচনা করিতে বাধ্য। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইতে বাধ্য। কেননা নাম-রূপের অতীত যাবতীয় তত্ত্বের সমগ্রতার সহিতই তাঁহাকে পরিচিত হইতে হয়। তিনি প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক সুতরাং জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনকারী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কারণ তাঁহার এমন এক সত্যকে জানিবার জন্যই আত্মনিয়োগ করা উচিত, যাহার সহিত জড় বিজ্ঞানের কোনই সম্বন্ধ নাই।" জড়বিজ্ঞান তাহার বিভিন্ন শাখার সাহায্যে আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দেয় ইহা সত্য, কিন্তু এইখানেই তাহার গতিরোধ হয়—সে আর অধিকদূর যাইতে পারে না। জড়বিজ্ঞানের গতি যেখানে শেষ হয়, সেখান হইতেই দর্শনশাস্ত্রের সূচনা।[৫১] পরিদৃশ্যমান জগতে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে সীমাবদ্ধ মনকে বাক্য-মনের অগোচর অতীন্দ্রিয় ভূমি বা

৫১। আবার যেখানে দর্শনশাস্ত্রের পরিধি শেষ হয় সেখান হইতেই প্রকৃত ধর্মের আরম্ভ হয়।

ভগবানের রাজ্যে[৫২] লইয়া যাওয়াই দর্শনশাস্ত্রের তৃতীয় কার্য। জড় জগতের মূল কারণ, জীবের উৎপত্তি, জাগতিক ক্রমবিকাশের উদ্দেশ্য ও জন্ম-মৃত্যুরহস্য প্রভৃতি সমস্যার সমাধান আপেক্ষিক জগতের মধ্যে অসম্ভব। এক নিরপেক্ষ অদ্বৈততত্ত্ব জানিলেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়।

যুক্তি ও বিচারের সহায়ে অধ্যাত্মরাজ্যের তত্ত্ব আলোচনাই কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের মূল যে অবিদ্যা ও 'আমি ও আমার জ্ঞান' তাহা হইতে মানব-মনকে মুক্ত করিয়া অপরিচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা দর্শনশাস্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য। দেশ-কালাতীত পরম পরিপূর্ণ সত্যের দিকে চালিত করিয়া জীবাত্মাকে স্বরূপ উপলব্ধি দ্বারা অদ্বৈত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করাই দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। বেদান্ত ভিন্ন অন্য কোন দর্শনশাস্ত্রই এই ত্রিবিধ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করে না। এই কারণে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম ও দার্শনিক মতের মধ্যে একমাত্র অদ্বৈত বেদান্তই সর্বাঙ্গসুন্দর।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকিতে পারে না। পরন্তু উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকাই সম্ভব। ধর্ম ও দর্শনে সামঞ্জস্য বিধানে প্রয়াসী মনীষী আর্নেষ্ট হেকেল তাঁহার *Riddle of the Universe* (বিশ্বপ্রহেলিকা) নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যাহা জগতের একমাত্র মূল উপাদান তাহা অজ্ঞেয়। তিনি বিশ্বজগতের চৈতন্য সত্তা ব্রহ্মের অস্তিত্ব অস্বীকার করায় তাঁহার মতও একদেশদর্শী হইয়াছে।[৫৩] হেকেলের বর্ণিত চৈতন্যবিহীন মূল

৫২। ভগবানের রাজ্য অর্থে এখানে আত্মস্বরূপে।

৫৩। Vide Swami Abhedananda : *Self-knowledge* : Spirit and Matter. *

কারণের সহিত সাংখ্যদর্শনের 'প্রকৃতি'-র বহুলাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ যাহা হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি তাহা অখণ্ড চৈতন্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতেই পারে না। অদ্বৈত বেদান্তকে ভিত্তি করিয়া বেদান্ত এক সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সাংখ্য প্রতিপাদ্য 'বহুপুরুষ'-বাদ বা অনাদি অনন্ত অসংখ্য আত্মার স্বাতন্ত্র্য বেদান্তমতে স্বীকার করা হয় নাই। অকাট্য যুক্তি ও তর্কশক্তি দ্বারা বেদান্ত প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, অনন্ত এক ভিন্ন বহু হইতে পারে না। সুতরাং অসংখ্য অনন্ত আত্মা বা 'বহু পুরুষের' পৃথক সত্তা থাকা অসম্ভব। এক অনন্ত সত্তাই 'বহু'-রূপে প্রকাশিত হইতেছে। বেদান্ত মতে এক ব্রহ্ম বিশ্বস্বরূপ এবং বহু জীবাত্মা পরব্রহ্মেরই অভিন্ন প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ব্রহ্ম হইতেই এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মই স্থিতি এবং পরিণামে আবার ব্রহ্মেতেই তাহার বিলয় প্রাপ্তি।

বেদান্ত মতেও ঈশ্বর অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছে। ইঁহাকেই বেদে সকলের অগ্রজ যাবতীয় জীবের একমাত্র অধীশ্বর হিরণ্যগর্ভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।[৫৪] জাগতিক ক্রমাভিব্যক্তির মূলে আছে ইঁহারই বিরাট মনে অদ্ভুত সৃষ্টির সঙ্কল্প। তাঁহার প্রেম সর্বভূতের প্রতি সমানভাবে প্রকাশিত এবং তিনিই আবার জীবের (মানবের) আরাধ্য ও প্রেমের দ্বারা বরণীয়।

সাংখ্যদর্শনের 'প্রকৃতি'-কেই মায়া বলা যায়। কিন্তু বেদান্তমতে ঐ মায়া অখণ্ড ব্রহ্মেরই শক্তি। 'মায়া' অর্থে সুবিদ্বান ও শিক্ষিত

৫৪। 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্তাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকাসীৎ।'

—ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১২১ সূক্তে, ১ম মন্ত্র

ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ 'আকাশকুসুম' অথবা শশকের শৃঙ্গের ন্যায় কোন অলীক বস্তু মনে করিয়া থাকেন। দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া এবং কার্য-কারণ নিয়মের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই প্রপঞ্চাত্মক জগৎ যে অনির্বচনীয় ব্রহ্মশক্তির প্রভাবে ব্যবহারিক সত্তারূপে প্রতীয়মান হয় তাহাকেই 'মায়া' বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদান্ত একদিকে যেরূপ দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে অন্যদিকে সেরূপ ধর্ম প্রচারও করিয়া থাকে। আসলে ধর্ম ও দর্শন একই জ্ঞানরূপ বৃক্ষের ফুল ও ফলস্বরূপ। দর্শনশাস্ত্রের সাধনার দিককেই (practical side) বলে 'ধর্ম' এবং ধর্মতত্ত্বের যথাযথ সূক্ষ্ম বিচার প্রণালীই 'দর্শন' নামে অভিহিত।

কতকগুলি মতবাদে বিশ্বাসী অথবা চিন্তাশীল বা যুক্তি ও বিচার-সম্পন্ন হইলেই ভারতবর্ষে কেহ দার্শনিক নামে অভিহিত হইতে পারেন না। যিনি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের সাধনায় রত থাকিয়া আপন দার্শনিক মতের অনুযায়ী অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হন, এমন ব্যক্তিকেই ভারতবর্ষে 'দার্শনিক' বলা হয়। ভারতবর্ষে 'দার্শনিক' আখ্যায় অভিহিত ব্যক্তি স্বীয় তপস্যালব্ধ অনুভূতির দ্বারা দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য সত্যকে স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিয়া থাকেন। স্বায় জীবনে দর্শনশাস্ত্রের মতবাদ ও আদর্শকে প্রতিভাত করা যায় এমন অনেক দর্শনশাস্ত্র আজ পর্যন্ত একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন, মহর্ষি কণাদের মতাবলম্বী বৈশেষিক দর্শনবাদিরা শুধু দার্শনিক আলাপ-আলোচনা করেন না পরন্তু ঐ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার ও জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনায় প্রকাশিত করার জন্য সাধনা করিয়া থাকেন। সাংখ্য অথবা বেদান্তবাদিগণও আপন

আপন দার্শনিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য তপস্যাময় জীবন যাপন করেন। ভারতবর্ষের দার্শনিকগণের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা দর্শনশাস্ত্র নির্ধারিত তর্কবিচারেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে না পারিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য কায়মনো-প্রাণে আপনাদিগকে অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত করেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে একটা ব্যবধান থাকায় আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না রাখিয়াও শুধু গভীর চিন্তাশীলতার ফলস্বরূপ তাঁহার মতবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেই দার্শনিক নামে অভিহিত হওয়া যায়। চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতিহীন এবং শুধুই চিন্তশীল, মনীষাসম্পন্ন ও সাধারণ সংসারীর ন্যায় জীবনযাপনকারী কোনও সুবিদ্বান ব্যক্তি ভারতবর্ষে দার্শনিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। আমার কোনও বন্ধুকে আমেরিকায় এক বক্তৃতাকালে জনৈক শ্রোতা প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "ভারতবর্ষে আমেরিকাবাসী মনীষী এমার্সনের (Ralph Waldo Emerson) মতন দার্শনিক কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি?" সেই প্রশ্নের উত্তরে আমার বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকায় আজ পর্যন্ত একজন মাত্রই এমার্সন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে কিন্তু প্রত্যেক পাঁচ মাইল অন্তর এরূপ এমার্সন এখনও পর্যন্ত বর্তমান। এই উক্তি আদৌ অতিরঞ্জিত নহে। কারণ ভারতের দার্শনিকগণ শুধু মহামনীষী পণ্ডিতই নহেন, তাঁহারা প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন ও দর্শনশাস্ত্রের জীবন্ত প্রতিমূর্তিও বটে।

হিন্দুগণ সাধারণতঃ ন্যায়দর্শন অনুযায়ী বিচারপ্রণালীর প্রতি অনুরাগী। যুক্তিবিরুদ্ধ অন্যায় বা অসঙ্গত কোন তত্ত্বই তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না বলিয়া অলৌকিক বা তর্কবিচার বিরুদ্ধ এমন কোন মতও

অদ্বৈত বেদান্তদর্শনে স্থান পায় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈদিক যুগ হইতেই হিন্দুগণ স্বাধীন চিন্তাপরায়ণ। খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষে যুক্তিতর্ক বিরোধি আপনাদের অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার করেন এবং ফলে প্রবল যুক্তিসম্পন্ন প্রতিবাদের দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া আপনাদের মতবাদ প্রচার হইতে সর্বত্র নিরস্ত হন। বাইবেল বর্ণিত মাত্র ছয়দিনেই জগৎ সৃষ্টির অলীক কাহিনী এবং খৃষ্টানধর্ম বহির্ভূত অপর সকল ব্যক্তিদের অনন্তকাল নরক ভোগ প্রভৃতি গোঁড়ামিপূর্ণ মত ও বিশ্বাসের কথা শুনিয়া হিন্দুরা সেই সমস্তকে অজ্ঞতাপূর্ণ প্রলাপ মনে করেন ও উপেক্ষাভরে হাস্যই করেন।

সর্ববিধ দার্শনিক মতবাদ এমনকি আধুনিক জড়বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলির সহিত সার্বভৌমিক আদর্শসম্পন্ন অদ্বৈত বেদান্তদর্শনের সম্পূর্ণ ঐক্য বর্তমান আছে। এই বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তের আর তুলনা নাই। এক বেদান্তশাস্ত্রেই হিন্দুগণ পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মভাব দর্শন ও বিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তগুলির সন্ধান পাইয়া থাকেন। মানবের জন্ম-মৃত্যু-রহস্য, আত্মার স্বরূপতত্ত্ব অথবা পরিণাম প্রভৃতি নানা জটিল সমস্যার সঠিক সমাধান প্রদান করিতে পারে বলিয়াই বেদান্ত সর্বজনপ্রিয়। বেদান্তের মতে নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মা স্বরূপতঃ যদি অমর অবিনাশী না হইয়া মরণশীল হইত, তাহা হইলে তাহা অমরত্ব লাভ করিতে পারিত না। বেদান্ত বলেন, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই এবং ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই। যাহার জন্ম আছে তাহার মৃত্যু হইবেই, আর যাহার সৃষ্টি হয় তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই বিনাশশীল। এই যুক্তি হিন্দুদের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াও স্বধর্মত্যাগী হিন্দুরা কিন্তু কোনক্রমেই

বিশ্বাস করিতে পারেন না—'অমৃতের পুত্র মানবের আত্মা একমাত্র যীশুখৃষ্টের করুণার দ্বারাই অমর হইতে পারে।'

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক মতবাদের মধ্যে বেদান্তই বহুল-প্রচলিত এবং বেদান্ত মতাবলম্বীদের সংখ্যা অন্য-মতাবলম্বীদের সংখ্যার তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের অবনতিকালে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ভগবান শ্রীমৎশঙ্করাচার্য কর্তৃক পুনঃপ্রচারিত বেদান্তদর্শন অন্যান্য দার্শনিক মতকে আপনার উদ্ভিন্ন আলোকে ম্লান করিয়া দিয়া আজও আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উচ্চ নীচ সকল শ্রেণী ও বর্ণের হিন্দুদের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া বর্তমান আছে। অধ্যাপক মোক্ষ মূলার তাঁহার *Six Systems of Indian Philosophy* বা 'ভারতবর্ষের ষড়দর্শন' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষে অন্যান্য দর্শনের প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু বেদান্তের প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক ও অধিকসংখ্যক লোকই বৈদান্তিক।" তিনি আরও বলিয়াছেন: "বেদান্ত একাধারে ধর্ম ও দর্শন উভয়ই। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈদান্তিকমাত্রেই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই সত্য হইল জনসাধারণে সত্য বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকে সেই প্রকার সত্য, তাহা বৌদ্ধ মতবাদের ন্যায় মোটেই অলীক বা শূন্য নহে। বেদান্তমতে জীব ও জগতের অস্তিত্ব আপেক্ষিক হইলেও নিরর্থক নয়। বেদান্ত মানব-জীবনে কর্মদ্বারা উৎকর্ষ লাভের জন্য বস্তুত কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ করিয়া দেয় এবং এই নশ্বর জীবনে যতদূর সম্ভব সমস্ত কঠোর নিয়মসমূহ প্রতিপালন করিতেও শিক্ষা দান করে। ইহা জ্ঞান ও ভক্তির সম্পূর্ণ সমন্বয় সাধন করে এবং অন্যান্য ধর্মের ন্যায় এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান

ও মহিমময় পরমেশ্বরকে উপাস্য দেবতা বলিয়া থাকে। বেদান্ত কেবল কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষহীন ও তাহার অবিরোধী নয়, সকল ধর্মমতেরই ইহাতে যথাযথ স্থান আছে।"৫৫

৫৫। Max Mueller; *Three Lectures on Vedanta Philosophy.*

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বর্তমান ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ॥

বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্মমত ও সম্প্রদায় বর্তমান আছে তাহাদের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে ভারতের ভৌগোলিক আয়তন সম্বন্ধে একটু আভাস দেওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। তাহার কারণ, ভারতবর্ষ যে কী বিশাল আয়তনবিশিষ্ট দেশ, সে সম্বন্ধে ভারত বহির্ভূত দেশসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই সঠিক ধারণা আছে। ভারতবর্ষকে যদি ইংরাজশাসিত ব্রহ্মদেশের সহিত অন্তর্ভুক্ত করা যায় তাহা হইলে রাশিয়াকে বাদ দিয়া ইউরোপের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহার সহিত ভারতবর্ষের আকার সমান হইবে। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, আমেরিকা যুক্তরাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভূভাগের সহিত ভারতের ভৌগোলিক আকার সমান আয়তনবিশিষ্ট। কিন্তু ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণের সংখ্যা অপেক্ষা সাড়ে তিনগুণ অধিক। পৃথক জাতি ও ভাষার সমবায়ে গঠিত ভারতবর্ষের জাতিবৈচিত্র্য আমেরিকা অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোনও দেশ হইতে বৈচিত্র্যময়। ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদী, পারসীক (জরথুষ্ট্রের মতাবলম্বী), বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও হিন্দু প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে[১] ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এইরূপ :

১। বিগত ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতে লোকগণনার হিসাব :

হিন্দু	...	...	২৫৪,৯৩০,৫০৬

খৃষ্টান	...	...	২,৯২৩,২৪১
মুসলমান	...	...	৬২,৪৫৮,০৭৭
ইহুদী	...	...	১৮,২২৮
পারসীক	...	...	৯৪,১৯০
বৌদ্ধ (প্রধানতঃ ব্রহ্মদেশে)			৯,৪৭৬,৭৫৯
জৈন	...	...	১,৩৩৪,১৪৮
শিখ	...	...	২,১৯৫,৩৩৯
হিন্দু	...	...	২০৭,১৪৭,০২৬

ভারতবর্ষে ইহুদীরা অনেকেই কলিকাতা, বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করে। পারসীকদের প্রধানতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধদের সংখ্যা ব্রহ্মে শকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে অত্যন্ত অল্পই হইবে। ইহা . ভারতের আদিম অনার্য অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। ইহারা নিজেদের পূর্বপুরুষ ও ভূতপ্রেতের পূজা করিয়া থাকে। ভারতের সর্বাধিক সংখ্যক অথিবাসীরা 'হিন্দু' নামে অভিহিত। 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম এই দুইটি শব্দই বৈদেশিক

মুসলমান	...	...	৯২০,৫৮,০৯৬
খৃষ্টান	...	...	৬,৩১৬,৫৪৯
শিখ	...	...	৫,৬৯১,৪৪৭
জৈন	...	...	১,৪৪৯,২৮৬
পারসীক	...	...	১১৪,৮৯০
বৌদ্ধ	...	...	২৩২,০০৩
ইহুদী	...	...	২২,৪৮০
উপজাতি	...	...	২৫,৪৪১,৪৮৯
অন্যান্য	...	...	৪০৯,৮৭৭

সূত্র হইতে উৎপন্ন। প্রাচীনকালে যখন (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে) পারসীক এবং গ্রীকেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তাঁহাদিগকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত সিন্ধুনদ পার হইয়া আসিতে হইয়াছিল। এই সিন্ধুনদ এক্ষণে ইংরেজী ভাষায় 'Indus' নামে অভিহিত। সেইজন্য সিন্ধুনদের তীরে যাহারা বাস করিত তাহাদিগকে 'হিন্দু' এবং তাহাদের দেশকে 'হিন্দুস্থান' বলিত। 'হিন্দু' ও 'হিন্দুধর্ম' এই দুইটি শব্দের উৎপত্তির কারণ জানিতে পারিলে আমরা বুঝিতে পারিব ঐ দুই শব্দদ্বারা প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদের নির্দেশ করে না। ভারতবাসীরা আপনাদিগকে 'হিন্দু শব্দের পরিবর্তে 'আর্য' বলিয়া অভিহিত করেন। যে প্রাচীন আর্য পরিবার হইতে এ্যাংলো-স্যাক্সন্, জার্মাণ এবং লাটিন প্রভৃতি জাতিদের উদ্ভব, ভারতের বর্তমান অধিবাসিগণ সেই প্রাচীন আর্যপরিবারের বংশধর। অনেকের মতে ভারতীয় আর্যগণ প্রধানতঃ মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহারা উত্তর মেরু হইতে আসিয়াছিলেন, অপর কাহারও মতে তাঁহারা ইউরোপ হইতেই ভারতে গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় আর্যজাতিদের পূর্বপুরুষগণ সর্বপ্রথম কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই।

সুতরাং 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা বর্তমান ভারতবাসী ও 'আর্য' নামে যাঁহারা পরিচয় দান করেন সেই ভারতীয় আর্যগণকেই নির্দেশ করে। তাঁহারা আপনাদের অবলম্বিত ধর্মকে 'আর্যধর্ম' অথবা 'সনাতন ধর্ম' বলিয়া থাকেন। সনাতন ধর্মের অর্থ—যে ধর্ম চিরকাল বর্তমান থাকে। হিন্দুদের বিশ্বাস এই ধর্ম চিরন্তন; অনাদিকাল হইতেই বর্তমান এবং যে পর্যন্ত এই জগৎ থাকিবে সে পর্যন্ত ইহাও বর্তমান থাকিবে। কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, হিন্দুধর্ম নৈসর্গিক বা প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত। কিন্তু আমরা যদি

ঐ সমস্ত তথাকথিত অলৌকিক ধর্মসমূহের উৎপত্তি কোথা হইতে, ইহা নির্ণয় করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিব যে, যখন জগতের অন্য কোন দেশে কোনও জাতির মধ্যে ধর্মভাব বলিয়া কিছুই ছিল না সেই সুদূর অতীতেও সকল ধর্মমতের আদিভূমি এই ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম সমুন্নত আকারে বর্তমান ছিল এবং এই ভারতের সহিত ঐ ধর্ম সকলের কোন-না-কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল।

বর্তমানে ভারতবর্ষে 'হিন্দুধর্ম' নামে সর্ববিধ ধর্মমতের পুঞ্জিভূত আধার এক আধ্যাত্মিক আদর্শ এখনও বর্তমান। বহু বহু দীর্ঘশাখা-প্রসারী বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, এক অদ্বিতীয় ভগবদারাধনা, অবতারবাদ, বীরপূজা, মহাপুরুষ পূজা, পিতৃপুরুষের পূজা, মূর্তিপূজা প্রভৃতিতে বিভক্ত এবং এই সব অসংখ্য পত্রপুঞ্জের ন্যায় অগণিত সাধনা ও উপাসনাপ্রণালীর দ্বারা পরিপূর্ণ। সর্বপ্রকার ধর্মমত গ্রহণের উদার বিশ্বজনীন ভাবের উপর এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা সকল ধর্মমতকেই গ্রহণ করিতে পারে। সুবৃহৎ অতিথিশালার ন্যায় সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন সকল শ্রেণীর সাধক, উপাসক ও ধর্ম-বিশ্বাসীর জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত এবং কোনও দিন ইহার সুবিশাল আয়তনে যথার্থ ধর্মান্বেষীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। মানব-মনে যতপ্রকার ধর্মসাধনার ভাব উঠিতে পারা সম্ভব, সেই সব ধর্মভাবই বর্তমান ভারতে প্রচলিত হিন্দু-ধর্মের আদর্শের মধ্যে বিরাট প্রাসাদ প্রাচীরে কারুকার্যের ন্যায় ক্ষোদিত হইয়া শোভা পাইতেছে। নিতান্ত নিম্নতম ধর্ম-বিশ্বাসও ক্রমিক উন্নতিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে অভিব্যক্তি দ্বারা অবশেষে কিপ্রকারে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনায় পরিণিতি লাভ করে কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে ভারতবর্ষেই তিনি তাহার জীবন্ত ইতিহাস দেখিতে

পাইবেন। ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসীরা কীভাবে জীবন যাপন করেন, তিনি সেখানে গিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখুন। অধ্যাপক মোক্ষ মূলার বলিয়াছেন: "নিতান্ত বর্বর কুসংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ অধ্যাত্মজ্ঞানের অবস্থা পর্যন্ত ধর্মসাধনার এমন কোন দিকই বাকী নাই যাহা ঐদেশে (ভারতবর্ষে) দেখিতে পাওয়া যায় না।" এই বিশ্বজনীন ধর্মকে হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম অথবা অন্য কোন নামে সাধারণতঃ অভিহিত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে এইগুলি ইহার যথার্থ পরিচায়ক নয়। এই (বিশ্বজনীন) ধর্মকে আমরা কিসের জন্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলিব? খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা উদ্ভাবিত এই সকল ভ্রান্তিকর নাম প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদিগের নিকট অর্থহীন শব্দ মাত্র বলিয়াই পরিগণিত কোন ব্রাহ্মণই এই বিশ্বজনীন ধর্মের প্রবর্তক নহেন। বাস্তবিক এই সনাতন ধর্মের বিশেষ কোন নাম নাই এবং ইহার সংস্থাপক বলিয়া এমন কোন বিশেষ ব্যক্তিও নাই। জরথুস্ত্রীয় ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম অথবা মুসলমান ধর্ম ইহাদের প্রত্যেকেরই এক এক জন প্রবর্তক পুরুষ আছেন। ঐসকল মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়াই উঁহাদের ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুজাতির ধর্ম কোন প্রকার পুস্তক অথবা কোন প্রকার ধর্মপ্রবর্তক পুরুষ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। যদি আমরা প্রাচীন বৈদিক যুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের অনুভূতিসমুজ্জ্বল বাণীর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব উক্ত ঋষিগণ তাঁহাদেরও পূর্বতন কোন প্রাচীনতর সত্য-দ্রষ্টা ঋষিদের নির্দেশ করিতেছেন [২] এই কারণেই ভারতীয় আর্যগণের

২। (ক) 'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।'

—শ্বেতাশ্বতর উ ৬।২২

(খ) 'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে।'—ঈশোপনিষৎ ১।১৩

ধর্মমতে নির্বিচারে পালনীয় কোন অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামী প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল না। ঋষিদের বর্ণিত সত্য যে শাশ্বত অনাদি অনন্ত নিয়মসমূহে বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত তাহার সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে এবং শুধু এরূপ তত্ত্বই হিন্দুরা সত্য বলিয়া গ্রহণ ও স্বীকার করিতেন।

প্রথম উন্মেষকাল হইতেই এই হিন্দুধর্ম আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায়ই স্বচ্ছন্দ-গতি বিশিষ্ট ছিল। যেমন অবাধে প্রবাহিত বায়ু সমস্ত পুষ্পের সুগন্ধকে বহন করিয়া সর্বত্র লইয়া যায় সেই প্রকার মানবজাতির কল্যাণকর যাহা কিছু সত্য সে সমস্তকেই এই আর্যধর্ম প্রত্যেক বিষয় হইতে আহরণ করে। ঊর্ধ্বে সুবিস্তৃত আকাশের ন্যায় ইহা সকলদেশের সমগ্রজাতিকে বেষ্টন করিয়া নিখিল ধর্মভাবের পরিবেশের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। কালের প্রাচীনতায়, মহিমায়, গৌরবে এবং সর্বোপরি ঈশ্বর-বোধের উৎকর্ষে এই সনাতন ধর্ম জরথুস্ত্রীয়, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য সকল ধর্মকেই অতিক্রম করিয়াছে। হিন্দুদের উপাস্য দেবতা ঈশ্বর সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সকলের প্রতি করুণাশীল। সকল গুণের অতীত হইয়াও তিনি সর্বগুণাধার। হিন্দুদের ঈশ্বর ইহুদী ও খৃষ্টানদের জেনেসিস্এ (বাইবেলের প্রথম পুস্তকে) বর্ণিত জগৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিকর্তা (extra-cosmic Creator) নহেন। তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বময় ও সমগ্র বিশ্বে ওতপ্রোত। তিনি ইজরেলজাতির উপাস্য ঈশ্বর জাভেজ্ (Jahveh) অপেক্ষা বহুগুণে দয়ালু, অপক্ষপাত, ন্যায়শীল ও ক্ষমাপরায়ণ। পারসীকদের উপাস্য দেবতা আহুরা মাজ্দা অপেক্ষা হিন্দুদের ঈশ্বর অধিকতর কল্যাণকারী এবং শক্তি ও মহিমায় তিনি অসীম। জগতের অন্য সকল প্রচলিত ধর্মমতের ভিত্তিই অবশ্য একেশ্বরবাদ। অপর জাতি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্মভাবে আর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

একেশ্বরবাদের উপলব্ধিতে আসিয়া হিন্দুরা কিন্তু ধর্মসাধনার পথে থামিয়া যান নাই—তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন।

বর্তমানকালে ভারতবাসী আর্যদের ধর্মমতকে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম দুইটি অর্থাৎ দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ধর্মমত হইতে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর (সূর্যোপাসক) প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। অথবা বলা যায়, আর্যধর্মই বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য ও সৌর এইসকল ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি সম্প্রদায় এক্ষণে লুপ্তপ্রায়। হিন্দুজাতির বিশাল নরনারীদিগের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব, শৈব অথবা শাক্তসম্প্রদায়ভুক্ত। বৈষ্ণবেরা সর্বজ্ঞ, সকলের প্রতি প্রেমময়, সর্বশক্তিমান, বিশ্বজগতের প্রভু, শাসক ও প্রতিপালক পরমেশ্বরকে 'বিষ্ণু' (সর্বব্যাপী) নামে উপাসনা করেন। ভগবান বিষ্ণু হিন্দুদের ত্রি-দেবতার মধ্যে দ্বিতীয় দেবতা। 'বিষ্ণু' শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী ও সর্বগ। হিন্দুদের বিশ্বাস অনুসারে নিখিল বিশ্বের অধীশ্বর ভগবান বিষ্ণু সর্বগুণাতীত অথচ সর্বগুণময়। নির্গুণ অবস্থায় ভগবান বিষ্ণু বিশ্বচরাচরের অধিষ্ঠানরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। অণু পরমাণু সকলের মধ্যেই তিনি অনুস্যূত বা অনুপ্রবিষ্ট এবং উদার উদ্ভিন্ন সূর্যালোকের ন্যায় তিনি সর্বদা সর্বত্র বিরাজিত। সগুণভাবে তিনি আপনার বৈকুণ্ঠধামে অধিষ্ঠিত। পৃথিবীতে যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন মানবজাতির কল্যাণের জন্য ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত ও দুষ্কৃতি দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥[৩]

ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ইহাই ভক্তের প্রতি ভগবানের আশ্বাসবাণী।

পাশ্চাত্যদেশের অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মানবদেহে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বর পৃথিবীতে ধর্মস্থাপন করেন—এই ভাবটি খৃষ্টানদের নিকট হইতে হিন্দুরা ধার করিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় দ্বারা প্রমাণিত করা যায় যে, অবতারবাদ সম্বন্ধে হিন্দুদের এই ধারণা যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষই এই অবতারবাদের আদি জন্মভূমি এবং পরবর্তী কালে ইহা অপর সকল ধর্মসম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছে।

হিন্দুরা এই বিশ্বাস পরিপোষণ করেন যে, ঈশ্বর যেমন পূর্ব পূর্ব যুগে বহুবার অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইরূপ প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেকবার অবতীর্ণ হইবেন। প্রাচীন যুগে বহু ঈশ্বরাবতারের আবির্ভাব তাঁহারা যেমন স্বীকার করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ কালেও যে ঈশ্বর বহুবার অবতীর্ণ হইবেন ইহাও তাঁহাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। খৃষ্টানরা মনে করেন ঈশ্বর একবারমাত্র অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ইহাই তাঁহার প্রথম ও সর্বশেষ অবতরণ। এইখানেই হিন্দুদের সহিত খৃষ্টানদের পার্থক্য। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস যে, প্রয়োজন হইলে ঈশ্বর যে কোন দেশে ও যে কোন যুগেই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে পারেন, যেহেতু তাঁহার শক্তি অসীম। যদি আমরা মনে করি ঈশ্বর মাত্র একবারই অবতীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে এই ধারণা দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিব। কিন্তু

৩। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা। ৪।৭-৮

যেহেতু তাঁহার মহিমা ও শক্তি অনন্ত ও অসীম সেইজন্য তাঁহাকে কোন দেশ, কাল অথবা জাতির সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলা উচিত নয়। সকল জাতি ও বর্ণের প্রতি ঈশ্বরের সর্বদাই সমান করুণা। যখনই যে কোন দেশে যে কোন যুগে তাঁহার আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, তখনই সেই যুগে সেই দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। সংস্কৃতভাষায় ঈশ্বরের এই মানবরূপে প্রকাশকে 'অবতার' বলা হয়। মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য পরমেশ্বরের নরদেহে পৃথিবীতে অবতরণ ইহাই 'অবতার' শব্দের অর্থ।

এই সকল ঈশ্বরাবতার সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গেলে রামায়ণ মহাকাব্যের প্রধান নায়ক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে অন্যতম ঈশ্বরাবতাররূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে উত্তর ভারতের বহুস্থানে বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও মধ্য-প্রদেশে লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীরামচন্দ্রকে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার ও মুক্তিদাতারূপে উপাসনা করে। আদর্শ পুত্র, আদর্শ নরপতি, আদর্শ পিতা ও আদর্শ পতিরূপে সকলে তাঁহাকে ভক্তি করে এবং ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁহার পুণ্যনাম জপ করে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় রামনামকীর্তন রামচন্দ্রের উপাসকগণের প্রতিদিনকার অবশ্য পালনীয় ধর্মানুষ্ঠান। এই অবতার পুরুষের বীরত্বকাহিনী তাহারা আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত গান করিয়া থাকে। সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙলা অথবা অন্য ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত রামচন্দ্রের পুণ্য লীলাকাহিনীর কোন কোন অংশ হিন্দুদের গৃহে প্রত্যহই পাঠ ও শ্রবণ করা হয়। হিন্দুগণ সত্যনিষ্ঠার জীবন্ত বিগ্রহ মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের লোকোত্তর জীবনে বিকশিত মহত্ত্ব, পবিত্রতা ও ধর্মভাবের আদর্শকে এবং সুগভীর ধর্মভাবকে আপনাদের জীবনে পরিণত করিবার জন্য প্রত্যহ সাধনা ও অভ্যাস করিয়া থাকেন। সত্যনিষ্ঠার জীবন্ত ও পরিপূর্ণ আদর্শকে

দেখাইবার জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বেচ্ছায় রাজ্য-অধিকার ত্যাগ করিয়া ও সুদীর্ঘ চতুর্দশ বৎসরকাল অরণ্যবাসী হইয়া সুতীব্র তপস্যায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্মিণী সীতাদেবী পবিত্রতা, পতিপ্রাণতা, সংযম ও সতীত্বের পরাকাষ্ঠায় অতুলনীয়া। তিনি ভারতের বালিকা ও বৃদ্ধা সকল হিন্দুনারীদের নিকট নারীত্বের মহিমময় আদর্শরূপে চিরপূজ্যা। রামায়ণ মহাকাব্য পাঠ করিলে আদর্শ সহধর্মিণী ও আদর্শ জননীরূপে সীতাদেবীর অতুলনীয় চরিত্র-মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র জগতে সীতাচরিত্রের ন্যায় আর একটি অপূর্ব চরিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পতিব্রতার আদর্শ প্রদর্শনের জন্য সীতাদেবী স্বীয় স্বামী রামচন্দ্রের জন্য সকল ভোগ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি পবিত্রতা ও সতীত্বের জীবন্ত মূর্তি। মহাবীর হনুমানের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির ভাব জীবন্ত হইয়া প্রকাশিত। খৃষ্টান মিশনারীরা অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া মহাবীর ও ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানের সম্বন্ধে ভ্রান্তিকর নানা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের উপাসকগণ আপনাদের ধর্মনিষ্ঠা ও ভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাবীর হনুমানের পবিত্র জীবনাদর্শকে গ্রহণ ও অনুসরণ করেন। ভগবান রামচন্দ্রের উপাসকগণ 'রামাইৎ বৈষ্ণব' নামে অভিহিত। রামাইৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীরামচন্দ্র ও ভগবান বিষ্ণুকে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন জ্ঞানে ভক্তি করেন।

রামাইৎ বৈষ্ণবগণ ব্যতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বৈষ্ণবদেরও একটি বিরাট সম্প্রদায় ভারতবর্ষে রহিয়াছে। হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। অনুমান ১৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান ছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক কাহিনীপূর্ণ মহাভারত মহাকাব্যে এবং পুরাণ গ্রন্থসমূহে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জন্ম ও মহাজীবনের যে বিচিত্র লীলা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত যীশুখৃষ্টের জন্ম ও জীবনকাহিনীর বহু সাদৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে যেমন বলা যাইতে পারে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত যীশুখৃষ্টের জন্মকালে রাজ্যশাসনকারী রাজা হেরদের (Herod) ন্যায় কংস নামে এক মহা অত্যাচারী রাজা কোন দৈববাণী শ্রবণে ভীত হইয়া নবপ্রসূত সমস্ত শিশুদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনার অলৌকিক শক্তিদ্বারা ভূপতিত মৃতদেহে জীবন দান করিয়াছিলেন। প্রাণী ও মানুষের মৃতদেহে তিনি জীবনী-শক্তি উজ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং আরও অনেক অলৌকিক আশ্চর্য কার্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মানবের দুষ্কৃতিহারী, পাপনাশন ও বিশ্বত্রাতা শ্রীকৃষ্ণের কী গভীর দিব্যজ্ঞান ছিল! খৃষ্টানরা যেভাবে যীশুখৃষ্টকে মুক্তিদাতা বলিয়া মনে করেন হিন্দুরাও ঠিক সেই ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মানবের পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ভক্তরা যেভাবে যীশুখৃষ্টের ভজন নামগান ও বন্দনা করিয়া থাকেন, হিন্দুরাও সেইপ্রকার ভক্তিভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দিবসের অধিকাংশ সময়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য নাম জপ ও তাঁহার ভজন, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্তন, পূজা ও অর্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা উভয়েই জগতের স্রষ্টা ও পালকরূপী ভগবান বিষ্ণুর অবতার। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসিগণ হিন্দুদের ঈশ্বরের এই বহু অবতার স্বীকারের মধ্যে যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা কিছুতেই বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া ভ্রান্ত মত পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুরা

বহু ঈশ্বরের উপাসক নহেন। তাঁহারা একই ঈশ্বরকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন নামে উপাসনা করিয়া থাকেন মাত্র। শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও হিন্দুদের নিকট ঈশ্বরাবতাররূপে পূজিত হন। স্বরূপতঃ এই সকল ইশ্বরাবতারগণ এক ও অভিন্ন হইলেও নাম, রূপ ও পার্থিব লীলায় তাঁহারা আলাদা। খৃষ্টানদের গীর্জার অভ্যন্তরে যীশু ও তাঁহার মাতা মেরীর প্রতিমূর্তির ন্যায় ভারতবর্ষের প্রত্যেক স্থানে অসংখ্য মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টান মিশনারীগণ হিন্দুদের এই সকল দেবমূর্তির মধ্যে নিহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বুঝিতে না পারিয়া অজ্ঞতাবশতঃ হিন্দুদের পৌত্তলিক বলিয়া নানা অসত্য প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনাদের আমি স্পষ্টই বলিয়া দিতেছি যে, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পুতুলপূজা বলিয়া অভিহিত এমন কোন বস্তু ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে—এমন কি, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও নাই। ভারতবর্ষ অপেক্ষা হীনতর পৌত্তলিকতা ইটালীতে খৃষ্টান গীর্জায় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইটালীর খৃষ্টান কৃষকেরা প্রার্থনা সফল না হইলে তাহাদের দেবতা ব্যামবিনোর (Bambino, ইটালীর খৃষ্টান গীর্জায় প্রতিষ্ঠিত নবজাত শিশুরূপী যীশুখৃষ্টের প্রতিমূর্তি) মূর্তির উপর বেত্রাঘাত করিতে থাকে। আমি ধর্মের নামে এই প্রকার অজ্ঞানতা ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নাই। কিন্তু ভারতবাসী হিন্দুরা Idol-এর (জড় পুতুলের) পূজা করেন না, তাঁহারা Ideal-এরই (আধ্যাত্মিক আদর্শেরই) পূজা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরাবতাররূপ মহামানবগণের জীবনের বিচিত্র লীলা ও মহিমা প্রকাশক ভাব উপাসকের চিত্তে জাগ্রত করিবার উদ্দেশে তাঁহাদের মূর্তি বা প্রতিকৃতিসমূহ হিন্দুদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি অথবা দিব্যসত্ত্বাকেই হিন্দুরা পূজা করেন।

যদি আপনারা এই প্রকার মূর্তিপূজক কোনও হিন্দু পুরোহিত অথবা ভক্তকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহার উপাস্য দেবতা কে এবং তিনি কোথায়, তাহা হইলে সেই পুরোহিত উত্তর দিবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্যাপী, তিনি সর্বত্রই সর্বদা বিরাজমান, তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা এবং তিনি কোনও মন্দিরে অথবা কাষ্ঠ বা পাষাণনির্মিত কোনও মূর্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না। এই মনোভাব কি পৌত্তলিকতা? যদি তাহাই হয়, তবে ইহা কোন জাতীয় পৌত্তলিকতা? হিন্দুদের এই সব অনুষ্ঠানকে পৌত্তলিকতা অথবা অলীক দেবতার পূজা বলিয়া অজ্ঞতাপূর্ণ মত প্রকাশ করা খুবই সহজ। কিন্তু কোন ব্যক্তি এই সকল ব্যাপার যদি ঠিক ঠিক ভাবে অনুসন্ধান করেন তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, হিন্দুধর্মের এই সব অনুষ্ঠানের প্রতি অ-হিন্দুদের এরূপ উক্তি কত ভ্রান্তিপূর্ণ। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মনায়ক মহামানবদের প্রতিমূর্তিকে ভক্তি ও প্রণাম নিবেদন করিলে হিন্দুরা যদি পৌত্তলিক বলিয়া নিন্দিত হন, তাহা হইলে যীশুখৃষ্টের প্রতিমূর্তি ও চিত্রের সম্মুখে অবনতজানু হইয়া প্রার্থনাকারী খৃষ্টানরাই বা কেন পৌত্তলিক বলিয়া অভিহিত হইবেন না? যদি স্বস্তিক, ত্রিকোণ, বৃত্ত প্রভৃতি প্রতীকসমূহকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুরা আপনাদের চিত্ত সমাহিত করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া পৌত্তলিক হন, তাহা হইলে গীর্জার বেদীতে প্রতিষ্ঠিত ক্রুশকাষ্ঠেবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের প্রতিমূর্তির চিন্তাকারী খৃষ্টানরা কিসের জন্য পৌত্তলিকতার দোষে দোষী হইবেন না?

ধারণা ও ধ্যান অভ্যাসের সহায়তার জন্য হিন্দুদের মন্দিরের মধ্যে প্রতিমা, প্রতীক ও যন্ত্র প্রভৃতি রক্ষিত হয়। এই প্রকার বিশেষ পূজানুষ্ঠান একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই প্রচলিত। পূজার্চনার জন্য হয়তো কোন বাহ্য চিহ্ন নাও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোনও উপাসক

হয়তো শাস্ত্রবিধি-নির্দিষ্ট আসনে নিমীলিত নেত্রে স্থির ও নিশ্চল হইয়া থাকেন। এই প্রকার উপাসকদের উপাসনা প্রণালী সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী। বাহ্য জগৎ হইতে মনকে প্রত্যাহার দ্বারা পরমাত্মায় সমাহিত করিবার চেষ্টা করিলেও সাধনার প্রথম অবস্থায় এই সকল প্রতিমা ও প্রতীক প্রভৃতির সহায়েই তাঁহাকে চিত্ত স্থির ও একাগ্র করিতে হইবে। কারণ স্থূল বাহ্য বিষয় হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অবশেষে নির্দ্বন্দ্ব নিরপেক্ষ নিষ্প্রপঞ্চ তত্ত্বের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াই মনের স্বাভাবিক গতি। সেইজন্যই হিন্দুদের মন্দিরে বহু প্রতীকের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া আছে। যে ক্রুশচিহ্ন খৃষ্টানদের নিকট পবিত্রতম প্রতীক, যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে তাহার প্রচলন ছিল।[৪] জগতের সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের যত প্রতীক আছে তাহাদের মধ্যে স্বস্তিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ভারতবাসী হিন্দুগণ আমরা এখনও তাহা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহার পর ত্রিকোণ প্রতীক। ইহা হিন্দুদের ঈশ্বরের ত্রয়ী ভাবকে (Trinity) প্রকাশ করে। বৃত্ত অনন্তের ভাব পরিচায়ক। ইহা ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-প্রকাশক বিশেষ বিশেষ আরও অনেক প্রতীক আছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই ধর্মসাধকদের প্রথম অবস্থায় ধারণা ও ধ্যান অভ্যাসের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সহায়ক।

হিন্দুগণ শ্রীকৃষ্ণকে অপার্থিব প্রেমের সর্বভাবময় পরিপূর্ণ আদর্শ বলিয়া মনে করেন। এই অপার্থিব প্রেমের আদর্শকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। সাধারণ সাংসারিক ভালবাসার

৪। এ সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার *The Word and the Cross in Ancient India, Son of God, Necessity of Symbols* প্রভৃতি বক্তৃতায় বিশেষভাবে ঐতিহাসিক প্রমাণ সহায়ে আলোচনা করিয়াছেন।

সম্বন্ধ স্বার্থলেশহীন হইলে অপার্থিব ঐশ্বরিক প্রেমে কেমন করিয়া পরিণতি লাভ করিতে পারে, ইহা দেখাইতেই তিনি আসিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইয়া দিব্যভাব ও অহেতুক পবিত্র প্রেমের লীলা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাহাত্ম্য এখানকার (আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের) লোকেরা বুঝিতে পারিবেন না। ইহা জানিতে হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-ভূমি এবং ব্রজবালক ও ব্রজগোপীদের সহিত তাঁহার দিব্য প্রেমলীলার পবিত্রস্থান মথুরা ও বৃন্দাবনে আমাদিগকে যাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব কীভাবে বৈষ্ণব সাধকগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের পূজা ও ভক্তির ভাব নিবেদন করেন। ঈশ্বরের পূজা ও তাঁহার প্রতি ভক্তির যে ভাব ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কখনও দেখিতে পাওয়া অসম্ভব। আমি ইউরোপের বহু স্থান, কানাডা ও আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়াছি; কিন্তু ভারতে যে নিবিড় ভক্তির উচ্ছ্বাস ও জ্বলন্ত ধর্মভাব আমি বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তদের মধ্যে দেখিয়াছি, তাহা এ সব স্থানে দেখি নাই। তাহা ঈশ্বরকে প্রভুরূপে (শান্তভাবে) উপাসনাতেই সীমাবদ্ধ নয়; ঈশ্বরকে বন্ধু, স্বামী ও সন্তানরূপেও পূজা করা যায়। ইহাই বৈষ্ণব ভক্তদের অবলম্বিত সাধনপন্থার শিক্ষা। কান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ঈশ্বরকে ভক্তি ও পূজা করিতে পারিলে আমরা ক্রমেই তাঁহার আরও নিকটে—আরও অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হইতে পারি। বৈষ্ণবদের বিচিত্র সাধনায় পরিপূর্ণ রূপ বর্ণনা করিবার এখানে আমার সময় সঙ্কুলান হইয়া উঠিবে না। তথাপি বলিব যে, জগতের পরিত্রাণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের বহু সহস্র নারী আপনাদের পুত্ররূপে বাৎসল্য রসে উপাসনা করেন।

তাঁহারা নিজেদের 'ঈশ্বরের জননী' বলিয়া মনে করেন। সত্যই ইহা অতুলনীয়! 'ঈশ্বরের জননী' এই ভাবটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে অপরিমিত পবিত্রতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই পবিত্রভাবই এই সমস্ত পুণ্যচরিত্রা হিন্দু-সাধিকাদের জীবনাদর্শ। এ সম্বন্ধে আমি একটুও অত্যুক্তি করিতেছি না। ভারতবর্ষে এই প্রকার আশ্চর্য চরিত্রের বহু সাধিকা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কিন্তু (ভারতবর্ষ ব্যতীত) আর কোনও দেশে আমি তাহা দেখি নাই। এই সকল বৈষ্ণবভক্ত অথবা শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণকে সাতটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অদ্বৈত বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আচার্য ভগবান শঙ্করাচার্যের মতানুবর্তিগণ। দ্বিতীয়, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতালম্বী দাক্ষিণাত্যের রামানুজী শ্রীসম্প্রদায়-ভুক্ত বৈষ্ণবগণ। তৃতীয়, দ্বৈতবাদের প্রবর্তক মধ্বাচার্যের সম্প্রদায়। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সম্প্রদায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতানুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়, রামানন্দ-সম্প্রদায় ও নিম্বার্কাচার্য প্রবর্তিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদমতালম্বী সম্প্রদায়। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য, নিম্বার্কাচার্য মধ্বাচার্য ও রামানন্দ প্রভৃতি ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একজন দিব্যদ্রষ্টা, বিরাট ধর্মান্দোলনের স্রষ্টা এবং বেদান্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়গুলির অন্তর্ভুক্ত লক্ষ লক্ষ ভক্ত ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মসাধনা, মতবাদ, বিশ্বাস ও উপাসনার প্রণালীতে ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন রীতি থাকিলেও ইঁহাদের প্রত্যেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরাবতার, জগৎপাবন ও মানবের মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করেন।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ অথবা ভগবান বিষ্ণুর উপাসকগণ নিরামিষাশী। ইঁহারা মৎস্য, মাংসাদি আমিষখাদ্য স্পর্শও করেন না। অহিংসাই

তাঁহাদের আদর্শ। আহারের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে তাঁহারা হত্যা করেন না। পুরুষ বা নারী কোন বৈষ্ণবভক্তই সুরা অথবা অন্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করেন না। এই প্রকার ধর্মনীতি অন্যত্র পাওয়া কঠিন। অন্যায়ের প্রতিরোধ না করার নীতিই তাঁহারা পালন করেন। এই নীতি শুধু শ্রীকৃষ্ণই নহেন, তাঁহার পর বুদ্ধদেবও প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার বহু শতাব্দী পরে যীশুখৃষ্ট এই ভাব প্রচার করিয়াছিলেন। শুধু মানবেই নয় কিন্তু সর্বজীবে দয়ালু হইবার এবং চরিত্রের নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করিবার শিক্ষাই বৈষ্ণবেরা স্বীয় ধর্ম হইতে লাভ করেন। তাঁহারা সমগ্র মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমের ভাব সাধন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা দুষ্কৃতিহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কল্যাণব্রতে আপনাকে ও আপনার সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবগণও অপর সকলের হিতার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই। মধ্যে মধ্যে বহু মুসলমান ও পারসিক এই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট যেরূপ বিশ্বাসী ও অকপট খৃষ্টান ভক্তদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়াছেন, ঐকান্তিক ভক্তিমান ভগবৎপ্রাণ বৈষ্ণবদিগের প্রতিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করুণা, ক্ষমা ও প্রেমের অবদান তদনুরূপ। বিশ্বাসী ও যথার্থ ভক্তিমান খৃষ্টানদের সহিত একনিষ্ঠ বৈষ্ণব সাধকদের সাধনপ্রণালীর অনেকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবেরা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রকে আপনাদের আধ্যাত্মিক আদর্শজ্ঞানে ভক্তি করিয়া থাকেন সেরূপ অন্য হিন্দুগণ আবার ভগবানের অপর কোন মূর্তবিকাশকে নিজ ভাবানুযায়ী গ্রহণ করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভগবান শিবের উপাসক শৈবদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিব হিন্দুদের ত্রয়ীর তৃতীয় দেবতা। ইনি

সর্বত্যাগ ও সংসার বৈরাগ্যের জীবন্ত আদর্শ। যোগসাধনা ও সমাধিতে মগ্ন থাকিবার আদর্শরূপে ভগবান শিব হিন্দুদের দ্বারা সম্পূজিত হন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্ত সাধক ও ধ্যানশীল যোগীদের নিকট তিনি ধর্মসাধনার মহান্ আদর্শ। প্রেম ও ভক্তির অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া হিন্দুরা শিবনাম জপ করেন। পবিত্র শিবনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারা জগৎসংসার সবই ভুলিয়া যান। আধ্যাত্মিক স্বরূপতার দিক হইতে শিব ও বিষ্ণু এক ও অভিন্ন। শিব ও বিষ্ণু ইঁহারা উভয়ে বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের এক একটি রূপ মাত্র। সেইজন্যই বৈষ্ণবগণ যেভাবে স্বীয় ইষ্টদেবতা বিষ্ণুর উপাসনা করেন, সেই একই ভক্তির ভাবে তাঁহারা শিবকেও পূজা করিতে পারেন। এইরূপে শৈবরাও আপনাদের উপাস্যদেবতা শিবের সহিত এক ও অভেদ জ্ঞানে ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, হরি (বিষ্ণু) ও হরের (শিব) স্বরূপতঃ কোনই ভেদ নাই। কারণ যিনিই হরি তিনিই হর।[৫]

পূর্বেই বলা হইয়াছে দেবাদিদেব মহাদেব ধ্যানতন্ময়তা, যোগ-সাধনা

৫। 'চিজ্জড়ানাং তু যো দ্রষ্টা সোঽচ্যুতো জ্ঞানবিগ্রহঃ।
স এব হি মহাদেবঃ স এব হি মহাহরিঃ॥
*   *   *   *
শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ॥
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি॥
যথাঽন্তরং ন ভেদাঃ স্যুঃ শিবকেশবয়োস্তথা।'

—স্কন্দোপনিষৎ ৪-১০

সর্বত্যাগ ও সংসার-বৈরাজ্ঞের জীবন্ত আদর্শস্বরূপ। বৈষ্ণবগণ ভগবান বিষ্ণুকে সর্ববিধ গুণ, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও নানা অলঙ্কারে ভূষিত বলিয়া বর্ণনা করেন। অপর পক্ষে যাহা কিছু ভীষণ ভয়ঙ্কর ও অসুন্দর সে সমস্তই শিবের অঙ্গভূষণ। সমস্ত অশুভ ও অকল্যাণ রূপ বিষাক্ত সর্প-সমূহ ভগবান শিবের রজতগিরিসন্নিভ শুভ্র জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তিতে বিচিত্র অলঙ্কারের ন্যায় সুসজ্জিত। মৃত্যুর বিভীষিকা ও ধ্বংসের প্রচণ্ডতাসমাচ্ছন্ন শ্মশানের পরিবেশের মধ্যে শিব অবস্থান করিলেও ঐ সব বিকট বীভৎস দৃশ্য তাঁহার যোগসমাধির তন্ময়তা ও আনন্দকে নাশ করিতে পারে না। তিনি শাশ্বত ও অবিনাশী, সমস্ত অশুভ, অকল্যাণ, ভয়, বিপদ ও মৃত্যুজয়ী। ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গী এবং তাহারা কখনও তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না। নিখিল মানবজাতির দুঃখ, দুর্গতি, অশান্তি যন্ত্রণার সুবিপুল ভার মহাদেব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। সহর্ষে তিনি সর্বজীবনাশক ভীষণ কালকূট পান করিয়া নীলকণ্ঠ রূপে পরিচিত। তিনি আপনার একনিষ্ঠ ও অনুরক্ত সেবক এবং ভক্তগণকে সর্ববিধ দুঃখ, অশান্তি ও মোহবন্ধন হইতে ত্রাণ করেন। জগজ্জননী শ্রীদুর্গাই আবার অভিন্না লীলাসঙ্গিনীরূপে শিবের তপস্যা ও সাধনায় সর্বসময়ে সহায়িকা ও সহচরী। সকলের অবাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত স্থান শ্মশানই শিবের বাসভূমি। শ্মশানের চিতাভস্ম তাঁহার অঙ্গশোভা, ব্যাঘ্রচর্মই তাঁহার পরিচ্ছদ। সকল যোগীরই তিনি আদর্শ। যোগসাধনায় ও ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে হইলে মানুষ-মাত্রেরই ভারতবর্ষে ভগবান শিবের উপাসক শৈব সাধকের ধ্যাননিষ্ঠ তপশ্চর্যার জীবন পর্যবেক্ষণ করা উচিত। দেবাদিদেব মহাদেবের বহু মূর্তি আছে, অবতাররূপে তাঁহার অনেক আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহার দিব্যলীলার বহুবিধ আধ্যাত্মিক প্রতীক আছে। পবিত্রতা ও

মুক্তির ভাব প্রকাশক তুষারশুভ্র নিরঞ্জন দিব্য জ্যোতির্ময় প্রশান্ত মূর্তিতেই বিশ্বেশ্বর তাঁহার ভক্তগণের উপাস্য। যদি কোন শিব-উপাসক আপনার উপাস্য দেবতার কোনও পূজামন্দির না পান, তাহা হইলে তিনি কোন বৃক্ষতলে বসিয়াই তাঁহার আরাধনা করেন। এজন্য সাধক কোন প্রতিমূর্তি, বিগ্রহ বা প্রতীকের প্রয়োজন বোধ করেন না; সেই বৃক্ষতলে বসিয়া তিনি স্তিমিতনেত্রে শুভাশুভ ও সর্বদ্বন্দ্বের অতীত অসীম পরব্রহ্মের ভাবপ্রকাশক বিশ্বচরাচরের অধীশ্বররূপী শিবের ধ্যানে মগ্ন হন।

এপর্যন্ত আমরা দেখিলাম বৈষ্ণব বা শৈব ইহারা ঈশ্বরকে পুরুষভাবেই উপাসনা করেন। কিন্তু তাহা ছাড়াও এমন অনেক হিন্দু আছেন যাঁহারা মাতৃভাবে ও জগজ্জননীরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই ঈশ্বর জগজ্জননীরূপে পূজিত হন। ভারতে প্রত্যেক নারীকে জগজ্জননীর অংশজ্ঞানে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা হয়। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করেন হিন্দুরা নারীদের আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ স্বীকার করেন না। কিন্তু এই প্রকার ভাব কোন হিন্দুই আপনার মনে স্থান দেন না; পরন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে নারীরূপিণী বলিয়াও তাঁহারা বিশ্বাস করেন। হিন্দুরা জানেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই নয়, এই ভাব হইতে আত্মা সম্পূর্ণ অতীত ও মুক্ত। শুধু বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবাত্মা পুরুষ বা নারী দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন।[৬]

ভগবদ্গীতাতেও উক্ত হইয়াছেঃ "পুরুষ অথবা নারী যে কেহই

৬। 'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে॥'—শ্বেতাশ্বতর উ ৫।১০

ঈশ্বরবিশ্বাসী হউক অথবা না হউক, কোন না কোন সময়ে তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিবে।"[৭]

যাঁহারা এইরূপে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা 'শাক্ত' নামে অভিহিত। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী সনাতনী ব্রহ্মশক্তির উপাসকগণই শাক্ত। শাক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, জগজ্জননী নারীদেহে যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির লীলা দেখান।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব যেমন হিন্দুদের মতে ঈশ্বরের পুরুষ-ভাবের অবতার সেইরূপ ঈশ্বরের স্ত্রীভাবের অবতারও হিন্দুধর্মে অনেকেই আছেন। ঐশ্বরিক দিব্যশক্তির এই সমস্ত স্ত্রীরূপিণী অবতারগণ কালী, তারা, দুর্গা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ও মূর্তিতে পরিচিত। বিদেশীয় অন্যধর্মীরা হিন্দুদের এই রূপক মূর্তিসমূহের আভ্যন্তরিক অর্থ বুঝিতে পারেন না। ধ্যান ও ধারণা অভ্যাসের পক্ষে এই সকল মূর্তি বিশেষভাবে সহায়ক। কিন্তু বিদেশী ও অন্যধর্মীরা এই সকল দেবমূর্তির রূপক ও আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিতে না পারিয়া শুধু ইহাদের বহিঃপ্রকাশ মাত্রই দেখিয়া মন্তব্য করেন যে, হিন্দুদের দেব দেবী মূর্তি-গুলির আকার বীভৎস! অবশ্য পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের চক্ষে তাহাদের কোন কোনটি বীভৎস প্রতীয়মান হইতে পারে সত্য, কিন্তু হিন্দুদের দৃষ্টিতে এগুলির প্রত্যেকটিই ঐশ্বরিক ভাবের প্রতীক। হিন্দুরা শুধু জীবনে সুখবাদীই নহেন, তাঁহারা সুখবাদ ও দুঃখবাদ উভয় দিককেই স্বীকার করেন। এ বিষয়ে তাঁহারা নির্ভীক। বিশ্বসংসারের অশুভ

৭। 'মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ!
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥'
—ভগবদ্‌গীতা ৯।৩২

অশান্তিময় দিকটাও তাঁহারা অস্বীকার করেন না। মঙ্গলের ন্যায় অমঙ্গলকেও তাঁহারা বরণ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তাঁহাদের আরাধ্যা দেবী জগজ্জননী কালীর মূর্তিতে ভয়ঙ্করী ও ক্ষেমঙ্করী উভয় ভাবই বিদ্যমান। জগজ্জননী কালীর মূর্তিতে এক দিকে যেমন রোগ, শোক, দুঃখ ও মৃত্যু এই করাল ভাব এবং অপর দিকে তেমনি শান্তি, করুণা, আনন্দ ও সৌন্দর্য প্রভৃতি কল্যাণ ভাবের সমাবেশ। যাঁহারা শুধু সুখবাদী, জগতের যাবতীয় অশুভ অকল্যাণের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি অন্ধ। আর সেইজন্য কোন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলেই তাঁহারা স্বকল্পিত ঈশ্বর অথবা শয়তানকে গালাগালি করেন। কিন্তু জগজ্জননী কালীর উপাসকগণ তাঁহার দিব্যশক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে সর্বদা নিঃসন্দেহ বলিয়া সহাস্যমুখে ও নির্ভীক চিত্তে সকল দুঃখ ও বিপদকে বরণ করেন এবং এতেও জগন্মাতার দিব্য শক্তি খেলিতেছে জানিয়া তাঁহারা ঐকান্তিক ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত দেবীর নিকট প্রার্থনা করেন।

শক্তিপূজা বা আদ্যাশক্তির উপাসনার মূল বস্তুর সহিত সাংখ্যীয় ভাবের ঐক্য অনেক পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে। কেননা আপনাদের স্মরণ আছে যে, সাংখ্যদর্শনের মতে এক মূলা প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবাত্মা সাংখ্যের মতে পুরুষ-স্বরূপ। সুতরাং তন্ত্র বা শক্তি উপাসনায় শিব ও তাঁহার লীলাসঙ্গিনী আদ্যাশক্তি যেন সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতিরই অনুরূপ।[৮] আর ইহাও

৮। এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, তন্ত্রের শিব ও শক্তির ধারণা সাংখ্যীয় পুরুষ ও প্রকৃতির সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় দার্শনিক দৃষ্টির মধ্যে আসল প্রভেদই হইতেছে—শক্তির উপাসকেরা আদ্যাশক্তিকে যেখানে চিন্ময়ী এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিরূপিণী বলিয়া দর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্যবাদীদের প্রকৃতি সেখানে জড়া এবং নিষ্ক্রিয়া;

সত্য যে, ঈশ্বরের পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই ভাবের একত্র মিলন (মিথুনীকৃত) হইতে বিশ্বসৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহাও লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলিকেও হিন্দুরা কিরূপে রূপায়িত করিয়া নিজেদের শ্রদ্ধা ও উপাস্যের বস্তুরূপে পরিণত করিয়াছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি কি ভাবে হইয়াছে এই প্রশ্ন হিন্দুদের নিকট করিলে তাঁহারা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীক শিব ও শক্তিকে দেখাইয়া দিবেন। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের ধর্মমত যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুগামী। তাঁহারা মনে করেন যাহা কিছু যুক্তি, বিজ্ঞান ও দার্শনিক বিচারের বিরোধী তাহা কোনমতেই ধর্মমত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সেইজন্য তাঁহারা বিজ্ঞান প্রতিপাদিত সর্বোচ্চ সত্যগুলিকে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে আবার ঐশ্বরিক ভাবযুক্ত প্রতীকের আকারে ভক্তি ও আরাধনার শ্রেষ্ঠ সহায়করূপে ব্যবহার করেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হিন্দুদের মন অত্যন্ত উদ্ভাবনশীল। ধর্মসাধনায় সেইজন্য হিন্দুদের অনুভূতিশীল মন সর্বদা সক্রিয়। হিন্দুজাতির সনাতন ধর্মের ন্যায় জগতে আর কোন ধর্ম নাই যাহার মধ্যে এত প্রকার প্রতীক, প্রতিমা, পূজা-পার্বণ, ও বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির, আধ্যাত্মিক আদর্শের ও ঐশ্বরিক ভাবের বিপুল বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাস, সংস্কার ও সাধনাদর্শ অনুযায়ী আপন আপন ইষ্ট-নির্বাচনের স্বাধীনতা

পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিলে তবে তিনি চৈতন্যের অধিকারিণী হন। আর শক্তিবাদিদের শিবও যেখানে শবস্বরূপ নিষ্ক্রিয় এবং এক, সাংখ্য-মতাবলম্বীদের পুরুষ সেখানে নিষ্ক্রিয় হইলেও বহু, এক নয়। তবে অনেকের অভিমত যে, সাংখ্যীয় মূল ধারণাকে তন্ত্র পরবর্তী কালে নিজের মত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু ইহাও কতটুকু সত্য তাহা সূক্ষ্ম আলোচনার বিষয়।—সঃ

প্রত্যেক হিন্দুরই আছে। হিন্দুরা জানেন শুধু একটিমাত্র বাঁধাধরা গতানুগতিক মতবাদ বা সাধন-পথেই সকল প্রকার মানব-মনের আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। যেমন একটি জামা সকল লোকেরই শরীরে সমানভাবে কিছুতেই মানায় না, তেমনি একটিমাত্র কোন নির্দিষ্ট সাধনপদ্ধতি সকল দেশের সকল লোকেরই আধ্যাত্মিক সাধনার উপযোগী হওয়া অসম্ভব। সকল লোককে একই পদ্ধতিতে সাধন করাইবার প্রচেষ্টা করিতে গিয়া খৃষ্টানধর্ম কিভাবে অকৃতকার্য হইয়াছে, ইহা কি আমরা দেখিতেছি না? তাহাদের ধর্মের আদর্শ পরিপূর্ণ ভাবে বুঝিবার শক্তির অভাবে বিভিন্ন দলের খৃষ্টানদের মধ্যে বর্তমানে কী প্রকার সংঘর্ষ ও সংগ্রাম চলিতেছে, ইহা কি আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি না? মানব-মন বৈচিত্র্যশীল। আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিপূর্ণতালাভের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রুচি, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ধর্ম সাধকদের সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই উচিত। সেইজন্য হিন্দুধর্ম সকল শ্রেণীর ধর্মসাধককে একটি মাত্র বাঁধাধরা পথে চলিবার পরিবর্তে নিত্যানিত্যবস্তুর বিচার, স্বরূপের চিন্তন, আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধিরূপ জ্ঞান-যোগ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গরূপ রাজযোগ সাধনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা ও নিরোধ করিয়া স্বস্বরূপে অবস্থিতি, সর্বতোভাবে নিঃস্বার্থ হইয়া ঈশ্বরের উপাসনাবোধে সকল কর্মের সম্পাদন ও সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণরূপ কর্মযোগ, এবং ঈশ্বরকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি ভাবে ঐকান্তিক ও অবিশ্রান্ত প্রেমের দ্বারা উপাসনারূপ ভক্তিযোগ প্রভৃতি পথ সাধকদের বিভিন্ন রুচি, সংস্কার ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিধান করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার বহু শাখায় বিভক্ত। সুতরাং হিন্দুধর্মই একমাত্র বিভিন্ন প্রকৃতির ও

স্তরের সাধকদের ভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী নানাপ্রকার সাধনপথ সমগ্র মানবজগৎকে প্রদান করিয়াছে। এই ধর্মের সাধকগণ একই ঈশ্বরকে বিভিন্ন নাম ও বিচিত্রভাবে উপাসনা করে। সত্য স্বরূপতঃ এক, কিন্তু ইহার প্রকাশ বহুমুখী। এই উদার আধ্যাত্মিক ধারণার ফলেই হিন্দুরা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের বাহিরে অন্য সকল ধর্মের সাধনপদ্ধতির উপর সহিষ্ণু হইতে শিক্ষা করিয়াছে। কারণ তাঁহারা মনে করেন আপাতবিরোধী হইলেও জগতের সকল ধর্মসম্প্রদায়, মতবাদ ও সাধনপদ্ধতির চরম গন্তব্য একই।

হিন্দুদের চিন্তাধারার সহিত যাহারা অপরিচিত তাহারা ইহাকে 'সর্বেশ্বরবাদ' বা জগতের যাহা কিছু সমস্তই ঈশ্বর (Pantheism) বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিন্দুদের বিভিন্ন সাধনপন্থাসংবলিত ধর্মের উপাস্য দেবতা এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তিনি দয়াময়, নির্গুণ আবার সগুণও। তিনি অনাদি, অনন্ত ও সর্বব্যাপী পরমাত্মা। ইহাকে ইংরাজীতে 'প্যান্‌থিইজিম্‌' বা 'সর্বেশ্বরবাদ' বলিলে ভুল বলা হইবে। ইহার অর্থ ঠিক এরূপ নয়। যখন আমি চিন্তা করি যে, টেবিলটাই ঈশ্বর বা ঈশ্বরই এই চেয়ার ও টেবিল হইয়াছেন, এইরূপ চিন্তাধারার নাম হইল 'প্যান্‌থিইজম্‌' বা সর্বেশ্বরবাদ। কিন্তু আমি যদি এক ঈশ্বর বা পরমাত্মায় বিশ্বাসী হইয়া মনে করি তিনি টেবিল ও চেয়ারের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীব ও জড় সকলের ভিতরই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তাহা হইলে এই চিন্তা ও বিশ্বাস হইল আমার ঈশ্বরেরই উপাসনাস্বরূপ। সেই ঈশ্বর অনন্ত ও সর্বব্যাপী।

প্রকৃত ধর্ম কোন একদেশদর্শী ও অনুদার (সঙ্কীর্ণ) মতবাদ, অন্ধ-বিশ্বাস বা কেবলমাত্র বিধিনিষেধ লইয়াই গঠিত নয়, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক ভাবধারার ক্রমিক অভিব্যক্তির চরম ফলরূপ

দিব্যজ্ঞান বা ঈশ্বরানুভূতি। ইহাই হিন্দুদের ধারণা। ঈশ্বরের সহিত নিজের একাত্মতা উপলব্ধিই প্রকৃত ধর্ম। আত্মপ্রতিষ্ঠার লালসা ও স্বার্থপরতাকে দমন করিয়া সত্যনিষ্ঠা, সর্ব মানবে প্রেম, জীবে দয়া ও শুদ্ধাভক্তির পরাকাষ্ঠাতেই প্রকৃত ধর্মরহস্য নিহিত। সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই এই প্রকার ধর্মের লক্ষ্য। হিন্দুরা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি বা বিশ্বাস প্রভৃতিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহেন না। আপন আপন ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা অনুযায়ী নিজ ইষ্টদেবতা নির্বাচন দ্বারা ধর্ম সাধনা করিবার অধিকার হিন্দুমাত্রেরই আছে। যে পর্যন্ত কোন হিন্দু একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী থাকিবেন, সে পর্যন্ত তাঁহার কোনও ভয় নাই। মুক্তিলাভ তাঁহার সুনিশ্চিত এবং এই জন্মেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ব্যতীত এমন আরও অনেক হিন্দু আছেন যাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায় নির্দিষ্ট সাধনপথের অনুগামী। এই প্রকার হিন্দুদের মধ্যে পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী শিখ-সম্প্রদায়ও আছেন। 'শিখ' শব্দটির অর্থ শিষ্য এবং ইহা সংস্কৃত 'শিষ্য' শব্দ হইতে গৃহীত। ইহারা সকলে গুরু নানকের শিষ্য। শিখধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের অবস্থিতি কাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী। তিনি ইউরোপের প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মান্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা মার্টিন লুথারের সমসাময়িক।[৮] গুরু নানক একজন প্রকৃত মহাপুরুষ। তাঁহার ভক্তসম্প্রদায় ও মতাবলম্বী শিখগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া

৮। মার্টিন লুথার ১৪৮৩ ১০ই নভেম্বর Eiselben (এসেলবেন) নামে জার্মাণীর অন্তর্গত স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীসঙ্ঘের সর্বাধ্যক্ষ (পোপের) ও তাঁহার অনুচরগণের অনাচারের জন্য তিনি তাহাদের বিরোধী হন।

বিশ্বাস করেন। গুরু নানকের উপদেশবাণী ও শিক্ষাবলী পুস্তকাকারে রক্ষিত আছে। যে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে খৃষ্টানেরা বাইবেলকে, মুসলমানেরা কোরাণকে এবং হিন্দুরা বেদকে দেখিয়া থাকেন, শিখেরাও সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির দৃষ্টিতে গুরু নানকের উপদেশবাণীকে দেখিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের নিকট ঐশ্বরিক বাণীর অভিব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত। শিখেরা কোন দেবমূর্তি, শিলাবিগ্রহ, প্রতীক প্রভৃতি অথবা অন্য কোন অবতারকে মানেন না। দেবমূর্তি বা প্রতিমা প্রভৃতির প্রতি তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের মতন অন্ধ বিদ্বেষী। জাতিভেদের কুসংস্কার শিখদের মধ্যে প্রচলিত নাই। ধর্মবিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত উদার এবং অন্যধর্মাবলম্বীকে আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইতে

লুথারের নেতৃত্বে খৃষ্টধর্মের বহু উন্নতি ও সংস্কার হইয়াছে। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী মাসে লুথারের মৃত্যু হয়।

ইউরোপে মধ্যযুগে রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের জনসাধারণের উপর ধর্মব্যাপারে নানাপ্রকার অত্যাচার ও মানবের জ্ঞানোন্নতির পরিপন্থী নানা প্রকার অসঙ্গত নির্যাতনের ফলে সেখানে স্বাধীন চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজের অনেকেই খৃষ্টীয়ান চার্চের বিরোধী হইয়া উঠেন। তাহারই ফলে ইউরোপে বহু বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা রোম্যান ক্যাথলিকদের প্রভাবকে উচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট হন। মার্টিন লুথারই সর্বপ্রথম রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের অনাচার ও নৈতিক অধঃ-পতনের বিরুদ্ধে আপনার অগ্নিময়ী বাণী প্রচার করিয়া জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাহারই ফলে সন্ন্যাসবাদবিরোধী খৃষ্টানদের প্রোটেষ্টাণ্ট আন্দোলনের সূত্রপাত। এই আন্দোলনের ফলে ইউরোপে রোম্যান ক্যাথলিকদের যাবতীয় অন্যায় অধিকার উচ্ছেদ হইয়া যায় এবং তখন হইতে ইউরোপের জাতীয় জীবনের সকল দিকে পরিবর্তন ও সংস্কার হইতে আরম্ভ হয়।

সক্ষম। শিখদিগের দশম গুরু মহাত্মা গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে মোগল সম্রাট ঔরংজীবের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু মুসলমানকে দীক্ষা দিয়া শিখ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল।[৯] শিখদের ধর্মপুস্তকের নাম 'গ্রন্থসাহেব'। ইহা উচ্চশ্রেণীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও আদর্শে পূর্ণ। বেদের সহিত গ্রন্থসাহেবের শিক্ষায় সামঞ্জস্য আছে। শিখেরা এক অদ্বিতীয় নিরাকার মহান পরমেশ্বরে (অলখ নিরঞ্জনে) বিশ্বাসী। মুসলমানেরা যেমন বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের উপাস্য দেবতা 'আল্লা'-র কোনও মূর্তি বা রূপ নাই, ঈশ্বর সম্বন্ধে শিখেদেরও ঠিক ঐ প্রকার বিশ্বাস। সম্ভবতঃ মুসলমান ধর্ম-বিস্তারের প্রভাবের ফলেই শিখ ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে ভারতে যে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে শিখগণ সেই সকল নূতন ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্যতম।

শিখগণ প্রথমে শান্তস্বভাব নিরীহ ও ধর্মের সাধকসম্প্রদায় মাত্র ছিলেন। মোগল সম্রাটদের অত্যাচারের ফলে আত্মরক্ষার জন্য ইঁহারা ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যুদ্ধবিদ্যা ও সংগঠন শক্তি শিক্ষা করেন। গুরু রামদাস তাঁহার নেতৃত্বে শিখদিগকে যুদ্ধবিদ্যায় প্রবৃত্ত, উৎসাহিত ও শিক্ষিত করিয়া তোলেন। ইঁহাদের দুইজন গুরু অর্জুন ও তেগবাহাদুর মোগল সম্রাটদের দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হন। তেগবাহাদুর

৯। শিখদের ধর্মনায়কগণ সংখ্যায় দশ এবং তাঁহাদের উপাধি 'গুরু।' এই শিখগুরুগণের পারম্পারিক নাম যথাক্রমে: গুরুনানক (নভেম্বর ১৪৬৯—১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ), গুরু অঙ্গদ (১৫০৪—১৫৫৩), গুরু অমরদাস (১৪৭৯—১৫১৪), গুরু রামদাস (১৫৩৪—১৫৮১), গুরু অর্জুনদেব (১৫৬৩—মে ১৬০৬), গুরু হরগোবিন্দ (জুন ১৫৯৫—মার্চ ১৬৪৫), গুরু হররায় (১৬৩০—১৬৬১), গুরু হরকিষণ (১৬৫৬—১৬৬৫), গুরু তেগবাহাদুর (১৬২১—১৬৭৫) এবং গুরু গোবিন্দ (১৬৬৬—১৭০৮)।

মোগল সম্রাট ঔরংজীবের দ্বারা নিহত হইলে তাঁহার পুত্র গুরুগোবিন্দ শিখদের গুরু হন। ইনিই শিখদের সর্বশেষ গুরু। শক্তিশালী গুরু গোবিন্দসিংহের নেতৃত্বে শিখেরা এক পরাক্রান্ত যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হইয়া উঠেন। পরে পাঞ্জাবে শিখেরা এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় স্থান অধিকার করেন। মধ্যযুগে মোগল রাজত্বকালে শিখধর্ম ছাড়া আরও কয়েকটি ধর্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে দাদূ, কবীর, রবিদাস প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মাগণ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে বহু লক্ষ ভক্ত আজ পর্যন্ত বর্তমান।

গোঁড়া (নৈষ্ঠিক আচারসম্পন্ন) হিন্দুরা ছাড়া বৌদ্ধ ও জৈনদের সম্প্রদায়ও আছে। জৈনদের নিজস্ব ধর্মশাস্ত্র আছে এবং তাঁহাদের ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মগুরুগণ 'তীর্থঙ্কর' নামে অভিহিত। পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, মহাবীরনাথ বর্ধমান (ইঁহার নাম হইতেই বাঙলাদেশের বর্ধমান জেলার নামোৎপত্তি হইয়াছে), এবং আরও কয়েকজন (সর্বশুদ্ধ চব্বিশজন) তীর্থঙ্কর বা সিদ্ধ মহাত্মা জৈনদের ধর্মগুরু। ইঁহারা প্রত্যেকেই চিরস্মরণীয় মহান্ ধর্মগুরু। ইঁহাদের উপদেশ ও সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মানুষ যাবতীয় অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়া মুক্তিলাভ করে। জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিকাল প্রায় একই সময়ে হইয়াছিল। ভগবান বুদ্ধদেব ৫৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সুমহান আদর্শ এশিয়া মহাদেশের অন্তর্গত বহু দেশ ও জাতিকে অভিনব সভ্যতা দান করিয়াছে। চীন ও জাপানে যে ধর্ম সগৌরবে বিদ্যমান, যাহা দ্বারা জাপান আজ একটি মহাজাতিতে পরিণত এবং যাহা তিব্বত, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা এবং এশিয়া মহাদেশের আরও অনেক রাজ্যে বহুল বিস্তৃত—সেই মহান ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধ। কিন্তু গোঁড়া

হিন্দুদের নিকট জৈনরা 'অজ্ঞেয়বাদী' ও বৌদ্ধরা 'নিরীশ্বরবাদী' বলিয়া পরিগণিত। কারণ জৈনরা আত্মা অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথাই বলেন না। বৌদ্ধরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। মানবাত্মার অবিনাশী সত্তাও তাঁহারা অস্বীকার করেন এবং বেদকে তাহারা অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এই সব কারণে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকার করা সত্ত্বেও গোঁড়া হিন্দুরা বৌদ্ধদিগকে 'নাস্তিক' দলের পর্যায়ভুক্ত করেন। হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য ঈশ্বরাবতার-গণের সমান জ্ঞানে ভক্তি করেন এবং মনে করেন মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমকল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইহা ছাড়াও উদারনৈতিক অন্যান্য হিন্দুগণ আছেন। ইহারা 'ব্রাহ্ম' এবং 'আর্যসমাজী' নামে পরিচিত।[১০] খৃষ্টানদের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্ম ও আর্যসমাজীদের তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মগণ এবং আর্যসমাজীরা উভয়েই কোন প্রকার প্রতীক, ও দেব-মূর্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। উপনিষদে বর্ণিত নিরাকার এক অদ্বিতীয় সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ইহারা বিশ্বাসী।

১০। ব্রাহ্মদিগের ধমসম্প্রদায়ের নাম 'ব্রাহ্মসমাজ'। ইংরাজ শাসনের ভিত্তি এদেশে যখন সুদৃঢ় হইতেছিল সেই সময়ে মহামনীষী রাজা রামমোহন রায় উপনিষদ ও বেদান্তের সারাংশ অবলম্বনে 'ব্রাহ্মধর্ম' প্রবর্তন করেন। বাঙলাদেশ বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীই ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রধান স্থান। পরে ইহা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও প্রচারিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইলেও কালক্রমে আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। প্রথম সমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয়

এইরূপে আমি বর্তমান ভারতে প্রচলিত সনাতন ধর্মের অন্তর্গত দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের একটা মোটামুটি আভাস দিলাম। কিন্তু এই সকল ছাড়া অদ্বৈত মতের প্রতিপাদক হিন্দুধর্মের আর একটি দিকের কথাও বলিবার আবশ্যকতা মনে করি।

নাম ও রূপ সমন্বিত জীব ও জড়ের বৈচিত্র্যের মধ্যে অখণ্ড অক্ষয় এক ও অদ্বৈত তত্ত্ব উপলব্ধির উপরই এ ধর্মের মূলনীতির ভিত্তি স্থাপিত। এই ধর্মমতানুসারে যাহা নিত্য সত্তা তাহা এক ও অদ্বিতীয়—সেই এক অবিকারী অবিনাশী অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় সত্তা নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তু দেখিতে পাই, যে সকল বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলি নাম ও রূপের ভেদ মাত্র। তাহাদের উৎপত্তি আছে বলিয়া তাহারা ধ্বংসশীল, ক্ষণস্থায়ী ও অসৎ (চিরন্তন নয়)। একমাত্র এই নিত্য শাশ্বত অদ্বৈত বস্তুই সৎ (চিরন্তন)। এক অনাদি অনন্ত অবিভাজ্য শাশ্বত অব্যয়

সমাজের নেতা কেশবচন্দ্র সেন এবং তৃতীয় সমাজের নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী। ইনি গুজরাটের অন্তর্গত মর্ভিনগরে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার ধর্মান্দোলনের প্রধান স্থান ছিল প্রথমে বোম্বাই পরে পাঞ্জাব। পাঞ্জাব প্রদেশেই আর্যসমাজের বিশেষ প্রাধান্য। দয়ানন্দ সরস্বতী মূর্তিপূজা, অবতারবাদ, অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি পুরাণ ও তন্ত্রকে ধর্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। একমাত্র বেদ ভিন্ন অন্য কোন ধর্মশাস্ত্র তাঁহার নিকট প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত না। 'সত্যার্থপ্রকাশ' নামে এক বিরাট গ্রন্থে তিনি অপর ধর্মমতকে খণ্ডন করিয়া নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

সত্তাই মায়ার দ্বারা দেশ, কাল ও নিমিত্তের মধ্য দিয়া নানাপ্রকার নাম ও রূপের আবরণে বিভিন্ন সত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। একমাত্র বেদেই আমরা বহুত্বের মধ্যে একত্বরূপ অদ্বৈত তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার সার্বভৌমিক সনাতন ভাবের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছেঃ "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি",—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা স্বরূপসত্তা তাহা এক, কিন্তু লোকে সেই এক অদ্বিতীয় সত্তাকে বহু নামে অভিহিত করে। সেই একই চরমতত্ত্বকে বিভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে উপাসনা করিয়া থাকে। মূলতঃ এক হইলেও ইহার প্রকাশ ও লীলা বিভিন্ন প্রকার। সৃষ্টিকার্যব্যাপারে তিনি ব্রহ্মা, বিশ্বপালনকার্যে তিনি বিষ্ণু এবং সংহারকর্তারূপে মহারুদ্র ও জগৎ-প্রসবিনী আদ্যাশক্তি বিশ্বমাতা রূপে তাঁহার বিচিত্র প্রকাশ। সর্ববিধ নাম ও রূপের অতীত সেই এক নিত্য সত্য পরমসত্ত্বাকে মুসলমানেরা আল্লা, খৃষ্টানরা স্বর্গস্থ পিতা (Father in Heaven) ও যীশুখৃষ্ট, বৌদ্ধগণ বুদ্ধ, জৈনগণ জিন, জরথুষ্ট্রীয় বা পারশীগণ অহুরা-মাজ্‌দা, চীনদেশবাসীরা তি-তিয়েন (Ti-Tien) এবং হিন্দুগণ শিব, আদ্যাশক্তি জগন্মাতা, বিষ্ণু, ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে উপাসনা করেন।[১১] নামের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রত্যেকের উপাস্য দেবতা প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন। যেমন 'জল' নামক পদার্থটি বিভিন্ন ভাষায় পানি, বারি, জলম্‌, water, wasser, aqua, eau ইত্যাদি বহু নামে পরিচিত, সেইরূপ

১১। 'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্‌।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥'
—ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬

'ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা
শতক্রতো বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে*॥'—ঋগ্বেদ ৮।৯৮।১১

একই আত্মা বা ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাধকগণ বিভিন্ন নামে আরাধনা করিয়া থাকেন।

ধর্মের এই প্রকার উদার সার্বজনীন ভাবই নানা সম্প্রদায় ও ধর্মমতকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং প্রত্যেক ধর্ম-বিশ্বাসকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া এমন এক সার্বভৌমিক আদর্শকে তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলে যে, তাহাতে সকল ধর্মশাস্ত্রের সারতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই বিশ্বজনীন ধর্ম ইহাই শিক্ষা দেয় যে, জীবাত্মা (মানব) কাহারও কোনও প্রকার পাপ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। শয়তানকর্তৃক প্রলুব্ধ কোনও মানব কৃত পাপের ফলকে সৃষ্টির আদি হইতে অন্তকাল পর্যন্ত ভোগ করিতেও সে বাধ্য নয়। দেশ, জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানবকেই এই ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, মানব অমৃতের সন্তান—অমৃতের অধিকারী। জীবাত্মা স্বরূপতঃ জন্ম ও মৃত্যুহীন—অনন্তকাল ধরিয়া সে অমর থাকিবে। আত্মা যদি শাশ্বত ও অবিনাশী না হইতেন তাহা হইলে কোন শক্তিমান পুরুষের সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে অমর করিতে পারে। প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই অনন্ত শক্তির বীজ ও আত্মবিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত আছে। শূন্য, অসৎ বা অনস্তিত্ব হইতে সৎস্বরূপ আত্মার উৎপত্তি হয় নাই। কোনও সৃষ্টিকর্তা আত্মাকে কখনও সৃষ্টি করেন নাই। আত্মা নিত্য, অনাদি, অবিকারী, জন্মহীন ও অনন্ত।[১২] শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না—আত্মা অক্ষয় অবিনাশী।

ইহাই সনাতন আর্যধর্মের শিক্ষা ও উপদেশ। পিতামাতার পাপ-কার্যের ফলভোগ আমাদিগকে করিতেই হইবে এমন অসহায় জীবরূপে

১২। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।'
—গীতা ২।২০

আমরা আসি নাই। আমাদের বর্তমান অবস্থা পূর্বজন্মকৃত কর্মরাশির ফলস্বরূপ। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন বা পরজন্মের অভিব্যক্তি এই জন্মের কৃত কর্ম-সকলের ফল দ্বারাই নির্ধারিত হইবে।[১৩] পিতামাতা সন্তানের আত্মাকে কখনও সৃষ্টি করিতে পারেন না। পিতামাতা জীবাত্মাগণের এই স্থূল ভৌতিক জগতে অভিব্যক্ত হইবার পথ মাত্র। ইহাই পুনর্জন্মবাদ—জীবাত্মা বা সূক্ষ্ম প্রাণ স্বীয় প্রবৃত্তি, সংস্কার ও বাসনা অনুযায়ী শরীর ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে পুনরায় অভিব্যক্ত হয়। এই প্রবৃত্তি, সংস্কার ও বাসনাই তাহার জন্ম ও ভবিষ্যৎ জীবনের নিয়ামক। হিন্দুগণ এই কর্মফলের মতবাদে বিশ্বাসী। ঈশ্বর কাহাকেও সুখ অথবা কাহাকেও দুঃখ ভোগ করাইবার জন্য সৃষ্টি করেন একথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। পাপের শাস্তি অথবা পুণ্যের পুরস্কার জীবের কৃতকর্মেরই প্রতিক্রিয়া বা তাহার ফলমাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ইহজন্মে ও পরজন্মে কৃতকর্মের ফলের জন্য সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।[১৪]

এই সার্বজনীন ধর্মকে 'আত্মবিজ্ঞান' (science of soul) বলা যাইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান কোন প্রকার যুক্তিহীন মতবাদ বা বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া কেবলমাত্র ব্যক্তি বা পুস্তক বিশেষকেই প্রামাণ্য স্বীকার করে না, পরন্তু প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্যক্ পরীক্ষা অবধারণ ও বিশ্লেষণ (observation, experiment and analysis) দ্বারা জগতের সকল ঘটনাপারম্পর্য ও কার্যের গুণ, কর্ম, স্বভাব ও

১৩। এই সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত *Reincarnation, Doctrine of Karma* প্রভৃতি পুস্তক এবং তাঁহার *Pre-existence and Immortality* প্রভৃতি বক্তৃতায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

১৪। 'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥'—গীতা ৫।১৫

তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদও সেরূপ কোন প্রকার যুক্তিবিরোধী সাম্প্রদায়িক মতবাদ, বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তকে কেবলমাত্র না মানিয়া আপনার সুতীক্ষ্ণ যুক্তি ও বিশ্লেষণের সহায়েই মানবের দিব্যস্বরূপকে নির্ণয় ও উপলব্ধি করে। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া জীবাত্মা কিরূপে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্রমিক অভিব্যক্তির দ্বারা উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উত্থিত হয় এবং যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় দিব্যদ্রষ্টা মহামানবে পরিণত হয় সেই তত্ত্বই হিন্দুধর্মে ব্যাখ্যাত ও বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মতে জীবাত্মা আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্বারা উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া অবশেষে পরিপূর্ণতা লাভ করিবেই। প্রত্যেক জীবই অপূর্ণ বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও পরিশেষে পূর্ণত্ব বা ব্রহ্ম-স্বরূপতা লাভ সে করিবেই। এই সার্বভৌমিক ধর্মের মতে সকল মানবাত্মা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি সাধন স্তরগুলির এক একটিতে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হইয়া অবশেষে অদ্বৈত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার বা আত্মজ্ঞান লাভ করিবেই এবং ইহাতেই তাহারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইবে।[১৫] যতদিন সাধক তাহার আধ্যাত্মিক সাধনারূপ দ্বৈতবাদ বা একেশ্বরবাদের স্তরে অবস্থান করে, ততদিন সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কারী, পালক ও স্রষ্টারূপী এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। ততদিন সে মনে করে যে, ঈশ্বর এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে থাকিয়া (extracosmic) ইহারই নিয়ামকরূপে বিরাজিত এবং তিনি শূন্য হইতে (out of nothing) যাহা কিছু সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৫। আচার্য্য শঙ্করের স্তবে এই ভাবটি বেশ পরিস্ফুট। যথা,
'দাসস্তেঽহং দেহদৃষ্ট্যাঽস্মি শম্ভো, জাতস্তেঽংশো জীবদৃষ্ট্যা ত্রিদৃষ্টে।
সর্বস্যাঽত্মন্নাত্মদৃষ্ট্যা ত্বমেবত্যেবং মে ধীর্নিশ্চিতা সর্বশাস্ত্রৈঃ ॥'

তিনি বহু দূরে অবস্থান করেন, তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি অতিশয় মহান, অতি উচ্চে ও অতি দূরে অবস্থিত। তিনি সমস্ত জগৎ ও প্রাণীর একমাত্র প্রভু। জীব তাঁহার দাস মাত্র এবং ভৃত্যের ন্যায় ও সেবকের ন্যায় ঈশ্বরের পূজা করাই জীবের কর্তব্য। কিন্তু যখনই আমরা সাধনার এই দ্বৈত স্তরকে অতিক্রম করিয়া আরও উন্নত স্তরে আরোহণ করি, তখনই দূরত্বের আবরণ অপসারিত হইয়া আধ্যাত্মিক দিব্যদৃষ্টি আমাদের খুলিয়া যায় এবং তখনই বুঝিতে পারি তিনি আমাদের অতি নিকটে, অন্তর হইতে অন্তরতম এবং এই বিশ্বচরাচরের সর্বত্রই ওতপ্রোত ও অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত। তখনই আমরা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করি যে, তিনি আমাদিগের নিকট হইতেও নিকটতর এবং তাঁহাকে লাভ করা মোটেই আমাদের সাধ্যাতীত নয়। তখনই দ্বৈতবাদের অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া সাধক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের স্তরে উপনীত হয়। এই বিশিষ্টাদ্বৈত স্তরে উন্নীত হইলে সাধক তখন উপলব্ধি করে যে, ঈশ্বর এক, বিরাট ও অনন্ত সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত; আমরা তাঁহারই অংশ, তাঁহা হইতে মোটেই ভিন্ন নই এবং প্রত্যেক জীবাত্মা সেই অখণ্ড পরমাত্মারই অংশ। কিন্তু এই স্তরকেও অতিক্রম করিয়া সাধক যখন আরও এক উচ্চতর অনুভূতি লাভ করে, তখন সে সকল আপেক্ষিকতা ও সকল-প্রকার সম্বন্ধকে অতিক্রম করিয়া নির্গুণ এক পরমব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। তখন সে প্রকৃতই সর্ববিধ নাম ও রূপের অতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া ব্রহ্মের সহিত আপনার একত্ব ও অভিন্নত্ব অনুভব করিয়া নিঃসংশয়ে ঘোষণা করে: "আমি আমার পরমপিতার সহিত অভেদ এবং অভিন্ন।" ইহাই হইল আধ্যাত্মিক জগতের পরিপূর্ণতার চরম সীমা। জীব তখন পূর্ণ এবং তাহার জীবত্বের সর্ববিধ আবরণ উন্মোচিত হইয়া যায় এবং 'স্বে

মহিম্নি'—ঐশ্বরিক গুণ ও আপন মহিমায় জীব তখন শিব হইয়া জগতে বিচরণ করিতে পারে। মুক্ত জীব ঠিক সে সময়ই খৃষ্ট, বুদ্ধ বা অন্যান্য সত্যদ্রষ্টা ও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহামানবগণের সমতুল্য হইতে পারেন।[১৬] ভারতীয় সার্বভৌমিক ধর্মের অভিধানে 'খৃষ্ট' শব্দের অর্থ আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভের অবস্থা। এই অবস্থায় জীবের সহিত ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হয় এবং তখনই সে প্রকৃত 'খৃষ্ট' নামে অভিহিত হইতে পারে। এই অবস্থালাভও কোন ব্যক্তিবিশেষের একচেটিয়া নহে, যে কোন একনিষ্ঠ সাধকই সাধনার দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারে।

এই সার্বজনীন ধর্মের শিক্ষানীতি এমনই স্বচ্ছ ও সুন্দর যে, ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি ঃ জীবাত্মা ব্রহ্মই—সকল জীবের মধ্যেই ব্রহ্মসত্ত্বা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা প্রসুপ্ত হইয়া আছে। জীব যখন আপনার অজ্ঞানঅন্ধকার দূর করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তখনই আপন মহিমা তার নিকট প্রকাশিত হয় এবং তখনই সকল সংশয় ও মোহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতীয়মান এই জগৎভ্রান্তির পারে যাইতে সে সক্ষম হয়। তখন সে আপনাকে চিদানন্দঘন শিবস্বরূপে উপলব্ধি করে এবং বুদ্ধ, চৈতন্য, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহামানবদিগের ন্যায় অপার্থিব ভূমিতে উন্নিত হইয়া ব্রহ্মানন্দসাগরে মগ্ন থাকে।

'বুদ্ধ' অর্থেও দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহামানবকেই বুঝায়। যিনি আত্মজ্ঞান বা 'বোধি' লাভ করিয়াছেন তিনিই বুদ্ধ। যীশুখৃষ্ট এই দিব্যজ্ঞান

১৬। দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াও যে মহামানবগণ আপনাদের অন্তরে জগতের জন্য করুণা ও কল্যাণ কামনা রাখিয়া দেন একমাত্র তাঁহারাই আবার মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরও নির্লিপ্ত থাকিয়া জগতে সাক্ষী ও দ্রষ্টার ন্যায় বিচরণ করিতে পারেন।

লাভ করিয়াই খৃষ্টত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতমও ঠিক এই অবস্থা লাভের পর বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

বেদান্তের সার্বজনীন ধর্মসাধনায় সত্যই জীবনে অসীম আনন্দ ও অপার শান্তি লাভ করা যায়। এই ধর্মে মানুষের জন্য কোন নরকাগ্নি বা অনন্ত নরকের ব্যবস্থা নাই অথবা অনন্তকাল নরক ভোগ কখনও বিশ্বাস করে না। ইহার মতে কর্মই শুভ অথবা অশুভ ফল প্রসব করে। মানুষ যদি জীবনে কোন ভুল করিয়া থাকে তবে কার্যকারণবিধি বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই সেই ভুলগুলি আপনাদের ফল প্রসব করে। কিন্তু তাহা হইলেও সেই ফল বা তাহার ভোগ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। এজন্য এই ধর্মের নীতি যাহারা অনুসরণ করে, মৃত্যুও তাহাদের নিকট বিভীষিকা বলিয়া প্রতিভাত হয় না, মৃত্যুকে তাহারা বরং সাদরেই বরণ করিয়া থাকে।[১৭]

যদিও বেদের উপদেশের উপর বেদান্তের এই সার্বজনীন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ও বেদের ন্যায়ই ইহা সুপ্রাচীন তথাপি লোকে ইহার আদর্শ পুনঃ পুনঃই বিস্মৃত হইয়াছে এবং মানবের মুক্তি-পথের প্রদর্শক দিব্যদ্রষ্টা ধর্মগুরুগণ সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া পুনঃপুনঃ বিস্মৃতির অন্ধ গহ্বর হইতে এই ধর্মাদর্শকে উদ্ধার করিয়া লোকসমাজে ইহাকে প্রচার ও

১৭। বেদান্তের ধর্মে মানুষের আত্মা, শুধু মানুষের নয়, সকল জীবের আত্মাই মৃত্যুহীন অবিনশ্বর। শরীর পাঞ্চভৌতিক, সুতরাং তাহার ধ্বংস আছে। আত্মা শরীরী হইলেও স্বরূপতঃ অশরীরী ও নিত্য, শরীরের মৃত্যুতে তাহার কখনও মৃত্যু হয় না। এজন্য বেদান্তের শিক্ষাকে অনুসরণ করিয়া আত্মাকে মৃত্যুহীন বলিয়া যাহারা বুঝিতে পারিয়াছে শরীরের মৃত্যুকে তাহারা ভয় পাইবে কেন?

পুনঃস্থাপন করিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার একবার ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মের অবনতির পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আচার্য শঙ্কর পুনরায় ইহাকে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পর শ্রীরামানুজ ও শ্রীচৈতন্যদেব ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অবশেষে যান্ত্রিক সভ্যতাপূর্ণ জড়বাদ সমাচ্ছন্ন এই আধুনিক যুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার সর্বধর্ম-সারমর্ম দিব্যানুভূতি সমুজ্জ্বল মহাজীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মবাণীদ্বারা এই সনাতন ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ জনসমাজে পুনঃপ্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য নাম, লোকোত্তর জীবন ও বিচিত্রবাণী আজ শুধু ভারতবর্ষে নয়—সুদূর সমুদ্রপারে, ইউরোপ ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারীর নিকট সগৌরবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ভারতের অসংখ্য শিক্ষিত হিন্দু নরনারীও শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঈশ্বরের আধুনিক অবতার বলিয়া ভক্তি করেন। যে বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক বন্যা আজ আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে নগরে ও প্রত্যেক প্রদেশে প্রবল বেগে প্রবাহিত, তাহার মূল উৎস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সমুত্থিত এই বিরাট আধ্যাত্মিক বন্যা দিনে দিনে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে সমুত্থিত এই বন্যা সমগ্র পৃথিবীর ধর্মজগতে যে পরিবর্তন ও নবজাগরণের স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে, তাহার ভবিষ্যত ফল যে অতিশয় আশ্চর্য ও কল্যাণকর হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ভারতের সমাজ ও জাতিভেদপ্রথা ॥

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি ভারতীয় আর্যগণ মানুষের ধর্মবিশ্বাস-ব্যাপারে কী অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতানুবর্তিগণের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সহিষ্ণুতাই প্রদর্শন করিতেন। অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর নির্যাতনের বা অত্যাচারের কোনই উল্লেখ ভারতের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি, নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞেয়বাদিগণও নির্বিঘ্নে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিয়াছেন। ধর্মব্যাপারে তাঁহাদিগকে কোনো প্রকারে নির্যাতন ভোগ করিতে হয় নাই। যদিও মুসলমান ও খৃষ্টানগণ হিন্দুকে ঘৃণা করিয়া থাকেন তথাপি হিন্দুগণ তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ শত্রুতা পোষণ বা অত্যাচার করেন না, বরং তাঁহাদিগের সহিত শান্ত ও ভদ্রভাবে বাস করেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ সর্ববিধ ধর্মমত-সহিষ্ণুতার ও ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা উপভোগের স্থান। কিন্তু ধর্মবিষয়ে উদারতা থাকিলেও হিন্দুগণ সামাজিক ব্যাপারে পৃথিবীর অন্য যে কোন জাতি অপেক্ষা কঠোর বিধি-নিষেধের নিয়ম মানিয়া চলেন। হিন্দুগণের সামাজিক নীতি ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হিন্দুসমাজের নিয়মনীতি অত্যন্ত কঠোর ও বাধ্যতামূলক। বিবাহ প্রভৃতি দ্বারা হিন্দুরা মুসলমান, খৃষ্টান অথবা অন্য কোন পরধর্মীদের সহিত পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। ইহার জন্য তাঁহাদের ধর্মমত মোটেই দায়ী নহে, নিছক সামাজিক আদর্শকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা একার্য করিয়া থাকেন।

সামাজিক আচার ব্যবহারে হিন্দুগণকে একদিক দিয়া বরং গোঁড়াই

(রক্ষণশীল) বলিতে পারা যায় এবং এবিষয়ে বোধ হয়—চীনা ও জাপানীদের অপেক্ষাও তাঁহারা অধিকতর রক্ষণশীল। বহুশতাব্দী ধরিয়া বিদেশীদের আক্রমণ, উপদ্রব ও লুণ্ঠন ইত্যাদির ফলে হিন্দুদের সামাজিক ব্যাপারে এই রক্ষণশীলতার উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার পর আমাদের একথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, গ্রীকগণ প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল ৩২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ এবং তাহার পর একে একে শক, মঙ্গোলিয়ান, তাতার, মুসলমানগণ এবং অবশেষে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণ ভারতবর্ষকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছে। এই শক্তিশালী বৈদেশিক জাতিগণ বিরাট হিমানী-সম্প্রপাতের (avalanche) ন্যায় ভারতবর্ষের উপর মহাপ্রচণ্ড-বেগে আসিয়া ইহার সমস্ত ধনসম্পদ কতবারই না লুণ্ঠন করিয়াছে এবং আর্যজাতির যাবতীয় কীর্তিকলাপরূপ মন্দির, মঠ, রাজপ্রাসাদ ও জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। আর দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, হিন্দুদের সকল বিষয়েই কোন সহায়তা করা দূরে থাকুক বরং তাহাদের বহুমূল্য সম্পদ ও যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্যই এই বৈদেশিকগণ বারংবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। সুতরাং নিজেদের সামাজিক বিধিনিষেধ সম্বন্ধে একান্ত কঠোর না হইলে হিন্দুদের ন্যায় কোন জাতি এরূপ একের পর এক অবিশ্রান্ত বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিতে পারিত না এবং তাহা না হইলে নানা প্রকার সর্বনাশকর আঘাতই বা কেমন করিয়া তাঁহারা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইতেন? ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, মিশরীয়, পারসীক ও অন্যান্য যে সকল জাতি এই সময় বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই তাহারা কালক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হিন্দুগণ সঙ্কট সময়ে যে রক্ষণশীলতার প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আধুনিক যুগে সভ্য

জগতের নিকট একটি বিশেষ শিক্ষার বিষয়ই বলিতে হইবে। আর এই রক্ষণশীলতাই আজ পর্যন্তও হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া রখিয়াছে এবং ইহা পূর্বোক্ত মহাশক্তিশালী বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় রক্ষাপ্রাচীর সৃষ্টি করিয়া আর্য-শোণিত ও আর্যসাহিত্যের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়াছে।

এই রক্ষণশীলতা আছে বলিয়াই কোন বৈদেশিক শক্তিই হিন্দুর সমাজসৌধকে আজও ধ্বংস করিতে পারে নাই। হিমালয়ের অভ্রভেদী শিখরমালার ন্যায় হিন্দুসমাজ বৈদেশিক শত্রুদের আক্রমণ বার বার অগ্রাহ্য করিয়াছে এবং যুগযুগান্তর হইতে আজও অচল অটল অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ, হিন্দুসমাজের ভিত্তি বাণিজ্যিক (commercialism) অস্থায়ী চোরাবালির স্তূপের উপর অথবা সাম্রাজ্যলিপ্সার জলাভূমির উপর স্থাপন করা হয় নাই। তাহার পর ইহাও সত্য যে, হিন্দুসমাজের আদি প্রতিষ্ঠাতৃগণ মধ্যযুগের পরস্বলুণ্ঠনকারী ইউরোপীয় ব্যারণদিগের ন্যায় অথবা পরদেশ-লোলুপ পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিক নেতাদের মতন ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। বিশ্বপ্রেমের বেদীমূলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, উচ্চাভিলাষ, ক্ষমতা প্রিয়তা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যাবতীয় বাসনা তাঁহারা বলি দিয়াছিলেন। ভারতের বর্তমান হিন্দুগণ সেই সুদূর প্রাচীন যুগের এই মহাপ্রাণ মুনিঋষিদিগের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নামে পরিচিত হইতে গৌরব বোধ করেন। সেই ধর্মাত্মা পূর্বপুরুষগণের পবিত্রতা, স্বার্থহীনতা, আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ঈশ্বরোপলোব্ধি প্রকৃতই হিন্দুদের অসীম গৌরব ও গর্বের কারণ। এই জাতীয় গৌরববোধই অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রথা রোধ করিয়া হিন্দুদের পবিত্র আর্য রক্তকে কলুষিত হইতে দেয় নাই। হিন্দুগণ যদি বাস্তবিকই আপনাদের এই জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে

সচেতন না থাকিতেন বা সামাজিক ব্যাপারে বৈদেশিকদের সহিত অবাধে (বিবাহাদি কার্যদ্বারা) তাঁহারা মিশিয়া যাইতেন তাহা হইলে পবিত্র আর্যকুলের বিশুদ্ধ রক্ত-গঠিত তাঁহাদের বংশধরগণের অস্তিত্ব আজ বর্তমান ভারত হইতে নিঃসন্দেহে লুপ্ত হইয়া যাইত।

হিন্দুসমাজ ক্ষুদ্র শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায় আবার বহু গোষ্ঠী ও শাখা সম্প্রদায়ে গঠিত। এই সকল গোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই আচার ও ব্যবহারের বিভিন্নতা আছে। বহু পরিবার, কুল বা বংশের সমষ্টি লইয়াই এই গোষ্ঠী (clan) এই সকল পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ বা নারী হইল এক একজন সভ্য-বিশেষ। প্রত্যেক হিন্দু নরনারী তাহার বংশের ঐতিহ্য ও নিয়মাবলী বা কুলধর্ম পালন করিতে বাধ্য। প্রত্যেক পরিবারকে এই সমস্ত গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী বা শাখা সম্প্রদায় আবার মূল সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও অনুমোদিত বিধিব্যবস্থা পালনের স্বাধীন অধিকার প্রত্যেক পরিবারের নর-নারীগণেরই আছে। যদি কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পরিবারের মতে কোন কার্য তাহাদের চির-আচরিত প্রথার বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে ঐ কার্য হইতে (সমাজ অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিকে) বিরত থাকিতে হইবে। যদি কোন ব্যক্তি সমাজের সকলের সমর্থিত ও অনুমোদিত কোন প্রথার বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে সাহসী হ'ন তাহা হইলে সমস্ত সামাজিক সুবিধা ও অধিকার হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করা হয়। এই সামাজিক শাস্তির ফলে ঐ ব্যক্তি নিজগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোন পরিবারের সহিত মেলামেশা করিতে অথবা কোন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না এবং সে আপন সমাজের আশ্রয় হইতেও বিতাড়িত হয়।

হিন্দুসমাজের এই গোষ্ঠী বা শাখা সম্প্রদায়গুলি সংস্কৃত ভাষায় 'গোত্র' নামে অভিহিত। ইহার প্রকৃত অর্থ বংশ। যে কোন এক পূর্বপুরুষের সকল বংশধর একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে গোত্রের অধিপতি বা গোত্রের স্রষ্টা প্রায় চব্বিশ জন ঋষি ছিলেন।[১] তাঁহারা সকলেই বৈদিক যুগের দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহারাই বৈদিক মন্ত্রসমূহ, স্তোত্রাবলী ও আর্যধর্মের নানাবিধ শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই জনসমাজের নেতা ও গোষ্ঠীপতি ছিলেন। আমরা সেই ঋষিগণেরই বংশধর।

বহু গোত্রের সমষ্টিকে সংস্কৃত ভাষায় 'জাতি' বলা হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায় বহু গোষ্ঠীর সমষ্টি। এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল নরনারী একত্রে বাস করিয়া একই বিধিব্যবস্থা মানিয়া চলে। কোন কার্য করণীয়

১। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গোড়ার দিকে দেখা যায়, 'গোত্র' বলিতে সাধারণ পূর্বপুরুষ—যিনি ঋষি বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারই সম্প্রদায়ভুক্ত বুঝাইত। পরবর্তীকালে 'গোত্র' শব্দে একমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকেই আবার লক্ষ করিত। ভাষাতত্ত্ববিদ্ রথ (Roth) ও গোল্ডনার্ (Goldner) 'গোত্র' শব্দকে 'গোশালা' বা 'গোযূথ' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে। গোষ্ঠীর অধিপতিদের নামানুসারেই গোত্রের নাম হইত। তাঁহারা সকলেই প্রায় ঋষি ছিলেন। কশ্যপ, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, শাণ্ডিল্য ইঁহারা সকলে গোষ্ঠীর আদি অধিপতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৪।১) এই 'গোত্র' শব্দের উল্লেখ আছে। সেখানে জাবালপুত্র সত্যকাম জাবালানাম্নী মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেনঃ "ব্রহ্মচর্যং ভবতি! বিবৎস্যামি, কিং গোত্রা ন্বহমস্মীতি ;"—'আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সুতরাং বলুন, আমি কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ?' দেখা যায়, ঔপনিষদিক যুগেই বংশ ও গোত্র বিভাগ সমাজে বেশ সুপরিস্ফুট ছিল।

অথবা অকরণীয়, জাতকর্ম, বিবাহ অনুষ্ঠান, মৃতের সৎকার, শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ড, আমোদ-প্রমোদ, পান-ভোজন, জীবিকানির্বাহের জন্য বৃত্তি, ব্যবসায় শিল্পকার্য নির্বাহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারেই সকল হিন্দু সম্প্রদায়ই বংশ-পরম্পরাগত বিধিব্যবস্থা অনুসারে সম্পন্ন করিতে বাধ্য। এই সকল সামাজিক বিধিকে 'জাতিধর্ম' বলা হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চণ্ডাল প্রভৃতি নিতান্ত নিম্নবর্ণ হইতে সর্বোচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত এই জাতিধর্ম বা সাম্প্রদায়িক অনুশাসন মানিয়া চলিতে হয়। কোন প্রকার বৃত্তি, ব্যবসায় বা শিল্পকার্য যদি সম্প্রদায় কর্তৃক অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তিই তাহা অবলম্বন করিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন প্রকার কামনা পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে দেখিতে হইতে যে, ঐ কামনা পূর্ণ করিবার কার্য তাহার কুলধর্ম, গোত্রধর্ম এবং জাতিধর্মের অনুমোদিত কি-না? এই তিন ধর্মের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সে যে কোনও কার্য করিতে পারে। এবিষয়ে যদি কোন প্রকার মতভেদ হয় তাহা হইলে সমগ্র সম্প্রদায় কোন পরিবার এবং ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে যাহা কর্তব্য তাহাই নির্ধারিত করিয়া দিবে এবং সেই নির্ধারণ ঐ ব্যক্তি বা পরিবারকে অতি অবশ্যই বিনা আপত্তিতে মানিতে হইবে। সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা নেতা বলিয়া স্বাকৃত এবিষয়ে তাঁহাদের মীমাংসাই চূড়ান্ত। হিন্দুসমাজে পারিবারিক স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, গোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য পারিবারিক স্বার্থ এবং সমগ্র জাতিগত স্বার্থের ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীর স্বার্থ বিসর্জন করা হইয়া থাকে।

এই সামাজিক শাসননীতিও আশ্চর্য প্রকারের; কিন্তু ভারতবর্ষে ইহা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। জন্ম হইতে মৃত্যুকাল

পর্যন্ত হিন্দুরা যে-জীবন যাপন করেন, তাহাকে আত্মোৎসর্গেরই জীবন বলা যায়। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বা ভোগ-বিলাসের কথা অথবা নিজের ব্যক্তি বা স্বার্থগত বিষয় চিন্তা না করিয়া প্রথমে পরিবারের, তাহার পর গোত্র ও সর্বশেষে স্বীয় সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য জীবন যাপন করাই হিন্দুসমাজের প্রত্যেক পুরুষ বা নারীর আদর্শ। ইহাই ভারতীয় প্রথা। এই প্রকার সুশৃঙ্খল সামাজিক শাসনপ্রণালী অন্যান্য দেশেও অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, ভারতবর্ষীয় হিন্দু সমাজবিধির ন্যায় এরূপ কঠোর ও সম্পূর্ণ সুসঙ্গতভাবে সেগুলি গঠিত নয়।

হিন্দুদের সামাজিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন প্রকার মর্যাদার পার্থক্য নাই। সকল সম্প্রদায়গুলিই স্ব স্ব প্রধান এবং সমস্ত গোষ্ঠীগুলিই সমান মর্যাদাসম্পন্ন। ভারতীয় প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যেন এক একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। কোন সম্প্রদায় অপর এক সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থার উপর কোন হস্তক্ষেপ করে না। এ বিষয়ে প্রত্যেক সম্প্রদায় সমষ্টির দিক দিয়া স্বাধীন হইলেও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নরনারী ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন নয়। তাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সর্ববিধ নিয়ম প্রতিপালন করিতে অতি অবশ্যই বাধ্য। যদি কোন ব্যক্তি এই সব সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ভঙ্গ করে তাহা হইলে তাহাকে সমাজের নিয়মানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, নতুবা সমাজ তাহাকে নিজ গোষ্ঠী হইতে বাহির দেয়। সমাজ হইতে বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য হওয়া হিন্দুসমাজে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি। কেননা সমাজচ্যুত ব্যক্তিকে কেহ কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে না অথবা তাহার কোনও নিমন্ত্রণও গ্রহণ করে না। জাতকর্ম বিবাহ, মৃতদেহ সৎকার, শ্রাদ্ধকৃত্য প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানে সমাজের কোন ব্যক্তিই তাহাকে সাহায্য করিবে না। এই প্রকার ব্যক্তিকে

বন্ধুহীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ ব্যক্তি হিন্দু-সমাজের অন্য কোন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। হিন্দুসমাজের শাসননীতি এমনই কঠোর ও প্রবল।

হিন্দুসমাজের বহির্ভূত ব্যক্তিগণ ও বিদেশীয়েরা এই প্রকার সমাজ-শাসননীতির অর্থ বুঝিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা ইহার অন্তর্গত কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন বলিয়া ইহার মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন না। কোন নির্দিষ্ট পুস্তকে হিন্দুদের সমাজশাসনের এই সকল বিধিনিষেধ লিখিত না থাকিলেও পুস্তকে লেখা বিধিনিষেধ অপেক্ষা ইহাদের প্রভাব অধিকতর প্রবল।

একই ধর্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের মধ্যে কেন যে বিবাহাদি, অথবা সামাজিক খাওয়া দাওয়া মেলামেশা হয় না, ইহা বৈদেশিকগণ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। ভারতবর্ষে সকল প্রদেশেই হিন্দুসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রাহ্মণজাতিরা বাস করেন অথচ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের সহিত পাঞ্জাবী, বোম্বাই অথবা অন্য কোন প্রদেশের ব্রাহ্মণদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। ইহার কারণ কী? কারণ এই যে, ইঁহারা সকলেই হিন্দুধর্মভুক্ত হইলেও ইঁহাদের প্রত্যেকের সমাজ আলাদা। একই বাঙ্গালাদেশে আবার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, মৈথিলী ও কনৌজী প্রভৃতি শ্রেণীভেদ থাকায় সকলের মধ্যেই আহার, বিহার ও বিবাহাদি কার্য চলিতে পারে না। কেননা তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক গোষ্ঠী বা শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু এক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেমন ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য প্রভৃতিতে বিবাহ এবং আহার প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপারে কোন নিষেধ নাই।

গোষ্ঠী বা গোত্রগুলিকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া তাহাদের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের আর্যরক্ত যথাসাধ্য বিশুদ্ধ ও অব্যাহত রাখিয়া প্রত্যেক

নরনারীকে উচ্চতম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শে জীবন যাপন করানই এই সমাজনীতির উদ্দেশ্য। যে কার্য ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারে হিন্দুসমাজ সর্বতোভাবে তাহারই সমর্থক এবং যাহা ব্যক্তি বা সমাজের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না সেই কার্যের ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী। অপরের অকল্যাণকর কার্য হিন্দু-সমাজে কখনও সমর্থিত হয় না। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি ও বিধিব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ জীবনযাপন করেন ও আপনাদের সন্তান-সন্ততিগণের জীবনও তাঁহারা সেইভাবে গঠন করিয়া থাকেন। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে নিজ নিজ সামাজিক কর্তব্যকর্ম নির্বাহ করিয়া তাঁহারা স্বতঃই সুখ ও আনন্দ ভোগ করেন এবং নানাভাবে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্য পরিবার ও ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য কর্ম করিয়া তাঁহারা সর্বদা সমাজের সেবা করেন। হিন্দুসমাজের কোন ধনশালী ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য হইল তাঁহার নিজ পরিবারবর্গের সাহায্য করা ও তাহার পর তাঁহার নিজের সম্প্রদায়কে সাহায্য করা। এই সমস্ত কর্তব্যের পর জনসাধারণের হিতসাধন উদ্দেশ্যে তিনি অপর সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য দয়া দাক্ষিণ্যপূর্ণ জনহিতকর কার্য করিয়া থাকেন।

ভারতে প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন এক একটি পরিবারের মত। ইহার অন্তর্গত নরনারীগণের মধ্যে একতার ভাব প্রবলরূপে বর্তমান। এই কারণেই আমেরিকা ও ইউরোপের ন্যায় ভারতে অনাথাশ্রম, দরিদ্রাবাস প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার আর প্রয়োজন হয় না। সমাজের অন্তর্গত নরনারীরা দরিদ্র, অনাথ, বিপন্ন ব্যক্তিদের অন্ন বস্ত্রাদি দান করিয়া ভরণপোষণ করেন বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে অনাথাশ্রম, দরিদ্রাবাস অথবা অন্য কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতার কথা উঠে নাই। সমাজের এই সব দরিদ্র, দুঃখী, আতুর

ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আমাদের ভ্রাতার ন্যায়; তাহাদের অভাব মোচন করা আমাদের অতি অবশ্য কর্তব্য। ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর জনসেবার প্রণালী পৃথিবীতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই প্রকার সমাজপরিচালনার নীতিই যে হিন্দুদের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট তাহা হিন্দুসমাজের নেতারা বহু অভিজ্ঞতার ফলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহে বিভক্ত সমগ্র হিন্দুসমাজের সমস্ত পরিবারগুলির মধ্যে প্রত্যেক নরনারীকে যদি এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিতে প্রবৃত্ত করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুজাতি সর্বতোভাবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হইয়া উঠিবে। এইরূপে প্রাচীন হিন্দুসমাজনেতারা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এই নিয়ম প্রচলনের দ্বারা সমষ্টিগতভাবে সমস্ত হিন্দুজাতিকে এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত করিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্তমানে হিন্দুসমাজের এই পরিবারগুলিতে আর পূর্বভাব অক্ষুণ্ণ থাকিতেছে না। ইহারা যেন এক্ষণে একটি অচল আয়তনে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ইহাঁদের বিধিনিয়ম ও আদর্শ এমন কঠোর, বাধ্যতামূলক ও রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছে যে, কালের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের আবশ্যক মত পরিবর্তন ইহারা করিয়া লইতে পারিতেছে না। মনে হয়, প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ব্যবস্থা ও আদর্শকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম বলিয়া মনে করাই ইহার কারণ। এজন্য কোন হিন্দু যদি কালের রীতি অনুযায়ী কোন নূতনভাবে সামাজিক জীবন যাপন করে তাহা হইলে তাহাকে নিজ সমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এখনকার হিন্দুসমাজবিধির ইহা একটি মহাদোষ। তবে এই দোষ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুদের সম্প্রদায়গত সমাজশাসনবিধি পাশ্চাত্ত্য দেশের খৃষ্টীয় যাজক-মণ্ডলীর নির্দিষ্ট সমাজশাসনবিধি অপেক্ষা অধিকতর সুফলপ্রদ ও কল্যাণকর। তাহার কারণ কি? কারণ সামাজিক

ব্যাপারকে ধর্ম হইতে সর্বদা সম্পূর্ণ পৃথক রাখা উচিত। তাহা না করিলে উহা হইতে ধর্মবিরোধ, অত্যাচার, বিশেষতঃ মানবপীড়ন প্রভৃতি দোষ দেখা দিতে পারে। আর এই উদার দৃষ্টি আছে বলিয়াই ভারতে অপরাপর ধর্মমতের উপর একটা সহিষ্ণুতার ভাব দেখা যায়। ভারতে সামাজিক ব্যাপারের জন্য কাহারও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় না। ভারতবাসী মাত্রেই আপন রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যে কোন প্রকার ধর্মসাধন-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে। এই ধর্ম নির্বাচনের সহিত সামাজিক জীবন-যাপনপ্রণালীর কোনও সম্বন্ধ নাই। এইজন্যই ভারতবর্ষের হিন্দুদের সমাজবিধির মধ্যে কোন কোন অংশে অসম্পূর্ণতা থাকিলেও ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ততঃ ধর্মবিষয়ে ইহাতে সকলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইহা সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা দান করিয়া থাকে। কোনও গুরুতর বিষয়ের সুমীমাংসার জন্য স্ত্রী পুরুষ সকলে সমানভাবে আলোচনা করিয়া স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়েই অভিজাত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন বলিয়া তিনটি শ্রেণী আছে। নিম্ন ও মধ্যম শ্রেণীগুলি উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট এবং অভিজাত শ্রেণী হইতে তাহারা অনুগ্রহ ও সাহায্যাদিরও প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কোন নিম্নজাতীয় ব্যক্তি অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারী হইলেও আপনার জন্মগত অধিকারের সীমাকে অতিক্রম করিতে পারেন না অথবা নিজের জাতি বা গোত্র পরিবর্তন করিতেও সে ব্যক্তি সক্ষম নয়। আবার অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তিও তাহাকে গ্রহণ করিবে না বা উচ্চতর অন্য কোন জাতিও তাহাকে আপনাদের দলভুক্ত করিতে চাহিবে না। তাহা ছাড়া সমাজ হইতে কোনও উচ্চতর অধিকারও তাহাকে দেওয়া হয় না।

হিন্দুসমাজে কোন পুরুষ অথবা নারী যে জাতি, বর্ণ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে সেই জাতি, বর্ণ ও গোত্রের অনুযায়ীই সামাজিক মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার সে পাইয়া থাকে। যেমন মাহিষ্যবংশীয়া রাণী রাসমণি প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন। ভারতবর্ষে নারীগণ বিষয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া নিজেরাই তাহা পরিচালনা করেন এবং এবিষয়ে তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপেই স্বাধীনতা আছে। এই মহিলা অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বিষয়কর্মাদি নিজেই অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেন। কলিকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। দরিদ্রসেবা এবং সমাজের হিতকর বহু সৎকার্যে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেন। রাণী-রাসমণির সৎকর্মময় পবিত্র জীবন সকলের নিকটই আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছে। তিনি স্বীয় জাতির পক্ষে প্রতিপালিকা রাণীর ন্যায়ই ছিলেন। তাঁহার সমাজভুক্ত সকলের নিকট তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার পূজা লাভ করিতেন। তিনি আপন সমাজের 'রাণী' আখ্যা পাইয়াছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরাও জাতিনির্বিশেষে রাণী রাসমণির শতমুখে প্রশংসা করিতেন। নানাপ্রকার সদ্‌গুণসম্পন্না হইয়াও স্বীয় গোত্র হইতে পৃথক হইবার চিন্তা তাঁহার মনে কখন উঠিত না অথবা স্বীয় জাতিগত বিধিব্যবস্থাকে তিনি জীবনে কখনও অস্বীকার করেন নাই।

ভারতের সমস্ত জাতি আবার বৃহত্তর একটি শ্রেণীর অংশ বা বিভাগ মাত্র, ইংরাজীতে ইহাকে caste বলে। এই caste শব্দটিই ভারতের একটি অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। এই শব্দদ্বারা কিন্তু হিন্দুদিগের জাতিবিভাগকে বুঝায় না। এই শব্দ যতই কম ব্যবহার করা যায়, ততই আমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আর তাহা হইলে আমরা হিন্দুসমাজের সত্যকার বিশিষ্টতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিব।

পর্তুগীজ ভাষায় caste শব্দে জন্মগত শ্রেণীকে বুঝায়। ইংরাজী caste শব্দ এই পর্তুগীজ *casta* শব্দেরই রূপান্তর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কতকগুলি অশিক্ষিত পর্তুগীজ নাবিক ভারতে পদার্পণ করে। তাহারাই হিন্দুসমাজের কতকগুলি শ্রেণী সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তখন ইহার অর্থ ছিল 'পবিত্র ও অবিমিশ্ররক্তসম্পন্ন বংশ।' সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের কোনও বাস্তবিক প্রতিরূপ নাই। caste বলিতে যাহা বুঝায় এমন ভাবোদ্যোতক কোনশব্দই বেদ, মনুসংহিতা ও এমন কি কোন পুরাণ গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় না। caste (বর্ণ) শব্দের অর্থ কোন আমেরিকাবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলিবেন একজন ভারতবাসীও সে সম্বন্ধে সেই একই প্রকার উত্তর দিবেন। caste শব্দের দ্বারা সংস্কৃতে 'বর্ণ' শব্দটিকেই একরকম ভাবে ভাষান্তরিত করা হইয়াছে। এই 'বর্ণ' শব্দটির দ্বারা কিন্তু প্রাচীন ভারতের বিজেতা আর্যগণ ও আদিম অনার্যদিগের জাতিগত গাত্রবর্ণের পার্থক্যই নির্দেশ করা হইত। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন ঃ "বর্ণ শব্দদ্বারা পরবর্তী কালে সংস্কৃত ভাষায় 'জাতি' বুঝাইলেও ঋগ্বেদে ইহা আর্য ও অনার্যগণের পার্থক্যজ্ঞাপক শব্দরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্যগণের মধ্যে জাতিবিভাগ নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে কখনও কোনও স্থানে এই 'বর্ণ'-শব্দ উল্লিখিত হয় নাই।"[২]

ক্রমশঃ এই বর্ণগত পার্থক্য হইতেই আর্যগণের মধ্যে জাতিবিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই যে, গুণ ও কর্ম অনুসারে ভগবান সমগ্র মানবজাতিকে চারিবর্ণে বিভক্ত

২। Sir R. C. Dutta : *Civilization in Ancient India*, Vol. I, P. 65.

করিয়াছেন।[৩] শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারিটি বর্ণই বিভিন্ন আদি মানবগণের মূল গাত্রবর্ণ ছিল। এই চারিটি মূল বর্ণের সংমিশ্রণ হইতেই পৃথিবীতে নানাবিধ জাতিবিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আর্যগণের মধ্যে যাঁহাদের গাত্রের চর্ম শ্বেতবর্ণ তাঁহারাই 'ব্রাহ্মণ,' যাঁহাদের দেহ লোহিত বা রক্তবর্ণ তাঁহারাই 'ক্ষত্রিয়,' পীতবর্ণ দেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 'বৈশ্য' এবং যাঁহারা কৃষ্ণকায় তাঁহারাই 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাহ্মণাদি এই চারিশ্রেণীর বিভিন্ন গুণ ও কর্মসকল গীতায় বর্ণিত হইয়াছে যথা ঃ স্বভাবজাত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসকল বিভক্ত করা হইয়া থাকে। শম, দম, তপস্যা, পবিত্রতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ঈশ্বরে বিশ্বাস—এইগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। শৌর্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, কর্মদক্ষতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করা, দান, রাজ্য ও লোকশাসন ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক গুণ। কৃষি, গোপালন ও রক্ষণ, বাণিজ্য, শিল্পকার্যাদি বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম এবং উচ্চতর জাতিগণের সেবাই শূদ্রের কর্ম। স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারাই প্রত্যেক মনুষ্য সংসিদ্ধি বা জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৪] অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে কেবলমাত্র বর্ণের পার্থক্য দ্বারা সে সময়ে কোন হিন্দু বা ভারতীয় আর্যের জাতি নির্ধারিত হইত না। সেই সঙ্গে

৩। 'চাতুর্বণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।' —গীতা ৪।১৩

৪। 'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥

তাহার স্বভাবজাত গুণ ও অবলম্বিত কর্মসমূহেরও প্রাধান্য স্বীকার করা হইত। জাতিবিভাগ সম্বন্ধে ইহাই ছিল হিন্দুদের মূল নীতি। খৃষ্টানমিশনারীগণ অথবা পরনিন্দাকারী বিদেশীয়গণ হিন্দুদিগের জাতিবিভাগের যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাহা বিকৃত, সুতরাং তাহা হিন্দুদের জাতিবিভাগপদ্ধতির প্রকৃত পরিচয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ব্রাহ্মণগণ স্বাভাবিক গুণরাশি দ্বারা কতকগুলি কর্ম সম্পাদনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই কর্তব্য কর্মগুলি তাঁহারা নিষ্ঠা ও নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতেন্। স্বাভাবিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া ব্রাহ্মণগণ বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন বিভাগ ও বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রনির্দিষ্ট যাবতীয় যজন-যাজন ক্রিয়াদি সম্পাদন ও অন্যজাতির গৃহে ধর্মার্থে উৎসব-অনুষ্ঠান কার্যে পৌরোহিত্য করিতেন। যাঁহাদের প্রকৃতিতে যুদ্ধ করিবার ভাব বর্তমান তাঁহারাই সৈনিক ও সেনাপতির কার্য করিতেন। দেশশাসন, রাজ্য-রক্ষা, শত্রুদমন প্রভৃতির ভার তাঁহাদের উপর ছিল। এই শ্রেণীই 'ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত। কৃষি, বাণিজ্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন করিবার শিল্প প্রভৃতি কার্যভার বৈশ্যদের উপর অর্পিত হইয়াছিল। আর যাহারা উক্ত তিন উচ্চ-শ্রেণীর দাসত্ব অথবা অন্যান্য শ্রমসাধ্য কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত তাহারাই 'শূদ্র' নামে পরিচিত হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এইভাবে হিন্দুসমাজে তাহার অন্তর্ভুক্ত সকল লোকের

কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥'

—গীতা ১৮।৪১-৪৫

প্রকৃতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমবিভাগপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির পদ, কর্তব্যকর্ম, এবং পারিশ্রমিক বৃত্তি সমস্তই সুনির্দিষ্ট ছিল।

হিন্দুসমাজে এইভাবে শ্রমবিভাগ সম্ভবতঃ বৈদিকযুগে কিংবা তাহার পূর্বে হইয়াছিল। বেদেও ইহার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সুদূর অতীতে আর্যজাতি মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন সেই প্রাগ্বৈদিক যুগেও তাঁহারা সুসভ্য জাতি ছিলেন। কৃষি-কর্মাদি তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন এবং তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বর্তমান ছিল। যখন তাঁহাদের মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি, গুণ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁহারা আপনাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য প্রথম অবস্থায় এই শ্রেণীবিভাগের নিয়ম অত্যন্ত শিথিল ছিল। তখন শ্রেণী পরিবর্তন চলিত। তখনকার সামাজিক পার্থক্য এখনকার মতন বংশগত ছিল না বলিয়া তাহার মধ্যে অপরিবর্তনীয় কঠোর নিয়ম দেখা যাইত না। মানুষের কোন প্রকার কার্য বা বৃত্তি তখন বংশগত বা জন্মগত ছিল না। বেদ, উপনিষদ এবং হিন্দুদের প্রাচীন মহাকাব্য প্রভৃতিতে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ উপযুক্ত হইলে যোদ্ধার কার্যও করিতেন। আবার ক্ষত্রিয়গণও ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়াছেন এই প্রকার ঘটনার বহু উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের যে সমস্ত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছি, তাহাদের অধিকাংশই ক্ষত্রিয়দের অবদান—ব্রাহ্মণদের নহে। বিভিন্ন শ্রেণীর এই ব্যক্তিগণ অবাধে পরস্পর মেলামেশা করিতেন। যখনই কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত অথবা

ক্ষত্রিয় প্রকৃতির গুণ বা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন তখনই তিনি সেই গুণানুসারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইতেন। এমন অনেক ক্ষত্রিয়ের নাম আমরা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতে পাইয়া থাকি, যাঁহারা মহত্ত্ব ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের ফলে সমাজে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে, ভারতবর্ষে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতারগণের অধিক সংখ্যকই ক্ষত্রিয়; ব্রাহ্মণ বংশজাত অবতারগণের সংখ্যা অল্প।

জাতিভেদের উৎপত্তিসম্বন্ধে মহাভারতে অন্যপ্রকার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্বে ১৮৮-১৮৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, ভরদ্বাজমুনি মহর্ষি ভৃগুকে প্রশ্ন করিতেছেন: "যদি চারিজাতির বিভাগ শুধু বর্ণের পার্থক্য হইতেই উদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আবার নানা বর্ণের লোক দেখা যায় কেন? কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, উদ্বেগ, ক্ষুধা এবং ক্লান্তি সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে জাতিবিভাগের সার্থকতা কোথায়? স্থাবর (বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি), জঙ্গম (পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী) প্রভৃতির মধ্যেও অসংখ্য শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যেই বা জাতিবিভাগ কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে?[৫]

এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন: "জাতিবিভাগ বলিয়া

৫। ভরদ্বাজ উবাচ:
'চাতুর্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে।
সর্বেষাং খলু বর্ণনাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ।।
কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে।।

প্রকৃতপক্ষে কিছু নাই। ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন সকলেই ব্রাহ্মণ (সত্ত্ববৃত্তিসম্পন্ন) ছিলেন। পরে কর্মের পার্থক্যবশতঃ জাতির উৎপত্তি বা এই জাতিবিভাগ হইয়াছে। যে সকল দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ ভোগ বাসনার তৃপ্তিসাধনে নিরত হইলেন, যাঁহারা অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ ও নির্ভয়ে উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প, স্বধর্মত্যাগী ও যাহাদের দেহের চর্ম রক্তবর্ণ তাঁহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ গোজাতির সেবা অবলম্বন করিয়াছেন ও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, যাঁহাদের দেহবর্ণ পীত, স্বধর্মচ্যুত তাঁহারাই বৈশ্য উপাধি লাভ করিয়াছেন। যে সকল দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ হিংসাপরায়ণ, লোভী, মিথ্যাবাদী, সর্বপ্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম (মজুরগিরি) করে, অর্থাৎ যাহাদের কোন নির্দিষ্ট উপজীবিকা নাই, যাহারা শুচিহীন ও কৃষ্ণকায় তাহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল কর্মের পার্থক্য হইতেই জাতিভেদের উৎপত্তি।”[৬]

স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মা পিত্তং সশোণিতম্
তনুঃ ক্ষরতি সর্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভজ্যতে।
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চয়ঃ ।।’

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৮ অধ্যায় ৬-৯

৬। ভৃগুরুবাচ :

‘ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতঃ ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥

বৈদিকযুগে ভারতীয় আর্যগণ নিজেদের গাত্রবর্ণ ও অবলম্বিত কর্ম অনুসারে এই চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে প্রত্যেক মানুষের গুণ ও কর্ম অনুযায়ী এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নত অথবা অবনত হওয়ার এই উদার নীতি ক্রমশঃ বংশগত অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় ছয়শতাব্দী পূর্বেই এই প্রথার সূচনা হইয়াছিল। এই সময়ে ধর্মসংস্কারকরূপে ভগবান বুদ্ধের অভ্যুদয় হয়। তিনি এই জাতিভেদ ও সামাজিক ভেদনীতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধ পুরোহিতপ্রথা ও অনুদার অযৌক্তিক সামাজিক বিধিসকলের বিরুদ্ধে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহার ফলে বংশগত জাতিভেদ দ্বারা অপরের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয়ের কৃত্রিম প্রথা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। পূর্বে কথিত নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী এবং ক্ষত্রিয়বংশজাত কোন ব্যক্তি যোদ্ধার কার্য করিতে বাধ্য হইতেন। অবশ্য এই জাতিভেদপ্রথা প্রথমে প্রত্যেক প্রকার কার্যবিভাগের সম্পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। প্রাচীন মনীষী ও সমাজপতিগণ বংশগত গুণানুবৃত্তির তত্ত্ব (laws of heredity) এরূপ সুন্দররূপে বুঝিতেন যে, তাঁহারা বংশানুক্রমিক সংক্রমণের দ্বারা সর্বোচ্চ গুণগুলির বিকাশসাধনে সচেষ্ট ছিলেন। যাহা হউক বুদ্ধদেব হিন্দুদের সমাজকে আবার সেই পূর্বতন নমনীয় উদারভাবে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণবংশে

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥'

—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮৮ অধ্যায় ১০-১৪

জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেবের নিকট 'ব্রাহ্মণ'-এর মর্যাদা পাইত না। যে কোন বংশীয় কোন ব্যক্তির মধ্যে সংযম, পবিত্রতা, জ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখিলেই তিনি ঐ ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। যে ব্যক্তি শান্তস্বভাব, সংযত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, ভক্তিমান, সর্বজীবে দয়াশীল ও দিব্যজ্ঞান-সম্পন্ন তিনিই বুদ্ধদেবের নিকট ব্রাহ্মণের মর্যাদা লাভ করিতেন।[৭]
বুদ্ধদেবের প্রভাব প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে থাকার জন্য ঐ সময়ে ভারতবাসীরা বংশগত ও গোত্রগত জাতিভেদের কুপ্রথা ভুলিয়া গিয়াছিল এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় বিষয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিত।
প্রায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মে গ্লানির ফলে নানাপ্রকার বিকৃতি ও অবিচার দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই সুযোগে অনুদার মতাবলম্বী গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আবার বংশগত জাতিভেদপ্রথাকে সমাজে চালাইতে আরম্ভ করিলেন।[৮] ইহার পর মুসলমানেরা ভারতবর্ষ

৭। 'যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং।
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রুমি ব্রাহ্মণং ॥
ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো ॥'
যম্‌হি সচ্চং চ ধম্মো চ সো সুখী সো চ ব্রাহ্মণো ॥'
—ধম্মপদ, ২৬ অধ্যায়, ব্রাহ্মণবগ্‌গো ৯, ১১

যাঁহার কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা কৃত পাপ নাই, যিনি এই ত্রিবিধ স্থানে সংযত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিব।
জটা, গোত্র অথবা জাতি দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, কিন্তু যাঁহাতে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই সুখী এবং তিনিই ব্রাহ্মণ।

৮। 'জাতি' (caste) বা 'বর্ণ' বাস্তবিক ঋগ্বেদে ঠিক পাওয়া যায় না। তবে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের ভিতর শ্রেণীগত বৈষম্য লইয়া কলহের

আক্রমণ ও বিজয় করিল। প্রায় ছয় শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানেরা নানাপ্রকার বলপ্রয়োগ, নির্য্যাতন ইত্যাদি দ্বারা হিন্দুর সমাজসৌধকে ভাঙিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সেই কুপ্রচেষ্টা সফল হয়

ইঙ্গিত বেদে পাওয়া যায়। পণ্ডিত লুড়ুইগ্ (Ludwig) মনে করেন যে, সভ্যতার অরুণোদয় হইতেই সমাজের ভিতর জাতিবিভাগ ছিল। পণ্ডিত সীমার (Zimmer) কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে রাজী নন। তিনি বলেন—তাহা হইলে পুরাণ ও মহাভারতের যুগে, যেমন জাতি ও বর্ণ লইয়া শল্যরাজকে বর্ণ ভৎর্সনা করিতেছেন—এরূপ ব্রাত্যের প্রতি বিসদৃশ ব্যবহার প্রভৃতি কখনই থাকিত না। বেদ ও ব্রাহ্মণের যুগে বলিতে গেলে ক্ষত্রিয় রাজারাই একাধারে যোদ্ধা ও পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় রাজাদের কার্যাবলীও অনেকটা ঠিক এই একই রকমের ছিল।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, 'বিশ' অর্থে সাধারণ জনপদবাসীর মধ্য হইতে ক্ষত্রিয়েরা উৎপন্ন হইয়াছে। পরে যখন কৃষি ও পণ্যাদি ব্যাবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে বৈশ্যদের সহিত ক্ষত্রিয়দের ভেদ হইয়াছিল তখনই ক্ষত্রিয়েরা একটি পৃথক বর্ণ বলিয়া সমাজে পরিচিত হয়। রাশিয়ান পণ্ডিত ক্লুচেভোস্কি (Kluchevosky) বলেন প্রাচীন রাশিয়াতেও ঠিক এই ভাবেই বর্ণের বিকাশ হইয়াছিল। পারস্যে 'রথওষ্ট্র' (*Rathastra*)-এর উৎপত্তির ইতিহাসও অনুরূপ।

প্রাচীন কালে বৈশ্যদেরও 'আর্য' বলা হইত। শূদ্র ও বৈশ্যরা তখন কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই একত্রে কার্য করিত। পণ্ডিত সীমারও (Zimmer) 'শূদ্রার্যৌ' শব্দের দ্বারা সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কালে বৈশ্যদের মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্তন আসিয়াছিল। কৃষিকার্য ও পশুপালনরূপ কর্ম বৈশ্যদের পক্ষে ক্রমে নিষিদ্ধ হইল এবং তাহারা একমাত্র পণ্য ও ও ব্যাবসা-বাণিজ্য লইয়াই থাকিত। পরবর্তী কালে 'শ্রেষ্ঠী' পদবী সেই কথারই পরিচায়ক। তাহার পর ঠিক ৬ষ্ঠ হইতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত

নাই। বরং হিন্দুসমাজভুক্ত যেকোন ব্যক্তি মুসলমানধর্মে অনুরক্ত হওয়ার জন্যই স্বীয় সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। এই গোঁড়া সঙ্কীর্ণ নীতির জন্য হিন্দুসমাজ অনেক প্রতিভা-

সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা ও বেদজ্ঞগণ এই শ্রেষ্ঠীদের উপর আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন।

প্রাচীন ভারতে পুরোহিতশ্রেণীর উৎপত্তিও ক্ষত্রিয়জাতি হইতেই হইয়াছিল। দেবাপী ও বিশ্বামিত্রের উদাহরণ তাহার অন্যতম প্রমাণ। 'শূদ্র' শব্দও একমাত্র পুরুষসূক্ত ছাড়া ঋগ্বেদের আর কোথাও উল্লেখ নাই। প্রাচীন পারস্যজাতির ইতিহাসেও এই শূদ্রজাতির কোন উল্লেখ নাই। 'শূদ্র' শব্দ সর্বপ্রথম যজুর্বেদেই পাওয়া যায়। তাহার পর 'বর্ণ' শব্দে যদি গায়ের রঙের কথাটি উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে কৃষ্ণবর্ণ বলিতে কেবল শূদ্রই বুঝাইবে না, কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট শূদ্রেতর জাতির উদাহরণও পাওয়া যায়। যেমন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কণ্ব ঋষির উদাহরণ বেদে পাওয়া যায়। বৈদিক মন্ত্রে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ঋষির উল্লেখও আছে।

ঋগ্বেদের বহু স্থানে 'দাস' শব্দ আবার ভৃত্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দাস সেখানে ঠিক শূদ্র নয়। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, ঋগ্বৈদিক যুগেই দাসরা আবার সভ্যতার চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল। তাহাদের সময়ে অয়সপুরী নির্মাণের প্রচলন ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে (৫।৫।৪।৯; ১।১।৪।১২) দেখা যায়, শূদ্রদের সোমযজ্ঞে অধিকার দান করা হইয়াছে। মৈত্রিয়াণীসংহিতায় (৫।২।৭।১০) ও পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণে (৬।১।১১) আছে শূদ্রেরা অত্যন্ত ধনী ছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৫।৩।২।২) শূদ্রেরা যে রাজমন্ত্রীও ছিল তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। শূদ্রেরা তখন কৃষি ও ছোটখাট শিল্পকার্যাদিও করিত।

বেদে বর্ণ হিসাবে 'আর্যবর্ণ' এবং 'দাসবর্ণ' এই দুই শব্দের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে চারি জাতি হিসাবে চারিবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শালী নরনারীকে হারাইয়াছে। যাহারা প্রকাশ্যে মুসলমান-সমাজে বিবাহ করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদের বৈষয়িক উত্তরধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। কোন ক্রমেই সেই ব্যক্তিকে হিন্দুসমাজে আর স্থান দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন ভারতে মহাপ্রাণ

ঋগ্বেদে (৯।১১২।৩) ব্রাহ্মণ ঋষি বামদেবের (ঋষি শিশুর) উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। বামদেব ঋষি বলিতেছেন: "দেখ, আমি স্তোত্রকার, আমার পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরেব উপর যবভর্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতেছি॥" ঋক্‌সংহিতা ৯।১১২।১ মন্ত্রেও দেখা দেখা যায়, বলা হইয়াছে: "হে সোম, সকল ব্যক্তির কার্য এক প্রকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। আমাদিগেরও কার্য নানাবিধ। দেখ, তক্ষক (ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য লোকের রোগ প্রার্থনা করে, স্তোতা যজ্ঞ কর্তাকে চাহে।" ঋক্‌মন্ত্রের এই কথা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ঋগ্বৈদিক যুগেও বর্তমান ছিল। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণের অভিমত যে, জাতি বা বর্ণবিভাগ তখনও সমাজে ঠিক ঠিক হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম বা ব্যবসায়-মাত্রেরই বিভাগ ছিল। পরে এই ব্যবসায় ও কর্মকে উপলক্ষ্য করিয়াই জাতি ও বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ জাতিবিভাগহীন ঋগ্বৈদিক যুগেই কিন্তু আমরা শ্রেষ্ঠীদ্বয় মহাকূল ও মঘবনের উল্লেখ পাইয়া থাকি। বৈশ্যরা ক্ষত্রিয় রাজাদের হাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিত, কাজেই তাহারা যে যুদ্ধকার্যও করিত ইহাই বুঝা যাইতেছে।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় (২।৫।১০) দেখা যায়, রাজন্যবর্গ অন্যান্য বর্ণের উপর বেশ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছেন এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে ব্রাহ্মণেরাও ঐ ক্ষত্রিয় রাজাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন (অথর্ববেদ ৫।১৮।১৯; মৈত্রিয়াণীসংহিতা ৪।৩।৮; বাজসনেয়ীসংহিতা ২১।২১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। সাধারণ অধিবাসী ও অভিজাতবংশের মধ্যে আবার শত্রুতা ও বিরোধের উল্লেখও পাওয়া যায় (তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।২।১১।২; মৈত্রিয়াণীসংহিতা

আর্যঋষিদের অযোগ্য ও ধর্মান্ধ বংশধরগণ এই প্রকার অত্যাচারের দ্বারাই আপনাদের ক্ষমতার অপব্যয় করিয়াছে। মধ্যযুগের তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ এবং সমাজের নেতারা অপরিণামদর্শী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও প্রভুত্ব-লোভী ছিলেন। তাঁহারা সর্বদা সমাজের সমস্ত লোকের উপর নির্বিচারে আপনাদের প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিতেই

৩।৩।১০; কাঠকসংহিতা ২৯।৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এরূপ বিরোধিতা যে চলিত না তাহা নয় (অথর্ববেদ ৫।১৮-১৯; তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।২।১১।২; মৈত্রিয়াণীসংহিতা ২।৬।৫, ২।১।৯, কাঠকসংহিতা ২৪।৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের সময় দেখা যায়, রামায়ণে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে জৈন-হরিবংশে 'সুভৌমচরিতে' কিন্তু ইহার বিপরীত কথাই বলা হইয়াছে। পণ্ডিত পার্গিটার (Pargiter) মহাভারত হইতে আবার ভিন্ন একটি অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যুদ্ধের নমুনা অবশ্য পুরাণে ব্রাহ্মণ ভার্গববংশের পরশুরাম ও ক্ষত্রিয় হৈহয়-বংশের রাজা কার্তবীর্যার্জুনের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই সময়ে একদিকে পরশুধারী রাম ক্ষত্রিয়বংশ নির্মূল করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর ক্ষত্রিয়েরাও তাহার প্রতিরোধ করিতে উদ্যত। পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) ও সীমারের (Zimmer) মতে এই যুদ্ধ বৈদিক যুগের শেষভাগে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগেই হইয়াছিল! পুরাণে ব্রাহ্মণদের উপর পুরুরবা ও নহুষের অত্যাচারের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা আবার প্রায়ই ব্রাহ্মণদের স্ত্রী ও গাভী হরণ করিত, কেননা ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই 'ব্রহ্মজায়াস্তোত্র', ব্রহ্মগাভীস্তোত্র' ও 'শতরুদ্রীয়স্তোত্র' প্রভৃতি লিখিত হইয়াছিল। সমাজে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিবার পূর্বে এইরূপ শ্রেণীগত বড় বড় যুদ্ধ যে হইত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে পণ্ডিত সেনার্ট (Senart) এই যুদ্ধকে ঠিক শ্রেণীগত বলিতে চান না।

ব্যস্ত থাকিতেন। হিন্দুসমাজ যদি এই প্রকার সঙ্কীর্ণচেতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অপরিণামদর্শী নেতাদের দ্বারা মধ্য যুগে চালিত না হইত—যদি সমাজচ্যুতি ও বহিষ্কারের অনুদারনীতি সেই সময়ে সমাজের উপর প্রচলিত না থাকিত তাহা হইলে বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে আজ আর এত অন্তর্বিরোধ ও

তাহার পরই বৌদ্ধযুগ। এই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা প্রথম (শ্রেষ্ঠ) বর্ণ হিসাবে সমাজে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধই তাহার প্রমাণ। পণ্ডিত ফিক্ (R. Fick) বৌদ্ধসাহিত্য হইতে কতকগুলি কাহিনী তুলিয়া দেখাইয়াছেন যে, রাজা অরিন্দম এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পুত্রকে নীচ জাতি হইতে উৎপন্ন ('হীনজাচ্চ') বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; অথবা কোশলরাজ যখন তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত কথা কহিতেন, তখন উভয়ের ব্যবধানে একটি পর্দা টাঙ্গাইয়া রাখিতেন।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে দেখা যায়, সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে 'অনার্য' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। নিঘণ্টু ও নিরুক্তকার যাস্কই প্রথমে কৈকট (অনেক পণ্ডিতের মতে 'কীকটা' অর্থে মগধদেশ; সায়ন কীকটা অর্থ আবার 'নাস্তিক' করিয়াছেন) রাজ্যের প্রসঙ্গে 'অনার্য' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন; যেমন—"কীকটানামো দেশোঽনার্যনিবাসঃ।" পণ্ডিত সীমার (Zimmer) ও গেল্ড্নার (Geldner) এই অনার্য শব্দকেই *Non-Aryan* বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) বলিয়াছেন যে, ঐ অনার্য শব্দ বিরুদ্ধধর্মসেবী বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত। ইহাও একেবারে অসম্ভব নয়, কেননা ব্রাহ্মণেরা তখন বিরুদ্ধধর্মসেবী মগধবাসীদের 'আর্যপথ' বিচ্যুত 'অনার্য' বলিয়াই হিন্দুসমাজ হইতে বর্জন করিয়াছেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, নিরুক্তকার যাস্কের 'অনার্য' শব্দ কিন্তু ফরাসী প্রতিশব্দ *Non-Aryan* বা জার্মাণ *Nicht-Arier* মোটেই নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত

অনৈক্যের ভাব সৃষ্টি হইত না এবং তাহা হইলে হিন্দুরা আজ অবশ্যই জগতের অন্যতম শক্তিশালী পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হইতে পারিত। তাহার পর চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং বহু সম্প্রদায়, গোত্র ও মণ্ডলী প্রভৃতিতে বহুধা ছিন্নভিন্ন ত্রিশ কোটি

সাহিত্যে দেখা যায় 'আর্য' শব্দ কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

পণ্ডিত ডোল্লিঙ্গার (Dollinger) প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঐ শ্রেণীগত সংঘর্ষ সর্বত্র ধর্মের জন্যই হইত। ঐতিহাসিক প্রমাণও তাই। রাজনৈতিক দিক দিয়া উন্নত গ্রীস ও রোমের মধ্যেও এই শ্রেণীগত দ্বন্দ্বের প্রমাণ স্পষ্ট পাওযা যায়।

মগধে শিশুনাগবংশীয় ক্ষত্রিয়দের পরই নন্দবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। নন্দরা ক্ষত্রিয়ের কৌলিন্য লাভ করিতে পারে নাই। মহাপদ্মনন্দকেও দেখা যায়, তিনি ক্ষত্রিয়দের প্রায় নির্মূল করিয়াছিলেন।

পুরাণ ও ইতিহাসে পাওয়া যায়, ক্ষত্রিয়বিধ্বংসী মহাপদ্মনন্দের মাতৃস্থানীয়া একজন শূদ্রাণী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তও মেসিডোনিয়ার সম্রাট আলেজাণ্ডারের নিকট বলিয়াছিলেন যে, তিনি এক শূদ্রাণী নাপিতানীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণে আবার পাওয়া যায়, মগধরাজ বিশ্বস্ফানি (Visvasphani) (ইনি আবার ভাগবতে বিস্ফূরজি (Visphurji) এবং বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বস্ফটি (Visvasphati) নামে পরিচিত) সমস্ত সামন্ত রাজাদের পরাজিত করিয়া নূতন এক কৈবর্ত, পঞ্চক ও পুলিন্দ প্রভৃতি রাজবংশের স্থাপনা করেন। বিশ্বস্ফানি সম্বন্ধে পার্গিটার সাহেব বলেন—তিনি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর লোক। পণ্ডিত শ্যামা শাস্ত্রী অনুমান করেন, তিনি চন্দ্রগুপ্তেরই ন্যায় শূদ্রবংশজাত কোন অসভ্য সামন্ত রাজা ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত জয়শোয়াল বলেন ঐ বিশ্বস্ফানি শক রাজার দ্বারা নিযুক্ত বারাণসীর শাসনকর্তা 'বানস্ফরা' (Vanasphora) ছাড়া আর কেহই নন।

হিন্দুদের মধ্যে যদি আজ একতা থাকিত তাহা হইলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বও ভারতবর্ষে থাকা সম্ভব হইত না। স্যার মনিয়ার উইলিয়মস্ যথার্থই বলিয়াছিলেন ঃ

"(হিন্দুদের) এই সমস্ত জাতিবিভাগ ও বিভিন্ন বণিক্‌মণ্ডলীর মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়াই ইহাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য অসম্ভব

তাহার পর মৌর্যযুগে দেখি শূদ্র রাজাদের প্রাধান্য। বেদেও একজন শূদ্র ও একজন পরসব রাজার উল্লেখ পাই। উত্তর ভারতে বৃষল নামে শূদ্র রাজার উদাহরণও উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিত জয়শোয়াল বলিয়াছেন, বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদেরই আবার 'শূদ্র' বলিয়া অভিহিত করিতেন। সম্রাট অশোকের যুগে কিন্তু সমাজের দিক দিয়া অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার বিজয়স্তম্ভ প্রভৃতিতে খোদিত প্রস্তরলিপিমালা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়—শাসন ও শাস্তিদান ব্যাপারে সকল শ্রেণীর প্রজাকেই তিনি সমান অধিকার দান করিয়াছিলেন। এদিক দিয়া বর্ণবিভাগনীতি সম্রাট অশোক একরূপ অগ্রাহ্য করিয়া আমলা তন্ত্র (bureaucracy) সমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। অনেক পণ্ডিতের অভিমতও এই যে, এই কারণেই বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিদ্রোহ এই সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সময় হইতেই বলিতে গেলে ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রথম সমস্ত জাতি ও বর্ণের উপর একাধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময়েই নির্দিষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মণেরা সৈনাধ্যক্ষ এবং রাজাও হইতে পারিবেন। পণ্ডিত জয়শোয়াল বলেন, এই পুষ্যমিত্রের সময়েই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিবার জন্য 'মনুসংহিতা' রচিত হয়। পণ্ডিত জলিও (Jolly) উল্লেখ করিয়াছেন 'নারদসংহিতায় ভার্গব (ভৃগু) কর্তৃক মনুসংহিতার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচিত হইয়াছিল। তাহার পর গৌতমীয়, বৌধায়ন ও আপস্তম্ভ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া কুল্লূকভট্ট ও পণ্ডিত রঘুনন্দনের সময় পর্যন্ত

হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনায় এই অনৈক্য আমাদিগের (ইংরাজ-জাতির) সহায়ক হইয়াছে।”

কিন্তু অবস্থা এখন ক্রমশঃই পরিবর্তিত হইতেছে। এখনকার ভারতবর্ষীয় সমাজের সহিত ইহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার পুরাতন সমাজের কোনই মিল নাই। ইংরাজী শিক্ষা ও জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন ও উন্নতির ফলে ভারতবাসীদের আগেকার ভ্রান্ত সংস্কার দূর হইতেছে। নূতন দৃষ্টিতে ভারতবাসী এখন জগৎ ও মানবের জীবনকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমাজসংস্কারের জন্য এ যুগের আহ্বানবাণী আজ সমগ্র ভারতকে শুনিতে হইবে। সমাজের দেহে যে সব দোষ, ত্রুটি, ব্যাধি-অপূর্ণতা রহিয়াছে সেদিকে ভারতবাসী হিন্দুদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। শিক্ষিত হিন্দুগণ

পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়—ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃই শূদ্রজাতির উপর প্রভুত্ব দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু তাহা হইলেও ধর্মসূত্রের সময় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রদের সম্পর্ক কিন্তু তত কঠিন বা বিরুদ্ধ ছিল না বলা যায়; কেননা বৌধায়নধর্মসূত্রে (১৮।৮) ব্রাহ্মণ ও শূদ্রজাতিদের মধ্যে বিবাহবিধি বেশ সমর্থিত হইয়াছে। আপস্তম্ভ বলিয়াছেন আর্যদের তত্ত্বাবধানে উচ্চজাতির প্রভুদের জন্য শূদ্ররা রন্ধনও করিতে পারে। বশিষ্ঠ কিন্তু এসকল প্রথা একরূপ রহিত করিয়াই দেন। শূদ্রেরা বেদপাঠ করিতে পারিবে না একথাও বশিষ্ঠ অনুমোদন করেন। পরিশেষে ভারতে মুসলমান অভিযানের পর মহারাষ্ট্রে পণ্ডিত নাগভট্ট এবং বাঙ্গালায় পণ্ডিত রঘুনন্দনই চারিবর্ণের স্থানে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ ও শূদ্র দুই বর্ণের বিভাগকে একরূপ প্রধান করিয়া যান—(ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এ. এম., পি.-এইচ. ডি. মহাশয়ের লিখিত *Origin and Development of Indian Social Polity* নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে।—প্রকাশক)

এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন এই সমস্ত অনুদার অচল ভ্রান্ত প্রথাকে যদি চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে সমস্ত হিন্দুজাতি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কুসংস্কার ও ভেদনীতির লৌহপ্রাচীরের দ্বারা এক সম্প্রদায় হইতে অপর সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন হইয়া এইরূপ গণ্ডীবদ্ধ অচলায়তনে ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আর থাকিতে চান না। যাহাতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি বর্ণ, জাতি, গোত্র বা সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আর আবদ্ধ না থাকিয়া নিজেদের ভারতীয় আর্যজাতির এক অখণ্ড পরিবারের সমভাবাপন্ন ও সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট একজন বলিয়া মনে করিতে পারে এই প্রকার ভাবেই তাঁহারা সকল নরনারীকে একত্রিত করিবার জন্য অভিলাষী। সমাজের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় একটি ভিত্তিতে স্থাপন করাই এক্ষণে সংস্কারপন্থী হিন্দুদের লক্ষ্য। এই সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু সমাজকে সমস্ত সঙ্কীর্ণভাব হইতে মুক্ত করিয়া সাফল্যলাভ করিতে এখনও দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ।

হিন্দুসমাজের সৌধ-আয়তন এক্ষণে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য তাহার চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতার ভাব দেখা যাইতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল যখন হিন্দুসমাজের লোকেরা নিজ নিজ উচ্চবংশের জন্য গর্ববোধ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে বিদেশী শাসননীতির ফলে জীবিকা-নির্বাহের দারুণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় অন্নবস্ত্র সংস্থানেই সকল ব্যক্তির মনকে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীদের অবস্থা এখন অতিশয় দরিদ্র। প্রত্যেকে শুধু তাহার আহার-বস্ত্র সংস্থান ও সামান্য একটু আশ্রয়ে মাথা গুঁজিয়া থাকিবার চিন্তা ও চেষ্টাতেই উদ্বিগ্ন। আর্থিক ঐশ্বর্যের উপরেই এক্ষণে তাহাদের সামাজিক মান-মর্যাদা নির্ভর করিতেছে। দারিদ্র্যের জন্য এক্ষণে

সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া নিজেদের বংশগত কর্তব্যবিধি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতীয় লোকের বাড়ীতে পাচক, ভৃত্য অথবা অন্য কোন নিকৃষ্ট কর্মদ্বারা নিজেদের ভরণপোষণ করিতে বাধ্য হইতেছে। কি করিয়া কোন গতিকে বাঁচিয়া থাকিতে পারা যায় ইহাই এক্ষণে ভারতবাসীদের একমাত্র প্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর শূদ্র ধনী হইলে দারিদ্র্যবশতঃ ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হইয়া তাহাকেও নমস্কার করিতেছে। বিশ বৎসর পূর্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লোকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইত। *এক্ষণে কাঞ্চন-কৌলিন্যের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে* নিজের একজন বন্ধু মাত্র বলিয়াই মনে করে। সমাজের পূর্বতন কঠোর নিয়ম থাকার জন্য লোকে সকল নেতাদের মানিতে বাধ্য হইত, এক্ষণে সে সমস্ত নিয়মের বন্ধন শিথিল হইতেছে। এখন প্রত্যেকেই মনে করিতেছে সে ব্যক্তি স্বাধীন এবং সে যাহা খুশি তাহা করিতে পারে।

বর্তমানে হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ পরিবর্তনের স্রোতের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বিদেশী ও সহানুভূতিহীন স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তি লোভ ও স্বার্থ বশীভূত হইয়া ইহার উচ্চকর্মচারীদের সাহায্যে হিন্দুদের সামাজিক অগ্রগতিকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতেছে। তাহাদের দীর্ঘকাল শোষণের ফলে হিন্দুজাতির জীবনশোণিত ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে। একদিন যে সমস্ত বণিক্‌মণ্ডলী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিন্দুসমাজের উপর বিপুল আধিপত্য বিস্তার করিত আজ তাহাদের কোন কথাই বলিবার অধিকার নাই। ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ইংরাজ বণিক্‌গণ এক্ষণে ভারতের সমস্ত ব্যবসায় কেন্দ্রকে হস্তগত করিয়াছে। তাহার ফলে ভারতীয় বণিক্ ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদকদের সেখানে কোনও স্থান নাই। ইহাতে ভারতের জাতীয় শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ায় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। আজ

ভারতে শুধু হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি কর্মহীন বেকার অবস্থায় বসিয়া আছে। এক্ষণে কোন ভারতীয় শিল্পই বিদেশী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পায় না। ইংরাজের শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য ভারতবর্ষকে একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করা—আর তাহাদের সেই চেষ্টা সফলও হইয়াছে। এক্ষণে শ্রমিকরা নিজেদের পরিবার পালনের জন্য বাধ্য হইয়া যে সব কাজ করিতেছে তাহার মজুরীর জন্য দৈনিক দুই হইতে পাঁচ সেণ্ট (প্রায় দুই আনা) মাত্র পাইয়া থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতার তথাকথিত প্রতিভূ এই ভীষণ ধ্বংসকারী শক্তির অধীনে থাকিয়া আমরা আমাদের সমাজের উন্নতির প্রত্যাশা কেমন করিয়া করিতে পারি? ধর্মান্ধতায় অভিভূত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে খৃষ্টীয় ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় খৃষ্টান মিশনারীরা বর্তমানে ভারতে প্রচলিত অবনতিকর ও অত্যাচারপূর্ণ বিদেশী শাসনপ্রণালীর কোনই দোষ দেখিতে পান না। বরং তাঁহারা হিন্দুধর্মের ভিতরেই হিন্দুদের বর্তমান অবনতির মূল খুঁজিয়া বেড়ান। হিন্দুসমাজের পবিত্র পরিধিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কোন অপচেষ্টা করিতে মিশনারীরা ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—হিন্দুদের অপেক্ষা কোন উচ্চতর সামাজিক আদর্শ কি তাঁহারা আমাদের দিতে পারেন? ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচলিত সামাজিক নিয়মনীতিও সম্পূর্ণ নির্দোষ বা কলঙ্কমুক্ত নয়। এমন কি, বর্তমানে হিন্দুদের বিকৃত জাতিভেদযুক্ত সমাজ অপেক্ষাও ইহা নিকৃষ্টই বলা যায়। হিন্দুসমাজ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিবার অপরাধে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হিন্দুরা সারা জীবন কী মনস্তাপ ভোগ করে, তাহা এই সকল খৃষ্টান মিশনারীরা জানেই না। খৃষ্টানদের নিজেদের মধ্যেই কি কোন সুদৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সাম্যভাব বলিয়া কিছু আছে? আমেরিকার কৃষ্ণকায় নিগ্রো খৃষ্টানরা কি শ্বেতকায় খৃষ্টানদের

সমান মর্যাদা ও অধিকার পাইয়া থাকে ?—না, কখনই তাহারা পায় না। খৃষ্টানরা অগ্রে নিজেদের অন্তর হইতে জাতিবিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ ও অন্যসব ভেদনীতি দূর করুন। তাঁহাদের এই চেষ্টা কি কৃতকার্য হইয়াছে ? কখনই না। তাহা হইলে হিন্দুরা আজ যে সব জটিল সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে, তাহা কী করিয়া খৃষ্টান মিশনারীরা সমাধান করিতে পারেন ? ভারতবর্ষে আজ সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি খৃষ্টান ধর্ম দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব ? না, খৃষ্টান ধর্ম এ বিষয়ে হিন্দুদের সহায়ক হইতে পারে না। খৃষ্টানরা কেবল নষ্ট করিতেই জানেন, কোনও স্থানে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে কোন কিছু গঠনমূলক কার্য করিবার মতন শক্তি ও বুদ্ধি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা হয়তো এই বিষয়ে নিজেদের যাজকমণ্ডলী পরিচালিত নিয়মতন্ত্রকেই কেবল চালাইতে থাকিবেন, কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকর হইবে, কোনও কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের পুরোহিতপ্রথা হইতে ব্রাহ্মণ্যযুগে ভারতবর্ষ যথেষ্ট দুর্গতিই ভোগ করিয়াছে, তাহারা আর নূতন করিয়া খৃষ্টান যাজকদের প্রবর্তিত দুর্গতি ভোগ করিতে চাহে না।

আজিকার দিনে হিন্দু ভারতবাসী চায় সমাজের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন। মুসলমানদিগের ন্যায় খৃষ্টানরাও হিন্দুসমাজরূপ সমুদ্রে অকল্যাণকর ভাবরাশি ঢালিয়া দেওয়ায় তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এখন সেখানে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার কার্যের তরঙ্গ উঠিতেছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের আন্দোলনের ফলে এক্ষণে আধুনিক হিন্দুদের সমাজে পরিবর্তনশীলতায় প্রচণ্ড ঝড় আবার দেখা দিয়াছে। বর্তমানে এমন এক অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে যে, পাশ্চাত্য জাতিদের যাহা কিছু গ্রহণীয় ও হিতকর সেই সমস্তকে হিন্দুদের নিজস্ব করিয়া ফেলিতে হইবে এবং নিজেদের উদার ও

বিশ্বজনীন ভাবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সমাজকে আবার গড়িতে হইবে। পাশ্চাত্ত্যের পররাষ্ট্রগ্রাস ও বাণিজ্যিক প্রসারকে প্রতিরোধ করিবার জন্য হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন এমনভাবে করা চাই যাহাতে তাহার সামাজিক আদর্শ পূর্বাপেক্ষা আরও উদার ও সর্বজনগ্রাহী হইতে পারে। বেদান্তের সর্বমতসমঞ্জসা ও ঐক্যস্থাপনকারী নীতির মধ্যেই সেই আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাইবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল যে কোন জাতিই হউক না কেন, মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব নিহিত রহিয়াছে—জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বেদান্ত এই আদর্শই শিক্ষা দেয়। ইহাই হিন্দুর বর্তমান সামাজিক দোষ, ত্রুটি ও অন্য সমস্ত অহিতকে দূর করিবে ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুলির একতার ভিত্তি বেদান্তের এই সার্বভৌমিক নীতির দ্বারাই সুদৃঢ় হইবে। তাহার ফলেই সমগ্র জগতের সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে হিন্দুজাতি আপনার সভ্যতা বিস্তার করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইবে এবং পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ ভারতের রাজনৈতিক ধারা ॥

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহা সুবিদিত যে---অন্ততঃ পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বেও ভারতবর্ষীয় হিন্দুদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর এক মহান্ সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। এই ঋগ্বেদে ও বৈদিকযুগে রচিত অন্যান্য অনেক পুস্তকেও হিন্দুসভ্যতার কথা বর্ণিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রাচীন রচনাবলী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রাগৈতিহাসিক অতীতকাল হইতেই ভারতবর্ষীয় আর্যগণ দেহের বর্ণ, চারিত্রিক গুণ ও কর্মবৃত্তি অনুসারে আপনাদের সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন।[১] এই বিভাগ অনুযায়ী ব্রাহ্মণগণের উপর জ্ঞানের

১। এখানে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রামায়ণের যুগে চারিবর্ণের বিভাগ বেশ সুস্পষ্টই দেখা যায়। যেমন উত্তরকাণ্ডের ৭৪-তম সর্গে বলা হইয়াছে ঃ

ত্রেতাযুগে চ বর্তন্তে ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চ যে।
তপোঽতপ্যন্ত তে সর্বে শুশ্রূষামপরে জনাঃ ॥১৯
স্বধর্মঃ পরমস্তেষাং বৈশ্যশূদ্রং তদাগমৎ।
পূজাং চ সর্ববর্ণানাং শূদ্রাশ্চক্রুর্বিশেষতঃ ॥'২০

উহার উত্তরকাণ্ডের ৯৬-তম সর্গে পুনরায় দেখা যায় ঃ

'সর্ব এব সমাজগ্মুর্মহাত্মনঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়া যে চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ ॥৭
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।'৮

চর্চা, বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন ও যজনযাজনাদি কর্ম করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল। শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, রাজ্যশাসন, অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের নিরাপত্তা, শান্তি ও হিতসাধনে যাঁহারা আপনাদিগের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করিতেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকার্য ও অন্যান্য অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণই বৈশ্য নামে অভিহিত হইতেন এবং যাহারা অপরের দাসত্ব করিত তাহারাই শূদ্র।

বৈদিক রচনাবলী হইতে জানিতে পারা যায় সেই প্রাচীন যুগেও আর্যগণ লাঙ্গল দিয়া জমি চাষ করিতেন। জমির চাষের জন্য বলদ ও অশ্বের ব্যবহার ও জল সেচের জন্য খাল কাটিবার পদ্ধতি তাঁহারা জানিতেন। বিবিধ প্রকার শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য সুবর্ণ ধাতুনির্মিত নির্ধারিত মূল্যের মুদ্রার প্রচলন প্রভৃতির কথা ঋগ্বেদে উল্লিখিত আছে। এইসমস্ত বিষয় ব্যতীত আর্যগণ যে ভারতের অসভ্য অনার্য আদিম অধিবাসিগণের সহিত প্রায়ই যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহারও বিবরণ বৈদিক যুগের সকল গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে যেমন আমেরিকার নানাস্থানে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের (Red Indians) দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি ভারতের কোন কোন অংশে বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে এই সকল অনার্য জাতিদের বংশধরগণ এখনও বাস করিয়া থাকে। এই এই সকল শত্রুজাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য "আর্যদের যোদ্ধারা শুধু যে বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন এমন নয়, তাঁহারা স্কন্ধদেশ রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার দুর্ভেদ্য আবরণ এবং সম্ভবতঃ ঢালও ব্যবহার করিতেন। যুদ্ধকালে বর্শা, খড়্গ, পরশু, তীক্ষ্ণধার তরবারি এবং ধনুর্বাণও তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশে যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হইবার চারিসহস্র বৎসর পূর্বেও

ভারতীয় আর্যগণ এই সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিতে জানিতেন। রণভেরী বাজাইয়া সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রিত করা হইত। শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত সৈন্যদিগকে পতাকা দ্বারা পরিচালনা করা হইত। যুদ্ধের জন্য অশ্ব ও রথের ব্যবহার সুবিদিত ছিল। পালিত হস্তীসমূহও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত।[২]

হিন্দুগণ লৌহ, স্বর্ণ এবং অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার জানিতেন, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বহু উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১৪০ সূক্ত ১০ম মন্ত্রে, দ্বিতীয় মণ্ডল ৩৯ সূক্ত ৪র্থ মন্ত্রে, ৪র্থ মণ্ডল ৫৩ সূক্ত ২য় মন্ত্রে এবং অন্যান্য বহুস্থানে আর্যগণের বর্ম ব্যবহারের কথা বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডল ৫২ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে এবং উক্ত মণ্ডলের ৫৭ সূক্ত ২য় মন্ত্রে কবচ ও পরশুর কথা উল্লেখ আছে; উহাদের সংস্কৃত নাম যথাক্রমে 'রিষ্টি' ও 'বাসি'। ঐ ঋগ্বেদেরই ৬ষ্ঠ মণ্ডল ২৭ সূক্ত ৬ষ্ঠ মন্ত্রে তিন সহস্র বর্মপরিহিত যোদ্ধার ও ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৪৭ সূক্ত ১০ম মন্ত্রে তীক্ষ্ণধার অসির কথা দেখিতে পাওয়া যায়। তীরের ফলকসমূহ যে লৌহনির্মিত ছিল তাহা ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৭৫ সূক্ত ১৫শ মন্ত্রে বর্ণিত আছে; যেমন দেখা যায়ঃ "আমরা লৌহনির্মিত বিষাক্ত তীরসমূহের অতিশয় প্রশংসা করি।" পুনরায় পরবর্তী ৮৬ সূক্ত প্রথম মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাইঃ "যুদ্ধের প্রারম্ভে বর্মপরিহিত যোদ্ধৃবৃন্দ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রণক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হয় তখন তাহাদের মেঘের ন্যায় দেখায়।"

অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকার জন্যই প্রাচীন ভারতের আর্যগণ তাঁহাদের নববিজিত দেশকে নিজেরাই রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন।

২। Sir R. C. Dutta: *Civilization in Anciant India*, Vol. I, p. 48.

তাঁহারা কৃষিকার্যের জন্য জমির আয়তনকে ক্রমে বিস্তৃত করিতেন এবং নূতন নূতন আরও অনেক নগর ও গ্রাম স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহই বিজয়ী আর্যদিগকে তাঁহাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সৈন্যবিভাগ গঠনের জন্য বাধ্য করিয়াছিল। এই ভাবেই হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতার সামরিক ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি এবং প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। আর্যজাতিগণ তাঁহাদের অধিকৃত দেশকে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য, নগর ও মহানগরে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজ্যের প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসনের সর্ববিধ অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করিত। প্রত্যেক রাজ্য বা প্রদেশ যাঁহার অধীনে থাকিত, তিনি 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই রাজাগণ কেহ কাহারও অধীন ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব-ভাব ছিল। তবে কোন কোন সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষভাবও প্রকাশিত হইত। ভারতবর্ষের সর্বত্র রাশিয়ার সম্রাটের (Tzar) ন্যায় কখনও একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না বটে কিন্তু সময়ে সময়ে সেখানেও কোন কোন শক্তিশালী নৃপতি ও সম্রাটের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইঁহাদের নিকট অন্যান্য রাজারা, সর্দারগণ ও জমিদারেরা অধীনতা স্বীকার করিতেন ও কর দিতেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁহাদের স্বাধীনতা কখন কাড়িয়া লওয়া হইত না। এই সমস্ত অধীন রাজাগণ মৈত্রীবন্ধনে ও সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় রাজনৈতিক দিক দিয়াও পরস্পর সহযোগিতা করিতেন। তাঁহারা সম্রাটের অধীনে কোন কোন এক রাজ্যের নামমাত্র শাসকের ন্যায় হীন অবস্থায় থাকিতেন না। ইউরোপে এক সময়ে যেমন ফিউডাল আইন অনুযায়ী (Feudal law) ব্যারণ জমিদারেরা রাজার অধীন হইয়া অবনত অবস্থায় তাঁহার যে কোন

আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য থাকিতেন, ভারতবর্ষে সম্রাটের নিকট এই নৃপতিগণকে সেইরূপ হীনতা স্বীকার করিতে হয় নাই। এই সব রাজাদের মধ্যে বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধও ছিল নামমাত্র। সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইত।

বৈদিক যুগে এইরূপ অনেক সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর কথা শোনা যায়। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র অযোধ্যার মহারাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি লঙ্কা (সিংহল) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতে ১৪০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের সমকালীন হিন্দুদের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ (অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র), পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেঞ্জয় প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সকল সম্রাটের অধীনে অনেক রাজা ছিলেন। তাঁহারা যথানিয়মে সম্রাটদের নিকট রাজকর দিতেন। কিন্তু সম্রাটদের সহিত তাঁহাদের এই সম্বন্ধ সামান্য কারণে ছিন্ন হইয়া যাইত এবং তাঁহারা অধীনতার পরিবর্তে সেই সময়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেন।

যখন গ্রীক সম্রাট মহাবীর আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great) ৩২৬ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাহার কিছুকাল পরে গঙ্গাতীরবর্তী পাটলীপুত্র মহানগরে (এক্ষণে পাটনা) চন্দ্রগুপ্ত নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার অভ্যুদয় হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৬০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে অশোক সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টানধর্মের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম পৃষ্ঠপোষক সম্রাট কন্‌ষ্ট্যানটাইনের ন্যায় সম্রাট অশোকও বৌদ্ধধর্মের সর্বপ্রথম ও প্রধান

পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম ভারতের রাজধর্ম হওয়ার ফলে সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে তাহা বিপুলভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সম্রাট অশোক সুদূর সাইবেরিয়া হইতে সিংহল পর্যন্ত এবং চীন দেশ হইতে মিশর পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সমগ্র এশিয়ার অধিকাংশ, ইউরোপ ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে বৌদ্ধ-ধর্ম বিপুলভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। অশোকের জীবিতাবস্থায় লিখিত একটি অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, সিরিয়ার রাজা য়্যান্টিওকাস (Antiochus), সাইরিনরাজ মেগাস্ (Magus), মিশররাজ টোলিমেয়স (Ptolemaos), ম্যাসিডনরাজ য়্যন্টিগোনাস (Antigonus) ও এপিরাসরাজ আলেকজাণ্ডার (Alexander) এই পাঁচজন রাজার সহিত তিনি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল স্থানে ও সুদূর আলেকজেন্দ্রিয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসী প্রচারকগণকে প্রেরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার কেবল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত আক্রমণ করিয়া কয়েকটি পার্বত্যজাতিকেই যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত চন্দ্রগুপ্তের শৌর্যবীর্য ও পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না—সসৈন্যে (৩২৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে) ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গ্রীসে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের পরবর্তী গ্রীকরাজা সেলুকাস্ আপনার দূত মেগাস্থিনীস্‌কে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় পাঠাইয়াছিলেন। মেগাস্থিনীস কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনীসের লিখিত বিবরণ পাঠে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। বিদেশীয়দের লিখিত ভারতের সেই

সময়কার বিবরণের মধ্যে মেগাস্থিনীসের লিখিত বিবরণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য। মেগাস্থিনীস সেই সময়ে প্রচলিত ভারতের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা অতি নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ঃ

"যে সকল রাজকর্মচারীর প্রতি রাজধানীর শাসনকার্য ভার ছিল তাঁহারা ছয়ভাগে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক বিভাগে আবার পাঁচ জন করিয়া কর্মচারী ছিলেন। প্রথম বিভাগের কর্মচারিগণ শ্রম-শিল্পের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় বিভাগের কর্মচারিগণ বিদেশীয়দের সম্বন্ধে দেখাশোনা করিতেন। ইঁহারা বৈদেশিকদের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিতেন এবং তাহাদের চালচলন ও গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন। এই বিদেশীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় তাহাদের যাত্রাপথের সর্ববিধ নিরাপত্তা ও সুবিধার বন্দোবস্ত ঐ সকল কর্মচারীই করিতেন। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাহার সমস্ত জিনিষপত্র মৃত-ব্যক্তির দেশে তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইত। কেহ অসুস্থ বা পীড়িত হইয়া পড়িলে তাহার সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার কবরের ব্যবস্থা করা হইত। তৃতীয় বিভাগের কর্মচারিগণ রাজ্যের প্রজাদের কখন এবং কিরূপে জন্ম ও মৃত্যু হইত সেই সকলের বিবরণ রাখিতেন। শুধু রাজস্ব আদায়ই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর প্রজাদের জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা কি ভাবে হ্রাস ও বৃদ্ধি হইতেছে দেশের শাসন-বিভাগ সে সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধানের ভার চতুর্থ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। ইঁহারা পণ্য-দ্রব্যের ওজন, মাপ ও পরিমাণ প্রভৃতির উপর লক্ষ্য রাখিতেন। যাহাতে প্রত্যেক ঋতুতে উৎপন্ন সকল প্রকার শস্য নির্দিষ্ট সময়ে সরকারী বিজ্ঞাপন অনুযায়ী বিক্রীত হইতে পারে, এবিষয়েও তাঁহারা

দৃষ্টি রাখিতেন। দ্বিগুণ রাজকর না দিলে আবার কোনও ব্যবসায়ী একাধিক পণ্যের ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিত না। পঞ্চম বিভাগ শিল্পজাত পণ্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সরকারী বিজ্ঞাপনের সাহায্যে শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হইত। নূতন ও পুরাতন পণ্যদ্রব্য পৃথক পৃথক রাখিয়া বিক্রয় করা হইত। একসঙ্গে নূতন ও পুরাতন পণ্য মিশাইলে ব্যবসায়ীকে জরিমানা দিতে হইত। ষষ্ঠ বিভাগ পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের দশমাংশ রাজকরস্বরূপে আদায় করিতেন।

"সমরবিভাগের কর্মচারিগণও ছয়শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। ইঁহাদেরও প্রত্যেক শ্রেণীতে পাঁচজন করিয়া কর্মচারী কাজ করিতেন। প্রথম বিভাগের কর্মচারিগণ রণতরী-বিভাগের অধ্যক্ষের সহকারীর কার্য করিতেন। দ্বিতীয় বিভাগকে সৈন্যদিগের জন্য রসদ ও যুদ্ধে নিযুক্ত পশুদিগের জন্য খাদ্য এবং যুদ্ধের উপকরণ লইয়া যাইবার জন্য বলদের গাড়ীসমূহ দেখাশোনা করিতে হইত। তৃতীয় শ্রেণী পদাতিক সৈন্যদের, চতুর্থদল অশ্বগণের, পঞ্চমদল রথসমূহের এবং ষষ্ঠদল যুদ্ধ-হস্তীদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন।"

"যুদ্ধ ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিগণ ব্যতীত আরও একদল রাজ-কর্মচারী সে সময় নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা কৃষি, জলসেচ, বনবিভাগ এবং জনপদ সমষ্টি গঠিত জিলাগুলির শাসন প্রভৃতি যাবতীয় কার্যের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করিতেন। মিশরের ন্যায় এই সকল কর্মচারিদের কয়েকজন নদী, খাল প্রভৃতি জলপথের, কয়েকজন কর্মচারী আবার জমির আয়তন পরিমাপের তত্ত্বাবধান করিতেন। যাহাতে নদীর জলরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্য সমস্ত খালে যাইয়া প্রজাগণের জলের অভাব সমভাবে দূর করিতে পারে সেদিকেও ইহাঁরা দৃষ্টি রাখিতেন। এই সকল কর্মচারী আবার শিকারিগণের কার্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগের কর্মানুসারে

পুরস্কার বা দণ্ড বিধান করিতেন। রাজস্ব আদায়, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্মকার, খনিজীবী প্রভৃতি ভূমিসংক্রান্ত বৃত্তিধারীদের কার্যসমূহের তত্ত্বাবধানও ইহাঁরা করিতেন।"

"রাজপথ নির্মাণ করিয়া শাখাপথ ও পথের দূরত্ব জ্ঞাপনের জন্য তাঁহারা প্রত্যেক দশ ষ্টেডিয়াম্ (Stadium অর্থাৎ ২০২ গজ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন গ্রীসদেশীয় দূরত্ব পরিমাণবিশেষ) অন্তর পথের পার্শ্বে স্তম্ভ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"[৩]

হিন্দুদিগের সমরনীতি কখনই নির্দয় ও ধর্মভাব-বিবর্জিত ছিল না। অন্যান্য জাতির সমরনীতি অপেক্ষা হিন্দুদের সমরনীতি বহু অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিল এবং এ বিষয় মেগাস্থিনীসও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্যই রাজারা রাজধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। এবিষয়ে মেগাস্থিনীস-লিখিত বিবরণ এবং হিন্দুশাস্ত্র-কথিত অথবা মনু ও আপস্তম্বের বিধির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমরনীতিবেত্তা আপস্তম্ব বলেন ঃ

"যাহারা যুদ্ধে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা পলায়নপর বা কৃতাঞ্জলি-পুটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহারা আর্যগণের বধযোগ্য নহে। (আপস্তম্বসূত্র, দ্বিতীয় ভাগ ৫-১১)। যাহারা ভয়ার্ত, মাদকদ্রব্যের দ্বারা অচেতন, উন্মাদ, যাহাদের দেহ বর্মের দ্বারা সুরক্ষিত নয়, এবং স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ তাহাদের সহিত আর্যগণ যুদ্ধ করিবে না। (বোধায়নসূত্র, প্রথমখণ্ড ১০-১৮ ও দ্বিতীয়খণ্ড)। মৃত সৈনিক-গণের স্ত্রীদিগের ভরণপোষণের ভার রাজাই গ্রহণ করিতেন (বশিষ্ঠ ১৯-২০)। মেগাস্থিনীস বলেন, অন্যান্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শত্রুর দেশের জমিকে ধ্বংস করিয়া চাষ আবাদের

(৩) *Megasthenes*, translated by MacCrindle.

অযোগ্য করিয়া ফেলা অবাধে চলিতে থাকে এবং ইহাই সেইসব দেশে প্রচলিত বিধি। কিন্তু হিন্দুগণ কৃষক সম্প্রদায়কে পবিত্র বলিয়া মনে করেন। হিন্দুদের মতে কৃষকেরা কোন মতেই নিগ্রহের পাত্র নহেন। এমন কি, নিজেদের বাসস্থানের নিকটে যুদ্ধ হইলেও কৃষকেরা আপনাদিগকে কখনও বিপন্ন মনে করিতেন না। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ইহাছাড়া হিন্দু যোদ্ধাগণ আগুন লাগাইয়া কখনও শত্রুদের দেশ ধ্বংস অথবা তাহাদের শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি নষ্ট করিয়া দিতেন না। পরাজিত শত্রুকে তাঁহারা ক্রীতদাস হইতে বাধ্য করিতেন না।[৪]

মানবের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপক মহর্ষি মনুর মতে দুষ্টের দমন, প্রজাবর্গের পালন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য নির্বাহ করাই, রাজার ধর্ম এবং এই তিনটি কার্যই রাজার প্রধান কর্তব্য।[৫] সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া, লাম্পট্য, ব্যভিচার, ব্যসনাসক্তিও রাজাদের পক্ষে চরিত্রগত ভয়ানক অপরাধ।[৬] রাজাদিগের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবন-যাপনপ্রণালী সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন যে, রজনীর শেষ প্রহরে রাজা শয্যা ত্যাগ করিবেন। তাহার পর শৌচাদির শেষে ভক্তির সহিত উপাসনা করিয়া জনসাধারণের সহিত সাক্ষাতের ও তাহাদের অভিযোগ শুনিবার জন্য তিনি সভা-গৃহে আসিবেন। দর্শনার্থী প্রজাদের অভাব ও অভিযোগ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে

৪ *Ibid*

৫। "তস্মাদ্ধর্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টঞ্চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্মং ন বিচালয়েৎ॥'
—মনুসংহিতা ৭।১৩

৬। 'পানমক্ষাঃ স্ত্রিয়াশ্চৈব মৃগয়া চ যথাক্রমং।
এতৎ কষ্টতমং বিদ্যাচ্চতুষ্কং কামজে গণে॥' —মনুসংহিতা ৭।৫০

বিদায় দিয়া তিনি মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণাপারষদের নিভৃত কক্ষে যাইয়া রাজকার্য সম্বন্ধে আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন।[৭] মন্ত্রণা-পরিষদের কার্যশেষে তিনি দৈহিক পরিচর্যা ও আহারাদি সম্পন্ন করিবেন। প্রজাদিগের অভাব-অভিযোগ শুনিবার সুযোগ প্রদান ও তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করাই রাজার প্রধান কর্তব্য। 'অপরাহ্ণে রাজা তাঁহার সৈন্যদল, যোধ্বৃন্দ, যুদ্ধরথসমূহ এবং অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি যুদ্ধের বাহনদিগকে এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি পর্যবেক্ষণ করিবেন। এই কার্য শেষ হইলে তিনি সান্ধ্য উপাসনায় নিরত হইবেন। তাহার পর তিনি গুপ্তচরদিগের নিকট হইতে রাজকার্য সম্বন্ধে ও অন্যান্য গোপনীয় রাজনৈতিক সংবাদসমূহ শুনিবেন।[৮]

৭। 'উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নিব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্চ্য প্রবিশেৎ সশুভাং সভাম্॥
তত্র স্থিতঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ।
বিসজ্য চ প্রজাঃ সর্বা মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ॥
গিরিপৃষ্ঠং সমারুহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ।
অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ॥'

—মনুসংহিতা ৬।১৪৫-১৪৭

৮। 'ভুক্তবান্ বিহরেচ্চৈব স্ত্রীভিরন্তঃপুরে সহ।
বিহৃত্য তু যথাকালং পুনঃ কার্যাণি চিন্তয়েৎ॥
অলংকৃতশ্চ সম্পশ্যেদায়ুধীয়ং পুনর্জনং।
বাহনানি চ সর্বাণি শস্ত্রাণ্যাভরণানি চ॥
সন্ধ্যাঞ্চোপাস্য শৃণুয়াদন্তর্বেশ্মনি শস্ত্রভৃৎ।
রহস্যাখ্যায়িনাঞ্চৈব প্রণিধীনাঞ্চ চেষ্টিতম্॥
গত্বা কক্ষান্তরং ত্বন্যৎ সমনুজ্ঞাপ্য তং জনং।
প্রবিশেদ্ভোজনার্থঞ্চ স্ত্রীবৃতোঽন্তঃপুরং পুনঃ॥

সাতজন কিংবা আটজন মন্ত্রীর দ্বারা গঠিত মন্ত্রণা-সভা রাজাকে সর্বদা রাজকার্যে সাহায্য করিত। মনুসংহিতায় আমরা দেখিতে পাই যে, মন্ত্রিদের বিবিধ বিদ্যায় অভিজ্ঞতা, অস্ত্রচালনায় নৈপুণ্য এবং বংশের আভিজাত্য ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হইত। নিজ রাজ্যে এবং পররাষ্ট্রের সহিত শান্তি রক্ষা, যুদ্ধব্যাপার, রাজস্ব-আদায় অথবা দেবতা ও ধর্মের উদ্দেশে দানসম্বন্ধে রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।[১] স্বর্ণাদি ধাতুদ্রব্যের খনি, শ্রমশিল্পের কারখানা এবং মালগুদামের রাজস্ব আদায় করিবার উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইত। অন্যান্য রাজ্যে রাজদূতদের নিয়োগ করিয়া সেই সব দেশের রাজাদের সহিত রাজা রাষ্ট্রীয় নানা বিষয় আলোচনা দ্বারা কর্তব্য স্থির করিতেন। গ্রাম ও উপনগরসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী নিযুক্ত হইত। প্রত্যেক গ্রামের, দশখানি গ্রামের, কুড়িটি গ্রামের, একশত গ্রামের এবং সমষ্টিবদ্ধ এক সহস্র গ্রামের জন্য যথাক্রমে বিভিন্ন শ্রেণীর এক একজন শাসনকর্তা থাকিতেন। ঐ সকল শাসনকর্তাদের অধিষ্ঠিত স্থানকে 'গুল্ম' বলা হইত। ইঁহারা শুধু শাসনকর্তাই ছিলেন না, প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে চুরি, জুয়াচুরি ও দুর্নীতি না থাকে, সেজন্য সে সমস্ত দমন করিয়া গ্রামগুলিকে ইঁহারা

তত্র ভুক্ত্বা পুনঃ কিঞ্চিৎ তূর্যঘোষেঃ প্রহর্ষিতঃ।
সংবিশেৎ তু যথাকালমুত্তিষ্ঠেশ্চ গতক্লমঃ॥'

—মনুসংহিতা ৭।২২১-২২৫

১। 'মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্॥
* * * *
দূতঞ্চৈব প্রকুর্বীত সর্বশাস্ত্রবিশারদং।
ইঙ্গিতাকারচেষ্টজ্ঞং শুচিং দক্ষং কুলোদ্গতম্॥'

—মনুসংহিতা ৭।৫৪-৬৩

রক্ষা করিতেন। এই সকল শাসনকর্তাদের এই সমস্তই বিশেষ কর্তব্য বলিয়া ধার্য ছিল। সকল দিক দিয়া ইঁহারা গ্রামের অধ্যক্ষের ন্যায় ছিলেন। এই প্রকারে প্রত্যেক নগরেও শাসনকার্যের জন্য এক এক জন অধ্যক্ষ থাকিতেন। তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর কার্যতৎপরতা ও গতিবিধিসম্বন্ধে সন্ধান লইতেন এবং তাহাদের আচার, ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে গোপনীয় তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিতেন। স্মৃতিকার মনু বলিয়াছেন যে, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা সাধারণতঃ প্রবঞ্চক ও অত্যাচারী হইয়া পড়ে এবং প্রজাদের ধনসম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে। অতএব এই সকল অত্যাচারী ও অসাধু রাজকর্মচারীদের উৎপীড়ন হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।[১০] এই উক্তি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঠিক এখনকার কালে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতাগর্বী দেশের ন্যায় সেই প্রাচীন কালেও দেশশাসনকার্যে নিযুক্ত রাজকর্মচারীরা কিরূপ অত্যাচারী ও প্রবঞ্চক প্রকৃতির লোক ছিলেন। যীশুখৃষ্টের জন্মের কত শতাব্দী পূর্বে এই সকল আইনকানুন হিন্দু মনীষীরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে সত্যই আশ্চর্য হইতে হয়।

১০। 'দ্বয়োস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতং।
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্॥
গ্রামস্যাধিপতিং কুর্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥
* * * *
রাজ্ঞো হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরস্বাদায়িনঃ শঠাঃ।
ভৃত্যা ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যোরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ॥'
—মনুসংহিতা ৭।১১৪-১২৩

রাজসরকারের নিজস্ব জমিগুলির আয় হইতে রাজকার্যের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না বলিয়া নূতন রাজকর স্থাপন দ্বারা সেই আর্থিক অভাব পূর্ণ করা হইত। মহর্ষি মনুর ব্যবস্থা অনুসারে গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর এবং স্বর্ণের উপর শতকরা দুই টাকা হিসাবে রাজকর আদায় করা হইত। উৎপন্ন শস্য সকলের ষষ্ঠাংশ, অষ্টমাংশ অথবা দ্বাদশাংশ ভূমিকর বলিয়া গ্রহণ করার বিধি ছিল।[১১] অতএব দেখা যাইতেছে ইংরাজরাজত্বের সময়ের তুলনায় হিন্দুরাজত্ব কালে খাজনার পরিমাণ অল্পই ধার্য করা হইত। হিন্দুরাজত্ব কালে রাজারা কোন সময়ে অতিরিক্ত কর আদায় করিতে পারিতেন না। সে সময়ে রাজারা মাখন, মৃত্তিকা অথবা প্রস্তরনির্মিত পণ্য-দ্রব্যের ষোল ভাগের একভাগ মাত্র রাজস্ব আদায় করিতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হইলে মজুর, শিল্পী ও অন্যান্য শ্রমজীবিকে প্রত্যেক মাসে একদিনের মাত্র পারিশ্রমিক না দিয়া আপনাদের কাজ করাইয়া লইতে পারিতেন। কাজের সময়ে অবশ্য ঐ শ্রমিকদের রাজাই ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিতেন। এই প্রকার নিয়মে কার্য পরিচালিত হইত বলিয়াই প্রাচীন ভারতে এত অধিক সুরম্য অট্টালিকা, মনোহর প্রাসাদ ও স্মৃতিস্তম্ভাদি নির্মাণ কার্য সহজে সম্ভব হইয়া উঠিত। এখনকার দিনে ব্যয়বাহুল্য বশতঃ কেহ আর এই সমস্ত কার্য করিতে সাহস করেন না।

রাজ্যশাসন ও রাজস্বআদায় সম্বন্ধে এই সকল এবং অন্যান্য আইন হইতে অবগত হওয়া যায় যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহুপূর্বে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে উন্নতশ্রেণীর রাজ্যশাসনপ্রণালী বর্তমান ছিল। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনীস খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ও চীন

১১। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রণীত *Civilization in Ancient India*, Vol, 11 P.102 দ্রষ্টব্য।

পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ প্রায় ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়াছিলেন। আর একজন চীনদেশীয় পর্যটনকারী হিউয়েন-সাংও প্রায় ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন ও আনুমানিক পনের বৎসরকাল ভারতে বাস করেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই সময়কার হিন্দুরাজাদের শাসনকার্যপ্রণালীর ও রাজকার্য পরিচালনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রায়ই এরূপ শুনিয়া থাকি—সেই প্রাচীনকালে হিন্দুদের রাজ্যশাসনবিধি এমনই নিন্দনীয় ছিল যে, সুবিচার অথবা শান্তি বলিয়া কোন জিনিষ আদৌ ছিল না। তাহাদের মধ্যে সদা সর্বদা বিরোধ ও লড়াই লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু মেগাস্থিনীস প্রভৃতি বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষে আসিয়া ও বাস করিয়া ভারতের রাজ্যশাসনবিধির যে সুখ্যাতিপূর্ণ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়—ঐ সকল মন্তব্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বিদ্বেষ-পূর্ণ। প্রজাগণ করভারে প্রপীড়িত, স্বেচ্ছাচারী রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাবে দেশের বিপুল লোকক্ষয় বা নিজেদের ভিতর লড়াইয়ে খুনোখুনি হওয়া প্রভৃতি এমন একটিও বিসদৃশ ব্যাপারের দৃষ্টান্ত তাঁহাদের লিখিত বিবরণে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের বিবরণ হইতে বরং আমরা ইহাই পাই যে, "সে সময়ে প্রজারা সুখী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, অবিচার ও অশান্তি কাহাকে বলে তাহারা জানিত না। সে সময়ে কৃষি-কার্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল এবং বিবিধ ললিতকলার অনুশীলন প্রচলিত ছিল।" স্যামুয়েল বীল (Samuel Beal) কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণে সে সময়কার ভারতে হিন্দুদের রাজ্যশাসন-ব্যাপার সম্বন্ধে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে :

"দেশের শাসনকার্য-ব্যাপারে সহৃদয় ভাব অনুসৃত হইত বলিয়া শাসন-

নীতিও জটিল হইয়া উঠে নাই।* * প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে রাজার নিজস্ব ভূসম্পত্তি প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগের আয় রাজকার্য চালাইবার এবং যজ্ঞাদিতে বলি প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় ভাগের আয় মন্ত্রিগণ এবং প্রধান প্রধান রাজকর্মচারীদের সাহায্যবাবদ খরচ করা হইত। তৃতীয় অংশ যোগ্য কর্মচারীদের কার্যনৈপুণ্যের জন্য পুরস্কারস্বরূপে দেওয়া হইত এবং চতুর্থ ভাগ হইতে গুণের উৎকর্ষসাধনে উৎসাহিত করিবার জন্য ধর্মসম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই জন্য সামান্য পরিমাণে রাজকর ধার্য করা হইত এবং বেগার প্রথার কঠোরতা ছিল না।

সেকালে লোকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধনসম্পত্তি নির্বিঘ্নে রক্ষা করিতে পারিত এবং আপন আপন পরিবার প্রতিপালনের জন্য নিজস্ব জমিতে চাষ-আবাদ করিত। যাহারা রাজসরকারের জমিসমূহে চাষের কাজ করিত তাহাদিগকে রাজকরস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করিতে হইত। ব্যবসায়ীরা দেশের সর্বত্র অবাধে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিত। সামান্য শুল্ক লইয়া স্থলপথে অথবা জলপথে হউক বণিক্‌দের যাইতে দেওয়া হইত। জনসাধারণের হিতকর কোন কার্যের জন্য শ্রমজীবিগণকে কাজ করিতে বাধ্য করিলে তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য মজুরী দেওয়া হইত। কাজের তারতম্য অনুসারে শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরী দিতে কোনই ত্রুটি হইত না।

"দেশের সীমান্তপ্রদেশগুলি রক্ষা এবং দুর্বৃত্ত ও বিদ্রোহী লোকদিগকে শাস্তি দান করাই সৈনিকদিগের কার্য ছিল। অশ্বারোহী সৈনিকগণ রাত্রিকালে রাজপ্রাসাদের চারিদিকে পাহারা দিত। প্রয়োজন অনুযায়ী সৈন্যদের সংগ্রহ করা হইত। সৈনিকগণের নির্দিষ্ট বেতন ছিল

এবং প্রকাশ্যভাবে রাজ্যের লোকদিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা হইত। শাসনকর্তা, মন্ত্রী, বিচারক ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীদের নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালনের জন্য পদমর্যাদার তারতম্য অনুসারে রাজ-সরকার হইতে জায়গীর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।”

চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-সাং বলেন যে, চীনদেশীয় করদ রাজগণ চীনদেশ হইতে কয়েকজন ভদ্রলোককে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সম্রাট কনিষ্কের নিকটে জামিনস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। সম্রাট কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। মহারাজ কনিষ্ক ইঁহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। যেস্থান এই চীনদেশীয় ভদ্রলোকদিগের বাস করিবার জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে ‘চীনাপটি’ নামে পরিচিত হইয়াছে। চীনদেশবাসীরাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে ন্যাসপাতি ও পীচফল প্রচলন করিয়াছিলেন। এইজন্যই পীচফলকে ‘চীনানি’ ও ন্যাসপাতিকে ‘চীনারাজপুত্র’ বলা হইয়া থাকে।

মেগাস্থিনীসের সময় হইতে হিউয়েন-সাং-এর ভারতে আগমন পর্যন্ত (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত) এই দীর্ঘকাল ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এই প্রকারেরই ছিল। ইহা ব্যতীত প্রাচীন ভারতের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত-প্রথা এবং নগরগুলির জন্য পৌরপ্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অতি চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েত শাসনমণ্ডলীর মধ্যে পাঁচজন করিয়া সভ্য থাকিত। পঞ্চায়েত-সভা প্রথমে পাঁচজন সভ্য লইয়া গঠিত হইলেও পরে আবার বারোজন পর্যন্ত সভ্য এই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলির প্রত্যেকটিই স্বাধীনভাবে আপন আপন কার্য করিত। প্রত্যেক গ্রামে এইভাবে এক একটি করিয়া সাধারণতন্ত্র ছিল। এই পঞ্চায়েত-সভাই গ্রামের শাসনকার্য

পরিচালনা ও অন্য সমস্ত ব্যাপার নির্বাহের ব্যবস্থা করিত। গ্রামের উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ধারিত রাজকর গ্রাম্য পঞ্চায়েতের দ্বারাই নির্দিষ্ট সময়ে রাজসরকারে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক জেলা এইভাবে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হইত, প্রত্যেক ভাগ আবার গ্রাম্য পঞ্চায়েত-সভার দ্বারা শাসিত হইত। প্রত্যেক গ্রামের এই স্বায়ত্ত শাসন-ব্যাপারে গ্রামবাসীমাত্রেরই পূর্ণভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুবিধা ছিল। শাসনকার্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীন-ভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে পারিতেন। স্মৃতিকার মনুও এই গ্রাম্য পঞ্চায়েত-শাসনপ্রথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের অন্যান্য আইন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ ও বিবরণ আছে। হিন্দুরাজত্বকালে এই পঞ্চায়েতপ্রথা বরাবর একভাবে অক্ষুণ্ন ছিল। গ্রামবাসিগণ আপনাদিগের গ্রাম্য শাসনকর্তা বা 'প্রধান' নিজেরাই নির্বাচন করিতেন। এই শাসনকর্তা (মোড়ল) আপনার ভরণ-পোষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু ভূসম্পত্তি পাইতেন। তিনি নিজ গ্রামের শাসনসভায় সভাপতির কার্য করিতেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে সভ্যগণকে লইয়া সভার কার্য চালাইতেন। এই গ্রাম্য শাসনকর্তার অধীনে একজন আইন-সচিব থাকিতেন। তিনি গ্রামের সকলপ্রকার কাজ দেখাশুনা করিতেন, এবং সমস্ত জমির আয়তন বিবরণ, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ও দেয় রাজকরের হিসাব রাখিতেন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণপুরোহিত, গুরুমহাশয়, নাপিত, ছুতার, কামার, গয়লা, মুচী, কুমার, জেলে, ঔষধবিক্রেতা, কলু, চৌকীদার ও ঝাড়ুদার প্রভৃতি সকল প্রকার বৃত্তির লোক থাকিত। এই সমস্ত লোক লইয়াই এক একটি গ্রাম সংগঠিত হইত। ইহারা মিলিত হইয়া গ্রামসম্বন্ধীয় যাহা কিছু করণীয় সে সম্বন্ধে পরামর্শ ও যুক্তি করিয়া সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিত।

মহর্ষি মনুর সময় হইতে অথবা যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ চারিশত বৎসর পূর্বে ভারতে এই প্রকার গ্রাম্য শাসনপ্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও বহিঃশত্রুর আক্রমণে, আভ্যন্তরিক গৃহযুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, যুদ্ধবিগ্রহে অথবা ভূমিকম্পে কোন প্রকারেই সেই প্রথা বিকৃত বা বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই। এ সম্বন্ধে সার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়ামসও লিখিয়াছেন :

আমার মনে হয় ভারতের সমগ্র ইতিহাসে সুদূর অতীতে তাহার পল্লীসমাজের শাসনপ্রথা ও নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলির কালের প্রাচীনতা ও স্থিতিশীলতা অপেক্ষা আর কোনও ব্যাপার অধিকতর আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। আমাদের স্বদেশ ইংলণ্ডে প্যারিস্ (Parish) শাসনপ্রথার ন্যায় ভারতের এই গ্রাম্য শাসনকার্যের প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা করিলেই মনে হইবে যে, আর্যজাতি ইউরোপ অথবা এশিয়ার যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই সমাজে সর্বসাধারণের স্বাধীনতা-মূলক নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে গ্রাম বা নগর বলিতে শুধু কতকগুলি ঘর বা বাড়ীর সমষ্টিকে বুঝায় না। দৈর্ঘ্যে অথবা প্রস্থে তিন চারি বা তাহারও অধিক মাইল জুড়িয়া একটি জনপদে সর্বসাধারণের উন্নতি ও হিতের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তিধারী ও ব্যবসায়ী ব্যক্তির সমাবেশে ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোত্রগত পরস্পরের স্বার্থরক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের এই গ্রাম্য শাসন-সমিতির উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা। ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত না। ইহাই স্বরাজের বীজস্বরূপ। মধ্যযুগের ও আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ইহাই আদিম অবস্থা। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুই তিন শত বৎসর পূর্বে সমাজশাস্ত্রকার মনুর দ্বারা এই সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিবার সময় হইতে ভারতের এই সুশৃঙ্খল অবস্থা অপরিবর্তিত আকারেই চলিয়া

আসিতেছিল। প্রাচীন যুগ হইতে ভারতের ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর দিয়া বিপ্লবের কতই না ঝড় বার বার বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও এই ব্যবস্থা কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতের উপরে কতবার বৈদেশিক শত্রুগণের আক্রমণজনিত রক্তের স্রোতও বহিয়া গিয়াছে, অগ্নির জ্বলন্ত শিখা ভারতের গ্রামে গ্রামে—নগরে নগরে কতবার আপনার লেলিহান জিহ্বাদ্বারা সব ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতের গ্রাম ও নাগরিক ব্যবস্থাপদ্ধতির, তাহার প্রতিষ্ঠান-সমূহের সেই অতি পুরাতন ও সহজ সরল স্বাভাবিক রীতিনীতির পরিবর্তন কোনক্রমে কখনও হয় নাই। শত বিপ্লবের মধ্যে থাকিয়াও তাহা অচল, অটল ও অপরিবর্তনীয় রহিয়াছে।”[১২]

মুসলমানগণ ছয়শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যেও হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানগুলির কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। উহারা পূর্বে যেমনটি ছিল এখনও ঠিক তেমনটি আছে। পল্লীবাসী হিন্দু প্রজারা মুসলমানশাসনের পৃথক অস্তিত্ব কখনও অনুভব করিতেই পারে নাই। ভারতের সিংহাসনে তখন পাঠান অথবা মোগল বাদশাহগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের অধীন হিন্দু রাজারা অথবা রাণীগণ বাদশাহকে নির্দিষ্ট কর প্রদান করিতেন মাত্র। ইহার অতিরিক্ত তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে আর কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। এই কর প্রদান করাই অধীনতার একমাত্র চিহ্ন ছিল। অন্যান্য সকল বিষয়েই দেশীয় রাজা অথবা রাণীগণ স্বাধীনই ছিলেন। প্রত্যেক রাজাই আপনার রাজ্যে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন ও প্রচলন এবং শাসন ও বিচারকার্য নির্বাহ করিতে পারিতেন। এই সমস্ত কোন ব্যাপারেই মোগল বা পাঠান সম্রাটেরা

১২। Sir Monier Monier Williams: *Brahminism and Hinduism*, p. 445.

কিছুই হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই সকল দেশীয় রাজাদের রাজ্য-শাসনকার্য প্রাচীন হিন্দু আদর্শেই বরাবর চলিত। এখনও পর্যন্ত ইংরাজদের অধীনে যে সমস্ত হিন্দুশাসিত করদ ও মিত্ররাজ্য আছে, তাহাদের শাসনকার্য প্রাচীন হিন্দু রাজনীতি অনুসারেই নির্বাহিত হয়। মুসলমানগণ প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ভারতের সর্বত্র তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বে বিচারপ্রণালী, পুলিস বিভাগের কার্য দুষ্টের দমন, শান্তি রক্ষা প্রভৃতি এবং রাজস্ব আদায় সমস্ত কার্যই গ্রাম্য সমিতিসমূহের দ্বারা সম্পন্ন হইত।

কিন্তু এক্ষণে আর সে ভারত নাই। স্বেচ্ছাচারী ইংরাজ শাসনকর্তাগণ বর্তমানে তাহাদের অধীনে শাসিত ভারতে হিন্দুদের সেই গ্রাম্য প্রাচীন স্বায়ত্তশাসন প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া বিষম অদূরদর্শিতার পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। আর তাহার ফলে যে শাসনবিধি ও বিচারপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে করিতেই জনসাধারণ আজ নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। এরূপ অন্যায় ব্যবস্থার তুলনা জগতের ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

অনেকেই ইংরাজের ন্যায়-বিচারের প্রশংসা করিয়া থাকেন। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজশাসনে ন্যায় বিচার আছেই। কিন্তু সে ন্যায় বিচারের পশ্চাতে ব্যয়ভারও বড় কম নয় এবং তাহা নিরপেক্ষও নহে। বিচারস্থলে যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই ভারতবাসী হইয়া থাকেন, সেইস্থলেই শুধু নিরপেক্ষ বিচার হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোনও ইউরোপীয় ভারতবাসীর উপর অত্যাচার করেন, তখন আর সেক্ষেত্রে কোন নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। বিশেষতঃ ইংরাজের আদালতে ন্যায় বিচার পাওয়া এতই ব্যয়সাপেক্ষ

যে, দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে সে খরচ দেওয়া সম্ভবও নয়। ব্রিটিশ শাসনকালে পুলিসের এই বর্তমান অত্যাচার ও রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারিগণের নিষ্ঠুরতার ফলে ভারতের প্রজাসাধারণ তাহাদের সকল আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়া ক্রমশঃই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

আমেরিকায় অনেক লোকেরই বিশ্বাস যে, ইংরাজেরা বাহুবল দিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় মুসলমান রাজশক্তির অধঃপতনের সময় কয়েকজন ইংরাজ বণিক্ বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন। হিন্দুদের মুসলমান বিরোধের বহ্নি তখন ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায়ই বিশেষ করিয়া জ্বলিতেছিল। হিন্দুরা মুসলমানদের অধীনতা হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া হিন্দু-শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। মুসলমানদের দিল্লী সিংহাসনকে অধিকার করাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এই রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতার সন্ধিক্ষণে ইংরাজ বণিকেরা 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে তাঁহারা মোগলবংশের হীনবল ও নামসর্বস্ব শেষ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। মোগল সম্রাট তখন নিতান্তই নিঃসহায় ও নগণ্য। তখন তাঁহার সমস্ত প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তিই চলিয়া গিয়াছে। এই সহায়তার প্রতিদানরূপে লর্ড ক্লাইভের প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ মোগল বংশের শেষ সম্রাট ইংরাজ সওদাগরদিগের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার দেওয়ান বা শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া একটি সনন্দ দান করিলেন। যদিও সে সময় মোগল সম্রাটের সনন্দ দান করিবার কোন নিজস্ব ক্ষমতাই ছিল না; তথাপি যতদিন তিনি নামেমাত্রও ভারতের সম্রাট ছিলেন, ততদিন তাঁহার দেওয়া এই সনন্দের বলে ইংরাজরা ভারতে আইনতঃ

তাঁহাদিগের ক্ষমতা বা অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। কোম্পানীর সওদাগরগণ যেখানেই যাইতেন সেখানেই এই সনন্দ পত্র লইয়া যাইতেন। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ কলিকাতা হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারসকে লিখিয়াছিলেন ঃ

"আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থবলের সহায়তা প্রাপ্তির প্রতিদানস্বরূপ মোগল সম্রাট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এই অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই দেওয়ানী অর্থে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের (সুবা) সমস্ত জমিজমার তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা।"

এই তিনটি সুবা অথবা প্রদেশই সর্বপ্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং সেই সময় এই তিনটি সুবা হইতে প্রভূত রাজস্ব আদায় করা হইত। এ সম্বন্ধেও লর্ড ক্লাইভ লিখিয়াছেন ঃ

"এই অধিকার-প্রাপ্তির ফলে রাজস্বের পরিমাণ আমার বিবেচনায় আপনাদিগের পূর্ব অধিকৃত বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের রাজস্ব সমেত এই বৎসরে দুইশত পঞ্চাশ লক্ষ সিক্কা টাকা অপেক্ষা বিশেষ কম হইবে না। ক্রমশঃ বৎসরে বৎসরে আরও বিশ হইতে ত্রিশলক্ষ টাকা বেশী আদায় করা যাইতে পারিবে। শান্তির সময় আপনাদিগের সমর ও শাসনবিভাগের ব্যয় কখনই ষাট লক্ষের অধিক হইবে না। নবাবের ভাতা কমাইয়া ক্রমশঃ বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা করা হইয়াছে। মোগল সম্রাটকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র করস্বরূপে দেওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত খরচ-খরচা বাদে অন্ততঃ একশত বাইশ লক্ষ সিক্কা টাকা অর্থাৎ ১,৬৫০,৯০০ বিলাতী পাউণ্ড কোম্পানীর হাতে লাভ থাকিয়া যাইবেই।"[১৩]

১৩। *House of Commons Third Report*, 1773, Appendix, pp. 391-398.

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ
"বৎসর পনর লক্ষ পাউণ্ডের অধিক অর্থ এই অধীন দেশ হইতে কোম্পানীর অংশীদারগণের লভ্যাংশস্বরূপ ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত।"[১৪] এই প্রকার পন্থা অবলম্বনে ভারতে ইংরাজশাসনের সূচনা হইয়াছে। এক্ষণে ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া সেইস্থলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকায় (অথবা তিন কোটি পাউণ্ডে) দাঁড়াইয়াছে। স্যার রমেশচন্দ্র দত্তও এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ "ক্লাইভের পরিকল্পিত ভারতে প্রবর্তিত রাজ্যশাসনপ্রণালী অনুসারে শাসনতন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। রাজস্ব প্রভৃতি ইংরেজ তখন নবাবের নামেই আদায় করিত। নবাবের কর্মচারীরাই বিচার মীমাংসা ইত্যাদি করিত এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারও নবাবের কর্তৃত্বের নামেই চালানো হইত। কিন্তু দেশের প্রকৃত মালিক হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই যাহা কিছু লাভের অংশ সমস্ত নিজেরা গ্রাস করিতেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণ অবাধে প্রজাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া আপনাদের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিতেন। নবাবের কর্মচারীরা ভয়ে চুপ করিয়া থাকিতেন। নবাবের বিচারালয় ইংরাজদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রজাপীড়নের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা হইত।"[১৫] যাক্, সে অনেক কথা। ইংরাজজাতির অযোগ্য প্রতিনিধিগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামে সে সময়ে যে দুর্নীতি ও হীন পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতের জনসাধারণের যে দারুণ দুর্গতির সৃষ্টি করিয়াছিল

১৪। Sir R. C. Dutta: *Economic History of British India*, p. 39.

১৫। *Ibid*, p. 42.

তাহার তুলনা নাই। সে সময়ে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে ইংরাজজাতির আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল। ভারতে ইংরাজজাতির ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিক্রয়কেন্দ্র ও তাহার বিস্তারের জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা নানাপ্রকার ঘৃণিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা বাগ্মীপ্রবর এড্‌ম্যাণ্ড বার্ক-প্রদত্ত ভারতে অবস্থানকালে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কুশাসন ও কুকীর্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপূর্ণ বক্তৃতাবলী (*Impeachment of Warren Hastings*) পাঠ করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিরূপ অমানুষিক দুর্নীতি চালাইয়া এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিকে ছারখার করিয়া দিয়াছেন! জমিদারদের পৈতৃক ভূমিসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া প্রকাশ্য নীলামে যে বেশী ডাকিত তাহাকে দেওয়া হইত। নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া ও অত্যধিক শুল্ক বসাইয়া দেশের শ্রমশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যগুলিকে তদ্দ্বারা নষ্ট করিয়া তাহার স্থলে তাঁহারা নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে প্রথম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া জেলায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল। এই দুর্ভিক্ষে পূর্ণিয়া জেলার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক নরনারী অনাহারে প্রাণ বিসর্জন করিল। কিন্তু এই দারুণ দুর্ভিক্ষের সময়েও এমন কঠোরতার সহিত জমির খাজনা আদায় করা হইল যে, সেই দুর্ভিক্ষের বৎসরেও সরকারী খাজনার আয় হইল অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক। ৯ই মে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিল কোর্ট অফ ডিরেক্টারকে এসম্বন্ধে যে পত্র লিখিলেন তাহাতে দেখা যায়ঃ "দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে! অনাহারে মৃত্যু, দ্বারে দ্বারে অন্নের জন্য ভিক্ষার সকরুণ দৃশ্য সত্যসত্যই অবর্ণনীয়! ধন-ধান্যপূর্ণ পূর্ণিয়ার ন্যায় সমৃদ্ধ জেলায়

একতৃতীয়াংশের অধিক লোক দুর্ভিক্ষের জন্য মারা গিয়াছে। দেশের অন্যান্য অংশেও লোকেদের দুর্দশা সমান।”[১৬]

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কাউন্সিল আবার লিখিয়াছেন : গত ভীষণ দুর্ভিক্ষে দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং বহু লোক তাহার ফলে মারা গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলা ও বিহারে জমির খাজনার হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।”[১৭]

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও লিখিয়াছেন : “সাধারণতঃ উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অভাবের জন্যই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। ভারতবাসীর চিরস্থায়ী দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্য সেই দুর্ভিক্ষ ভীষণ আকার ধারণ করে ও তাহাতে এত বেশী লোকক্ষয় হয়। যদি শস্যহানির সময়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি হইতে মূল্য দিয়া খাদ্যশস্য কিনিবার শক্তি তাহাদের থাকিত তাহা হইলে ভারতবর্ষে এত লোক দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ হারাইত না। কিন্তু ভারতবাসীরা একেবারে নিঃস্ব বলিয়াই আশপাশের স্থানসমূহ হইতে নিজেদের খাদ্যশস্যাদি কিনিতে পারে না। সেইজন্য ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানে শত শত, হাজার হাজার এমন কি লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।”[১৮]

১৮৮০ এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চল্লিশ বৎসরে ভারতবর্ষে দশবার বিস্তৃত জায়গা জুড়িয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতবর্ষে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহাতে দুই লক্ষ লোক

১৬। Extracts from *India Office Records* quoted in Hunters *Annals of Rural Bengal*, (1858), pp. 21.

১৭। *Ibid.*, p. 339.

১৮। Sir R. C. Dutt : *Economic History of British India*, p. 51.

মারা গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু মনে হয় ইহা অপেক্ষা তখন আরও অধিক লোকক্ষয় হইয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে উড়িষ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক অর্থাৎ প্রায় দশলক্ষ নরনারীর মৃত্যু হইয়াছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে আবার দুর্ভিক্ষ হয়; সেবার অন্ততঃ বার লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারাইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলাদেশে জমির খাজনার হার অপেক্ষাকৃত অল্প নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং সেজন্য অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলাদেশের লোকেরা তেমন দরিদ্র ছিল না। সেজন্য সেই বৎসরে বাঙলার দুর্ভিক্ষে আর লোকক্ষয় হইতে পারে নাই। অপর পক্ষে মাদ্রাজে জমির খাজনা অনেক বেশী ছিল এবং সময়ে সময়ে এই খাজনার হার আরও বাড়িয়া যাইত। সেজন্য মাদ্রাজের লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র ও সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আবার মাদ্রাজে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাহার ফলে পঞ্চাশ লক্ষ মাদ্রাজবাসী প্রাণ হারাইল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে পুনরায় তৃতীয়বার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সেখানেও বার লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হইল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় তাহাতে যে কত লোক প্রাণ হারাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এবিষয়ে কোনও সরকারী রিপোর্ট (বিবরণ) পাওয়া যায় না। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আবার মাদ্রাজ, বাঙ্গালা, ব্রহ্মদেশ ও রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ হইল। ইহার ফলে মাদ্রাজে বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল; কিন্তু বঙ্গদেশে কেহ মরে নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারতের সর্বত্র বাঙ্গালা, ব্রহ্মদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। যখন দুর্ভিক্ষ প্রবল ভাব ধারণ করে, সেই সময়ে প্রায় ত্রিশলক্ষ নরনারী সরকারী রিলিফ (সাহায্য) কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও অন্যান্য স্থানে লোকক্ষয় হয় নাই বটে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে সেই বৎসর প্রতি বর্গ মাইলে

মৃত্যুসংখ্যা অন্যান্য বৎসরের গড়পড়তা ৩৩ হইতে বাড়িয়া ৬৯ পর্যন্ত ওঠে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা সর্বাপেক্ষা ব্যাপক হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ যে-কয়মাস ধরিয়া অতি প্রবল আকারে বিরাজ করিতেছিল সাহায্যপ্রাপ্ত মজুরদের সংখ্যা তখন প্রায় ষাটলক্ষ হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে দুর্ভিক্ষ কমিশনের সভাপতি স্যার এ. পি. ম্যাক্‌ডোনেল্ লিখিয়াছিলেন: "মশা ও মাছির ন্যায় মানুষেরা মরিয়াছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনটি দুর্ভিক্ষের বিষময় পরিণাম এবং জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সরকারী আদম সুমারিতে গৃহিত তথ্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। গত দশ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও উত্তর-ভারতে লোকসংখ্যা সামান্য বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে লোকসংখ্যা লক্ষ লক্ষ হ্রাস পাইয়াছিল। এই সকল স্থানেই দুর্ভিক্ষ প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবৎসরে শতকরা একজন করিয়া লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকিলে এই দশবৎসরে ভারতে লোকসংখ্যা যত হইত তাহা অপেক্ষা গণনায় প্রায় তিনকোটি লোক কমিয়া গিয়াছিল।"[১৯]

ক্লাইভের পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটের পদে উন্নীত হন। ইনিই ভারতের প্রথম বড়লাট। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম পিটের প্রস্তাবিত ইণ্ডিয়া বিল্ আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত

১৯। Sir R. C. Dutt: *Indian Famines*, p. 10.

হইতে ইংলণ্ডের রাজশক্তির নিকট ভারতশাসনের অধিকার হস্তান্তরিত হয় এবং তাহা হইতে ভারতবর্ষের শাসনকার্যের সামান্য কিছু সংস্কারও হইয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পরে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন। ব্রিটিশ রাজ্যের উপনিবেশ বিস্তার করিবার জন্য যে কোন অছিলায় দেশীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া তাহাদের রাজ্যগুলি দখল করিয়া ফেলা, রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ভারতের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদকে শোষণ করিয়া বিলাতে প্রেরণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নিযুক্ত সমস্ত গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটেরই লক্ষ্য ছিল।

স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: "ভারতের শাসনকার্য নির্বাহক পরিষদে ভারতবাসীরা স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিবার কোনই অধিকার পান না। এখানে কোনও ভারতবাসীর ভোট দিবার বা প্রতিনিধি হইয়া প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। কোনও নূতন কর স্থাপনে অথবা সরকারী কোন বিষয়ে আর্থিক ব্যয়ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোন মতই গ্রহণ করা করা হয় না। সরকারী আয়ব্যয়ের সমতারক্ষার ব্যাপারে ভারতবাসীদের কোনও অধিকার নাই। ভারতের উপর যে ভীষণ করভার চাপানো হইয়াছে তাহার স্বপক্ষে কোনই যুক্তি পাওয়া যায় না। এই সকল রাজকরলব্ধ অর্থরাশি ভারতের উন্নতির জন্যও ব্যয় করা হয় না। প্রতিবৎসরে ত্রিশকোটি হইতে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত এই অর্থশোষণের ফল যে কী ভীষণ সে বিষয় বিগত শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে) বহু ইংরাজ মনীষী অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"[২০]

২০। Sir R. C. Dutt : *Indian Famines*, p. 10.

মাদ্রাজের অস্থায়ী গভর্ণর স্যার টমাস্ মন্‌রো তাঁহার চল্লিশ বৎসরব্যাপী ভারতবাসের অভিজ্ঞতার পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন: "রাষ্ট্রীয় শাসনের বিধিব্যবস্থা প্রণয়নব্যাপারে ভারতবাসীদের কোনই হাত নাই —শাসনকার্য পরিচালনা তো দূরের কথা। তবে ছোট খাট রাজ-কর্মচারীর পদে ভারতবাসীদের নিযুক্ত করা হয়। তাহারা সমর বিভাগ বা শাসনকার্যে কোন উচ্চপদ পাইবার আশা করিতে পারে না। তাহাদিগকে সর্বত্রই নিম্নতর জাতি বলিয়া মনে করা হয়। ভারতবাসীরা যে একদিন এই দেশেরই প্রভু ছিল, এদেশ যে তাহাদেরই এমন কথা মনেই হয় না। এখন তাহারা ইংরাজের অনুগ্রহপ্রার্থী দাসমাত্র। শাসন ও সমরবিভাগের সমস্ত উচ্চপদ ইউরোপীয়গণেরই অধিকৃত। ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের উদ্বৃত্ত অর্থরাশি নিজেদের দেশ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।"

বেঙ্গল সিভিল্ সার্ভিস বিভাগের মিঃ ফ্রেডারিক্ জন্ সোর্ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন: "ভারতের সেই সুখের দিন আর এখন নাই। একদিন ভারত ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল। ভারতের সেই ঐশ্বর্যরাশি এখন অতীতের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতের ধনরাশি সব বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। ভারতবাসীর কর্মসামর্থ্য আজ অন্যায় শাসননীতির ফলে স্তব্ধ ও বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতের এখনকার শাসননীতির উদ্দেশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির সুখসুবিধার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ করা।"

ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরে যে প্রভূত অর্থ ইংলণ্ডে চলিয়া যায় সে সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসনও বলিয়াছেন: "ভারত হইতে যে প্রভূত অর্থ ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর চলিয়া যায়, সে টাকা ভারতবাসীদেরই নিজস্ব, অথচ তাহার বিনিময়ে ভারতবাসীরা কিছুই পায় না। এই অর্থশোষণের ফলে আজ

ভারতবাসী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমাগতই তাহাদের শোষণ করিয়া এই অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে অথচ তাহার পরিবের্ত তাহারা কিছুই পাইতেছে না। ভারতের জাতীয় শ্রমশিল্পের ধমনী হইতে জীবনশক্তিরূপ রক্তমোক্ষণের ন্যায় এই অর্থশোষণ ক্রমাগতই চলিতেছে অথচ সেই জীবনীশক্তির রক্ষাকল্পে কোন প্রকার পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা নাই।"

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অন্যতম সভ্য এবং রেভিনিউ বোর্ডের সভাপতি জন্ সুলিভ্যান্ (John Sullivan) তাঁহার লিখিত এক রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেনঃ "বর্তমান ভারতে অনুসৃত অর্থ-নৈতিক বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে ভারতবাসীরা যে অভিযোগ করিয়া থাকে, সে অভিযোগ আমার বিবেচনায় অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে তত নহে। আমার মনে হয়, যে অন্যায়ভাবে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে সেই নীতিসম্বন্ধেই ভারতবাসীরা অভিযোগ করিয়া আসিতেছে। কারণ ভারতবাসীদের নিজেদের রাজত্ব-কালে রাজকররূপে সংগৃহীত সমস্ত অর্থই ভারতে ব্যয় করা হইত। কিন্তু আমাদের (ইংরাজদের) শাসনকালে রাজস্ব হইতে অধিকাংশ অর্থই প্রতিবৎসর ভারতের বাইরে চলিয়া যাইতেছে এবং ইহার পরিবর্তে ভারতকে আমাদের কিছুই দেওয়া হইতেছে না। এই শোষণনীতি বিগত ষাট বা সত্তর বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমাদের ভারতশাসননীতি স্পঞ্জের (sponge) ন্যায় গঙ্গাতীরবর্তী সমস্ত উত্তম ও লোভনীয় পদার্থসমূহ শোষণ করিয়া আনিয়া পরে নিংড়াইয়া সেই ঐশ্বর্যরাশি আমাদের টেমস্‌নদীর তীরে ঢালিয়া দিতেছে। * * ভারতবাসীর উপর নূতন করস্থাপনের আলোচনাসভায় কোনও ভারতবাসীই নিজেদের মত প্রকাশ করিতে পারে না। আমরা (ইংরাজ-জাতি) কর ব্যবস্থা করি, আর তাহারা নীরবে সেই কর দান করিয়াই যায়।

আমরা আইনপ্রণয়ন করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করি, আর তাহারা সেই আইন মানিতে বাধ্য হয়। তাহাদের নিজেদের দেশে শাসনকার্যে তাহাদের কোন অধিকার নাই। তাহাদের সম্বন্ধে এই জঘন্য অজুহাত দেখান হয় যে, দায়িত্বপূর্ণ কার্য করিতে হইলে যে বুদ্ধি বিবেচনা, নৈতিকগুণ ও চরিত্রবল থাকা দরকার ভারতবাসীদের সে সব গুণ আদৌ নাই।"[২১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় শ্রমশিল্পের ধ্বংস-সাধন করিয়া ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহার সকল কিছু করিতে ইংরাজশাসক সম্প্রদায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ইহার কারণ এই যে, বিলাতী গভর্ণমেণ্টের ভোটদাতাগণের মধ্যে বণিক্ ও শিল্পপতিগণেরই প্রাধান্য বর্তমান। এই বণিক্ ও শিল্পপতিরাই প্রকৃত-পক্ষে ভারতের শাসননীতি নির্ধারণ করিতেছেন। ইঁহারাই এক্ষণে ভারতের ভাগ্যবিধাতা। এই ব্যাপারে ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ বা দার্শনিকগণের কোন হাত নাই বলিলেই চলে। ইংলণ্ডের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যসমূহ বাণিজ্যের পণ্যরূপে ভারতে জোর করিয়া ঢোকাইল; কোম্পানীর নিযুক্ত বড়লাট ও কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ সেই কার্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিতে লাগিলেন। অথচ ভারতজাত শিল্পদ্রব্যের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক বসাইয়া তাহার ইংলণ্ডে প্রবেশের পথ রোধ করা হইল। স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানী শিল্পজাত পণ্যের উপর ব্রিটিশ সরকার আমদানী শুল্কের গুরুভার বসাইলে ভারত হইতে ইংলণ্ডের কমন্স সভায় আবেদন করিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ

২১। Mr. John Sullivan's *Report of the Select Committee*, P. 402.

করা হয়; কিন্তু সেই প্রতিবাদের কোন ফলই হইল না। চারিশত ইংরাজ ও ভারতীয় বণিক্ ভারত হইতে প্রেরিত চিনি ও মদ্যের উপর আমদানী শুল্কের বিরুদ্ধে আর একবার প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন; ইংরাজ সরকার তাহাও অগ্রাহ্য করিলেন। ইংরাজ-সরকারের উদ্দেশ্য, যে সমস্ত কাঁচামাল হইতে বিলাতী শিল্পজাত-দ্রব্য প্রস্তুত হয়, সেগুলির জন্য অন্য কোনও দেশের উপর নির্ভর করিতে না হয়, তাহা শুধু ভারতবর্ষ হইতেই আমদানী করিবেন এবং ভারত আর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া বিলাতী শিল্পপতিগণের সমৃদ্ধির জন্য কেবল কাঁচামাল প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ডে রপ্তানী করিবে।"[২২] জার্মাণ অর্থনীতিবিদ্ ফ্রেডারিক্ লিষ্ট্ বলিয়াছেন: "যদি ইংরাজ সরকার বিলাতে ভারতীয় শিল্পজাত পণ্য অবাধে প্রবেশ করিতে দিতেন, তাহা হইলে অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলাতী শিল্পের ধ্বংস হইত।"[২৩] এইরূপে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে ভারত একদিন শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল, এখন হইতে তাহাকে কেবলমাত্র কৃষিকার্যের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইল।

কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্রাদি ও শাল, পশমের কাপড়, চিনি, তামাক, ইক্ষুজাত সুরা, রঞ্জক পদার্থের নানাপ্রকার রঙ, সোরা, কফি, চা, ইস্পাত স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, কয়লা, কাষ্ঠ, আফিম, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য এবং ইহা ভিন্ন নানাপ্রকার শস্য ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ ও এশিয়ার নানাজাতির নিকট বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে রপ্তানী করা হইত। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের অজুহাতে ইংলণ্ড ভারতে বিলাতী মাল রপ্তানী করিতেছে এবং

২২। Sir. R. C. Dutt: *Economic History of British India* p. 294.

২৩। Frederick List: *The National System of Political Economy*, p. 42.

শুল্কের হার (Table of Tariffs)

[১]

	১৮১২ খৃষ্টাব্দ মূল্যের উপর শতকরা হিসাব	১৮২৪ খৃষ্টাব্দ মূল্যের উপর শতকরা হিসাব	১৮৩২ খৃষ্টাব্দ মূল্যের উপর শতকরা হিসাব
সুদৃশ্য বেতের দ্রব্যাদি	৭১	৫০	৩০
মসলিন	২৭ ১/৩	৩৭ ১/২	১০
ছিটের কাপড়	৭১ ১/৩	৬৭ ১/২	১০
কার্পাসজাত অন্যান্য দ্রব্য	২৭ ১/৩	৫০	২০
পশমী শাল	৭১	৬৭ ১/২	৩০
সোনালী কাজকরা দ্রব্যাদি	৭১	৬২ ১/২	৩০
মাদুর	৬৮ ১/৩	৫০	২০

শুল্কের হার (Table of Tariffs)

	১৮১২ খৃষ্টাব্দ মূল্যের উপর শতকরা হিসাব	১৮২৪ খৃষ্টাব্দ মূল্যের উপর শতকরা হিসাব	১৮৩২ খৃষ্টাব্দ মূল্যের উপর শতকরা হিসাব
কাঁচা রেশম	মূল্যের উপর দুই পাউণ্ড তের শিলিং এবং প্রতি পাউণ্ডের উপর চার শিলিং অতিরিক্ত	প্রত্যেক পাউণ্ডে চার শিলিং	প্রত্যেক পাউণ্ডে এক পেনি
রেশমী দ্রব্য	আমদানী নিষিদ্ধ	আমদানী নিষিদ্ধ	দামের উপর শতকরা ২০ ভাগ
বাফ্‌তা বা অন্যান্য সাদা অথবা কাজকরা রেশমী কাপড়	আমদানী নিষিদ্ধ	আমদানী নিষিদ্ধ	দামের উপর শতকরা ৩০ ভাগ
রেশম জাতদ্রব্য	আমদানী নিষিদ্ধ	আমদানী নিষিদ্ধ	দামের উপর শতকরা ২০ ভাগ
চিনি (খরিদ মূল্য প্রতি হন্দর প্রায় এক পাউণ্ড)	১ পাউণ্ড ১৩ শিলিং প্রতি হন্দর	৩ পাঃ ৩ শিঃ প্রতি হন্দর	১ পাঃ ১২ শিঃ প্রতি কোয়ার্টার
মদ্য, স্পিরিট প্রভৃতি	প্রতি গ্যালন ১ শিলিং ৮ পেন্স ও ১৯ শিঃ ১½ পেন্স আবগারী ট্যাক্স	প্রতি গ্যালন ২ শিঃ ১ পেনি ও ১৭ শিঃ ¼ পেনি আবগারী ট্যাক্স	প্রতি গ্যালন ১৫ শিলিং
কার্পাস	প্রতি ১০০ পাউণ্ড ১৬ শিঃ ১১ পেন্স	শতকরা ৬ পাউণ্ড	শতকরা ২০ ভাগ

ভারতবাসীদের সেগুলিকে ব্যবহার করিতে বাধ্য করা হইতেছে। ইংলণ্ড হইতে আমদানী মালসমূহের জন্য কোন শুল্ক দিতে হয় না। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যসমূহ যাহাতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য ইংলণ্ডের রাজসরকার অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বসাইয়া সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে ভারতজাত কোন শ্রমশিল্পই ইংলণ্ডের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই। বরং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের মধ্যেই প্রায় দুইশত পঁয়ত্রিশটি দেশী শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ কার্পাস শুল্কসম্বন্ধে আইনের ছয় ধারায় লিখিত আছে: "ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের অন্তর্গত প্রত্যেক কাপড়ের কল হইতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক বসাইয়া তাহা প্রত্যেক কলের মালিকদের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে।" এই আইন সম্বন্ধে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন: "শুল্ক আদায়নীতির অবিচারের দৃষ্টান্তসম্বন্ধে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সরকার ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নামক যে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন সমস্ত পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে এই কুদৃষ্টান্তের তুলনা পাওয়া যায় না। সভ্য জগতের অধিকাংশ শাসনকর্তৃপক্ষই বিদেশাগত শিল্পদ্রব্যের উপব নিষেধকারী শুল্ক বসাইয়া দেশীয় শিল্পদ্রব্যের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। অবাধ বাণিজ্য-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা তৎপর সরকারও রাজস্বের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক বসাইলেও দেশীয় শিল্পদ্রব্যের উপর কোনও শুল্ক ধার্য করেন না। ভারতের শ্রমশিল্পের এখন শৈশব অবস্থা; এ অবস্থায় ভারতজাত শিল্পকার্যকে পরিপোষণ করা সর্বদাই উচিত। বিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ও এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার ভারতজাত শিল্পকার্যকে রক্ষা করিবার জন্য কোন

চেষ্টাই করেন নাই। ইহার উপর আমদানি বাণিজ্যের উপর যে সামান্য শুল্ক রাজস্বের খাতিরে বসান ছিল ১৮৭৯ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাহাও পরিত্যাগ করা হইল। ভারতজাত কার্পাস-শিল্প ইংলণ্ড হইতে আমদানী-করা মালের সহিত কোনরূপ প্রতিযোগিতা না করা সত্ত্বেও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার উপর শুল্ক বসান হইল। নিজেদের প্রতিনিধিমূলক কোন প্রতিষ্ঠান নাই বিদেশী শাসক এই সুযোগে ভারতবাসীর স্বার্থ এমনই ভাবে উৎসাদন করিল।"[২৪] এই বিবৃতি হইতেই জানা যায় যে, বৃটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক অবস্থা কী প্রকার উন্নত হইয়াছে।

আসামে চা-এর চাষ করা হয়। এই চা-এর চাষের জন্য শ্রমজীবি যোগাইবার উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার আবার একটি বিশেষ আইন প্রচলন করিয়াছেন। এই আইনটি ভারতবর্ষে 'কুলী-আইন' (Slave Law) নামে পরিচিত। চা-এর আবাদকার্যের ব্যাপারে ইহা মহা-কলঙ্কস্বরূপ। সরল ও অশিক্ষিত নরনারীকে নানারকম প্রলোভনে ভুলাইয়া চুক্তিপত্রে তাহাদের সম্মতি দান করাইয়া লওয়া হইলে তাহারা আর এই আইনের ফাঁদ হইতে রক্ষা পায় না। চুক্তিপত্র অনুযায়ী যাহার যতদিন চা-বাগানে খাটিবার মেয়াদ থাকে তাহাকে ততদিন বাধ্য হইয়াই কুলীগিরি করিতে হইবে। যদি তাহারা এই কষ্টকর জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পালাইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত করার পরে আবার চা-কর শ্বেতাঙ্গ মনিবদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রাজদণ্ডে মিয়াদ খাটিবার ভয়ে কুলীরা অমানুষিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। অন্য কোনপ্রকার শ্রমিকদের জন্য এমন নিষ্ঠুর

২৪। R. C. Dutta: *India in the Victorian Age*, p. 543

আইন ভারতে আর কোথাও নাই। এই কুলী-যোগানর ব্যাপারেও জালিয়াতি, প্রতারণা, নির্যাতন ও স্ত্রী-পুরুষদের ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কত যে ঘৃণিত কার্য দেশের ফৌজদারী আদালতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে এবং এই সব চুক্তিবদ্ধ হতভাগ্য কুলী পুরুষ ও নারীদের উপর যে সব অকথ্য অত্যাচার হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আসামের চা-বাগানের ইতিহাসে ইহা এক দুরপনেয় কলঙ্কবিশেষ। দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা কতবার এই নিষ্ঠুর আইন তুলিয়া দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন 'প্রয়োজন অনুযায়ী যোগান হয়' এই আইন অনুসারে ভারতের অসংখ্য বুভুক্ষু নরনারী স্বেচ্ছায় শ্রমিক হইয়া আসিবে। কিন্তু চা-বাগানের অর্থশালী মালিকদের অসীম প্রভাবে ভারত-সচিব অথবা কোন বড়লাট পর্যন্ত এই অত্যাচারপূর্ণ আইন তুলিয়া দিতে সাহসী হইলেন না। এই কুলী-আইন সত্যই দাস-ব্যবসায়ের অনুরূপ। অথচ আজ পর্যন্তও ভারতবর্ষে এই অন্যায় আইন প্রচলিত রহিয়াছে।"[২৫]

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীদের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে এক্ষণে সেই কথাই আমরা আলোচনা করিব। স্যার্ রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: "১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোম্পানীর শাসন-প্রথার গূঢ় উদ্দেশ্য যেমনটি ছিল এখনও ঠিক তেমনটিই রহিয়াছে। কোম্পানীর যে মূলধন ইংরাজ সরকার ঋণ করিয়া পরিশোধ করিলেন, সে ঋণের দায় ভারতবাসীর উপরই চাপিয়া বসিল। ভারতবাসীদের দেওয়া রাজকর হইতে

২৫। Sir R. C. Dutt: *India in the Victorian Age*, p.352

ইংরাজ সরকার এই ঋণের সুদ পাঠাইয়া থাকেন। ভারত-সাম্রাজ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ইংরাজরাজের অধিকারে আসিল, কিন্তু তাহার সমস্ত খরিদ-মূল্য জোগাইতে হইল এই হতভাগ্য ভারতবাসীদের !"[২৬]

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের সাধারণ অথবা সরকারী ঋণের পরিমাণ ছিল সাতকোটি পাউণ্ড অর্থাৎ একশত পাঁচকোটি টাকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একশত বৎসরব্যাপী শাসনকালে পুঞ্জীভূত এই বিরাট ঋণের টাকা সমস্তই ভারতের ঘাড়ে চাপাইলেন। অথচ কোম্পানী অন্যায়ভাবে তুইশত পঁচিশ-কোটি টাকা এই ভারতবর্ষ হইতেই আবার কর আদায় করিয়া লইয়া গেলেন, সুদের টাকা এ হিসাবে ধরা হয় নাই। ইহা ছাড়া কোম্পানী চীন, আফগানিস্থান প্রভৃতি ভারতের বাহিরে যে সব দেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারও সামরিক ব্যয় ভারতবাসীর নিকট হইতেই আদায় করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীর শাসনকার্যের অবসানকালে ভারতের নিকট ঋণবাবদ প্রাপ্য কিছুই ছিল না। ভারতের এই সরকারী বা জাতীয় ঋণ শুধু একটা কল্পনা-প্রসূত ব্যবস্থা। ন্যায্যভাবে বলা যাইতে পারে, কোম্পানী ভারত হইতে যে সব টাকা তাহাদের শাসনকালে লইয়া গিয়াছেন, হিসাবমত তাহার দরুণ একশত পঞ্চাশ কোটি টাকা ভারতেরই পাওনা থাকিয়া যায়। ইংরাজ সরকারের শাসনের উনিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতের এই জাতীয় ঋণ আবার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিগুণ হইয়া প্রায় তুইশত আট কোটি টাকায় পরিণত হইল। এই সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞীপদে অভিষিক্তা হইলেন। ইহার মধ্যে ষাটকোটি টাকা সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরাজ

২৬। R. C. Dutt : *Economic History of India*, p. X11.

সরকার ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ টাকাও ভারতের ঋণ বলিয়া তাঁহারা রাজকর হইতে তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ায় যে যুদ্ধ হয়, তাহার খরচ বাবদ ভারতবর্ষকে বহু পরিমাণ অর্থ দিতে হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় ঋণ তিনশত ছত্রিশ কোটি টাকায় দাঁড়াইল। খাস ইংরাজ সরকার অথবা লোকসান বহন করিবার দায়িত্ব লইয়া বিদেশী কোম্পানী নিয়োগ করিয়া তাহাদের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অংশে রেলপথগুলি নির্মাণ করা হইল। ভারতের এই ঋণ বেশীর ভাগ এ জন্যই সৃষ্টি হয়। অথচ এই রেলপথগুলির ভারতের নিজস্ব কোন প্রয়োজন ছিল না। বিদেশী সরকার তাহাদের ১৮৭৮ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ পরিচালনা করিবার জন্যই এই বিস্তৃত রেলপথ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষকে এই ঋণের সুদ দিতে হয় এবং প্রতিবৎসরে তাহার পরিমাণ বাড়িয়াই চলিতেছে। ইহা ছাড়াও রাজ্যশাসন ও সমর-বিভাগের সমস্ত রাজকর্মচারীর বেতন, বিরাট সৈন্যবিভাগের সমস্ত খরচ, অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীদের পেন্সন, এমন কি, লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া বিল্ডিং' নামক শাসন-প্রতিষ্ঠানটির সর্বশ্রেণীর কর্মচারী, চাপরাসী ও বেহারা প্রভৃতির মাহিনার টাকা পর্যন্তও ভারতবর্ষ সরবরাহ করিয়া থাকে। শুধু ১৯০১-১৯০২ খৃষ্টাব্দে এই এক বৎসরে ভারতের রাজস্ব হইতে মোট সাতকোটি তের লক্ষ চুরানব্বই হাজার দুইশত বিরাশী পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ খরচ করা হইয়াছে। এই বাৎসরিক খরচের অর্থ হইতে এক কোটি তিয়াত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার ছয়শত পঞ্চান্ন পাউণ্ড 'হোম চার্জ' (Home Charge) বলিয়া বিলাতে ব্যয় করা হইয়াছিল। এই হিসাবে ভারতে ইংরাজ কর্মচারীদের বেতনের যে অংশ বাঁচাইয়া বিলাতে পাঠান হইয়াছে, তাহা ধরা হয়

নাই। নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে ঐ সকল ব্যয়ের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে। যেমন,

(১) ঋণের সুদ ও ঋণের ব্যবস্থা বাবদ ...	৩,০৫২,৪১০	পাউণ্ড
(২) ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগের (Cable লাইনের) খরচ বাবদ ...	২২৭,২৮৮	পাউণ্ড
(৩) খাস সরকারী ও সরকারী দায়িত্বে পরিচালিত রেলওয়ের জন্য ঋণের সুদ প্রভৃতি বাবদ	৬,৪১৬,৩৭৩	পাউণ্ড
(৪) পাবলিক ওয়ার্কস্ (অনুপস্থিত কর্মচারী-দের ভাতা প্রভৃতি)	৫১,২১৪	পাউণ্ড
(৫) সমুদ্রে যাতায়াত ও ভারতকে যুদ্ধ-জাহাজের পাহারার জন্য খরচ ...	১৭৩,৫০২	পাউণ্ড
(৬) বিলাতে ভারতের জন্য সৈন্যবিভাগের ব্যয়বাবদ (পেন্সন সমেত) ...	২,৯৪৫,৬১৪	পাউণ্ড
(৭) সিভিল চার্জ (ভারত-সচিবের অফিসের খরচ, কুপার্সহিল কলেজ, পেন্সন প্রভৃতির জন্য ব্যয় বাবদ)	২,৪৩৫,৩৭০	পাউণ্ড
(৮) ষ্টোর্স (ভারতরক্ষার জন্য সাজ-সরঞ্জাম সমেত)	২,০৫৭,৯৩৪	পাউণ্ড
মোট	১৭,৩৫৯,৭০৫	পাউণ্ড

বেতনের তারতম্য অনুসারে কত খরচ হইয়া থাকে তাহারও একটি বিবরণ দেওয়া হইল : ইহাতে ভারতের সম্পদ কিরূপ লুট হইয়াছে বুঝা যাইবে।

	ভারতীয়	ইউরেশীয়ান	ইউরোপীয়ান	ভারতীয় কর্মচারী-গণের মোট বেতনের টাকা	ইউরেশীয়ান কর্ম-চারীদের মোট বেতনের টাকা	ইউরোপীয়ান কর্ম-চারীদের মোট বেতনের টাকা
শাসন ও বিচার-বিভাগ প্রভৃতি (Civil Department)	৫৫	১০	১২১১	৯৪৭,০০০	১৫১,০০০	২৫,২৭৪,০০০
সৈন্য-বিভাগ (Military Depart.)	১	১	৮৫৪	১২,০০০	১১,০০০	১৩,২৬৮,০০০
পাবলিক ওয়ার্কস্ (Public Works)	৩	৪	২৩৯	৩৩,০০০	৪৫,০০০	৩,৪১৫,০০০
অঙ্গীভূত লোকাল্ ফাণ্ড (Incorporated Local Funds)	১	...	৯	১০,০০০		১১৩,০০০
	৬০	১৫	২৩১৩	১,০০২,০০০	২০৭,০০০	৪২,০৭০,০০০

ইহা ব্যতীত যাঁহারা বার্ষিক বেতন বাবদ দশ হাজার অথবা তাহারও বেশী টাকা পাইয়া থাকেন, এমন একশত পাঁচজন কর্মচারী ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত। ইঁহারা সকলেই ইউরোপীয়ান। ইঁহাদের বেতনের মোট পরিমাণ ষোল লক্ষ আটাশ হাজার টাকা। যে সকল কর্মচারী বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা হইতে দশ হাজার টাকা মাহিনা পান তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা শাসনবিভাগে ৪২১, ইউরোপীয়ান ১২০৭ এবং ইউরেশীয়ান ৯৬। সমর-বিভাগে ২৫ জন ভারতীয়, ১৬৯৯ ইউরোপীয়ান এবং বাইশজন ইউরেশীয়ানও ঐরূপ বেতন পান। পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগে ভারতীয়দের সংখ্যা ৮৫ অথচ ইউরোপীয়ান এবং ইউরেশীয়ানদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৪৯ ও ৩ জন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য মিষ্টার আলফ্রেড্ ওয়েব্ এই বিষয়টি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছেন: "লণ্ডনে ভারত-সচিবের আফিসের সমস্ত খরচ বাবদ ভারতের জন্য বিলাতের গোরাসৈন্য সংগ্রহের খরচ বাবদ, শাসন ও সমর-বিভাগের যে সকল অবসরপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী বিলাতে আছেন তাঁহাদের পেন্সন বাবদ, যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারী ভারতে কার্যকালে বিলাতে নিজদেশে ছুটিতে আসেন তাঁহাদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতির জন্য, ভারত হইতে ইংলণ্ডে বে-সরকারীভাবে যে অর্থ আসিয়া পড়ে সেই বাবদ, ভারতের জন্য বিলাতে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার সুদ বাবদ এবং রেলওয়ে প্রভৃতির ইংরাজ অংশীদারগণের লভ্যাংশ বাবদ প্রতি বৎসরে ভারত হইতে বিলাতে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড হইতে তিনকোটি পাউণ্ড পর্যন্ত পাঠানো হয়।

যদি এই প্রকার দারুণ অর্থশোষণ মাত্র এক বৎসর অথবা শুধু কয়েক বৎসরের জন্যও চলিত, তাহা হইলেও তাহা ন্যায়সঙ্গত হইত

না। কিন্তু যেদিন হইতে ভারত ইংরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমানভাবে এই ভয়ঙ্কর শোষণকার্য চলিয়া আসিতেছে। এসম্বন্ধে মিঃ ব্রুক্স্ এ্যাডামস্ (Mr. Brooks Adams) লিখিয়াছেন: "১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়। এই পলাশীযুদ্ধের কিছু পরেই বাঙ্গালার লুণ্ঠিত ধনরত্ন বিলাতে আসিতে আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডেরও ধনৈশ্বর্য ক্রমাগত বাড়িয়া চলিল। নিশ্চয়ই অনুমান করা যায় যে, পৃথিবীর সূচনাকাল হইতে এপর্যন্ত ভারতের অর্থরাশি লুণ্ঠন দ্বারা যেভাবে ইংলণ্ড নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে, সেই অপরিমেয় অর্থ কোনও মহাব্যবসায়ী ব্যক্তি কখনও বাণিজ্যের দ্বারা লাভ করিতে পারে না।"[২৭]

দুর্ভাগা ভারতবর্ষ কী নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষিত হইল এবং তাহার ধনরত্ন জলস্রোতের ন্যায় ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে আসিয়া পড়িতে লাগিল! যে বিপুল ধনরাশি ওয়াটার্লু ও পলাশী এই দুই স্থানে যুদ্ধ ঘটিবার মধ্যবর্তী কালের ব্যবধানে (৫৭ বৎসরে) ভারত হইতে বিলাতে আসিয়াছিল তাহার পরিমাণ ৫০ কোটি পাউণ্ড হইতে ১০০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ পনের শত কোটি টাকা বলিয়া অনেকের অনুমান। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৪-এ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় 'লণ্ডন ওয়েষ্টমিনিষ্টার গেজেট' (*Westminster Gazette*) বলিয়াছেন: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর ভারতবর্ষ হইতে অনুমান পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড (সাত শত পঞ্চাশ কোটি টাকা) বিলাতে আসিয়াছে। যদি প্রামাণ্য সূত্র হইতে এই বিবরণ উদ্ধৃত করা না হইত, তাহা হইলে একথা আজ কে বিশ্বাস করিত?

২৭। Mr. Brooks Adams: *Law of Civilization and Decay* pp. 259-264.

ভারতবর্ষ আজ এত দরিদ্র কেন? দীর্ঘকালব্যাপী এরূপ নিদারুণ ও নির্মম শোষণে এমনভাবে সর্বস্বান্ত হইয়া কোন জাতি আর সজীব থাকিতে পারে?

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ভারতের উন্নতি বিধানের জন্য ইংলণ্ড আপনার প্রভূত অর্থ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসন ব্যাপারে ইংলণ্ড একটি পয়সাও ব্যয় করে নাই। এই ব্যাপারের সহিত ইংলণ্ডের উপনিবেশসমূহের শাসননীতির তুলনা করিয়া দেখুন। ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ বা গভর্ণমেণ্ট বলিলে একটি আমলাতন্ত্রকে বুঝায়। এই আমলাতন্ত্রের সভ্যবৃন্দ স্বয়ং বড়লাট, কার্যনির্বাহক সভার সভ্যগণ, জঙ্গীলাট, সমরবিভাগীয় সদস্য, পূর্তবিভাগীয় সদস্য, অর্থসচিব ও আইনবিভাগীয় সদস্য। কোনও ভারতবাসী আপনার দেশের প্রতিনিধি হিসাবে এই শাসনকার্য নির্বাহক সভার সদস্য হইতে পারে না। ভারতবাসীদের কৃষিকার্য, জমিসংক্রান্ত বিষয় তাহাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে কোনও দেশীয় প্রতিনিধি এই কার্যনির্বাহক সভার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। এপর্যন্ত অর্থাৎ (১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) একজন ভারতবাসীকেও এই সভায় দেখা যায় না। ইহার সভ্যগণের সকলেই উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী। ইঁহারা উচ্চহারে বেতন পাইয়া থাকেন এবং অবসর লইবার সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত পেন্‌সন ভোগ করেন।

ভারতের প্রত্যেক বৃহৎ প্রদেশে এক একটি করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে। এই সকল সভায় মাত্র কয়েকজন সভ্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের প্রবর্তিত আইন অনুসারে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রধান কার্য আইন প্রণয়ন করা। তত্ত্বীয় নিয়ম অনুসারে দেশের আয়ব্যয়ের উপর আইনসভার কর্তৃত্ব থাকিলেও কার্যতঃ তাহা নামে মাত্র আছে। স্বেচ্ছাচারমূলক শাসকগণ আয়-

ব্যয়ের সকল কার্য নির্ধারণ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যরা তাহার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বাদপ্রতিবাদ করেন মাত্র। কোনও প্রস্তাবিত বাজেট অদল বদল করা আইনসভার সদস্যের ক্ষমতার বহির্ভূত।

এই ব্যবস্থাপক সভায় পঁচিশ জন সদস্য আছেন। তাঁহাদের মধ্যে চারিজন সদস্যদের বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্র হইতে প্রেরণ করা হইলেও ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের নিয়োগ বড়লাটের ইচ্ছাসাপেক্ষ। তিনি আপন ইচ্ছামত যে কোন লোককে সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন। তবে তর্কের খাতিরে তিনি এই চারিজনকে নির্বাচিত সদস্য বলিয়া উল্লেখ করেন মাত্র। ঐ চারিজন সদস্য টেবিলের এককোণে বসিয়া থাকেন এবং অপরদিক থাকেন ইউরোপীয় সদস্যগণ। ভারতীয় সদস্যগণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক সদস্যই নিজ নিজ লেখা বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকেন। অপর সদস্যগণের মধ্যে কে কি বলিবেন, কেহই তাহা জানিতে পারেন না। না জানিয়াই তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া রাখেন। এ বিষয়ে রীতিমত আলোচনা অথবা বাদ-প্রতিবাদ কিছুই হয় না। বড়লাট ইচ্ছামত এই বক্তৃতার ধারা যে কোন দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন। ভারতীয় সদস্যগণ আইনসভায় যাহাই বলুন না কেন, কার্যতঃ তাহাতে কোনই ফল হয় না। তাঁহারা সভায় কোন বিষয়ে ভোট গ্রহণ করিতে বলিতে পারেন না। আইন সভার সিদ্ধান্তের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাবই নাই। প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থায় শাননবিধিপ্রণয়ন-সভায় ভারতবাসীরা প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন—এমন কথা বলা চলে না।

ভারত-সচিব ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার একজন সদস্য; ভারতে অবস্থিত বড়লাট তাঁহার অধীন একজন কর্মচারী। ভারত-সচিব শাসনাধীন

ভারতীয় প্রজাদের দেশ হইতে ছয় সহস্র মাইল দূরে ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। তাঁহার কার্যব্যাপারে সাহায্যকারী একটি সভা আছে; ইহাতে সদস্যের সংখ্যা দশজন। এই সদস্যগণ সকলেই অবসরপ্রাপ্ত য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। নিজেদের জাতির স্বার্থরক্ষার জন্যই ইহারা সচেষ্ট। এই সমগ্র শাসন ব্যাপারটিকে স্যার উইলিয়াম্ হাণ্টার্ oligarchy অথবা স্বল্পসংখ্যক শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অসংখ্য লোক শাসিত হইয়া থাকে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় প্রজাদের কোনও প্রতিনিধির স্থান নাই।

জারের অধীন সাম্রাজ্যবাদী পূর্বতন রাশিয়ার ন্যায় ভারতেও স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনপ্রণালী বর্তমান। কারণ, এই শাসনব্যাপারে শাসিত ত্রিশকোটি ভারতবাসীর ভোট দিবার কোন অধিকার নাই। ভারতবাসীরা ইহাতে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিতে পায় না। এই প্রচলিত শাসনব্যাপারের মূল উদ্দেশ্য ইংরাজজাতির স্বার্থরক্ষা। ভারতবাসীরা শুধু সর্বপ্রকারে অতিরিক্ত রাজস্বই দিবে অথচ কিছুতে তাহাদের হাত নাই। ভারত সরকার সূদান, মিশর, চীন, তিব্বত এবং অন্যান্য দেশে যুদ্ধের অভিযানে সৈন্য পাঠাইলেন। এই সকল দেশ ভারতের বাহিরে তথাপি এই সব দেশে যুদ্ধের জন্য বিপুল ব্যয়ভার জোর করিয়া দরিদ্র ভারতবাসীদের স্কন্ধে চাপান হইল।[২৮] ভূমিকর, আয়কর অথবা অন্যপ্রকার খাজনা বাবদ ভারতবাসীর নিকট যেভাবে অর্থশোষণ করা হয়, তাহা পৃথিবীর আর কোনও সভ্যদেশে হয় না।

স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট প্রকৃতপক্ষে জমির আয় বৃদ্ধির পথে বাধা প্রদান করেন। কৃষকগণের লাভের

২৮। Sir R. C. Dutt: *India in Victorian Age*, p. 604.

অন্তরায় সরকার স্বয়ং। যতবার জমির নূতন বন্দোবস্ত হয়, ততবারই সরকার নূতন করিয়া ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। ইহার ফলে ভারতের কৃষক সম্প্রদায় চিরকালই দারিদ্র্যে নিমজ্জিত থাকে। ইংলণ্ড, জার্মাণী, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশের শাসনকর্তৃপক্ষ প্রজাদের আয়বৃদ্ধির সহায়তা করেন। দেশের পণ্য বিক্রয়ের জন্য নূতন বাজারের ব্যবস্থা ও অর্থাগমের নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করেন। এক কথায় বলিতে গেলে ঐ সকল দেশে শাসনকর্তৃপক্ষ ও প্রজাসাধারণের স্বার্থ অভিন্ন। দেশবাসীর সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত দেশের সরকারও সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। ভারত-সরকার প্রজাদের জন্যে কোনও নূতন শ্রমশিল্পের ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা কোনও ধ্বংসোন্মুখ শিল্পকার্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করেন নাই। অপর পক্ষে যতবারই জমির নূতন বন্দোবস্ত হয়, ততবারই সরকার সুযোগ বুঝিয়া জমির উৎপন্ন শস্যের ক্রমবর্ধমান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।"[২৯]

তিনি আরও বলিয়াছেন: "ইংরাজ সরকার কর্তৃক স্থাপিত ভারতের ভূমিকর যে শুধু অত্যধিক তাহা নয়, পরন্তু অধিকাংশ প্রদেশেই ভূমিকরের হার অনির্দিষ্ট ও বরাবর এক ভাবের নয়। সর্বদাই তাহার পরিবর্তন হয়। ইংলণ্ডে ভূমিকরের হার ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে একশত বৎসর যাবৎ প্রতি পাউণ্ডে এক হইতে চার শিলিং অর্থাৎ বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৫ ভাগ হইতে ২০ ভাগ পর্যন্ত ছিল। এখন হইতে তৎকালীন রাজমন্ত্রী উইলিয়াম পিট্ ইহা অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করেন এবং হস্তান্তরিত সম্পত্তি পুনরায় কিনিয়া লওয়া যাইবে এবিষয়ে তাঁহার দ্বারা একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়।

২৯। Sir R. C. Dutt: *Economic History of India*, p. XI

ভারতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে ভূমিকর বাৎসরিক আয়ের শতকরা ৯০ ভাগ এবং উত্তর ভারতে ৮০ ভাগ ছিল।"৩০

এখনকার দিনে ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ মজুরীর কাজ করিয়া সারাদিনের পর মাত্র দুই হইতে চারি আনা পর্যন্ত উপায় করে। ইহাতেই তাহাদের সংসার পালন করিতে হয়। ইংরাজ সরকার দেশের প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার করিবেন এই আশায় ভারতবাসীরা বিগত বিশ বৎসর যাবৎ আন্দোলন করিতেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বৎসরে বৎসরে জাতীয় কংগ্রেস সভা আহ্বান করিয়া থাকেন; তাহা ছাড়া বৎসরের কোন কোন সময়ে বিশেষ সভাও আহূত হয়। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ই এই সকল সভার উদ্যোক্তা এবং তাঁহারাই উপস্থিত থাকিয়া সভার কাজ পরিচালনা করেন। ভারত সরকার প্রজাদের এই রাজনৈতিক আন্দোলনকে বন্ধ করিয়া দিবার জন্য কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নাই। তাহা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা নিজেদের সভায় অনুমোদিত ও সমর্থিত প্রস্তাবগুলি বড়লাট ও ভারতসচিবের কাছে পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী শাসকগণ এ বিষয়ে দেশবাসীকে কোনরূপে উৎসাহিত করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহারা রাশিয়ার জার্-শাসিত অত্যাচারমূলক শাসনপন্থারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে স্যার হেনরী কটন বলিয়াছেন: "জারশাসিত রাশিয়ার শাসনীতিকে সর্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারমূলক বলিয়া প্রতীতি জন্মিলেও ইহা ভারতের শাসননীতির ন্যায় এমন স্বৈরাচারপূর্ণ নয়।"

৩০। Sir R. C. Dutt: *Economic History of British India*, p. IX.

উগ্র আকাঙ্খায় মত্ত, হৃদয়হীন তরুণবয়স্ক ইংরাজ সিভিলিয়ানেরা ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া ভারতে কয়েক বৎসর অবস্থানকালে নিজেদের লোভ ও স্বার্থলালসা পূর্ণ করিতে ভারতবাসীদের অর্থ শোষণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষে তাঁহাদের কার্যকাল শেষ হইলে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া প্রভূত অর্থ স্বদেশে লইয়া যান এবং মহাবিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতে থাকেন। আমি আপনাদিগকে লর্ড কার্জনের শাসননীতির একটি উদাহরণ দিতেছি। ভারতে যত ইংরাজ বড়লাট আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে লর্ড কার্জন ভারতবাসীদের কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়। ভারতবাসীর দেশহিতকর সমস্ত কার্যে বাধা প্রদান ও তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ লর্ড কার্জনের আমলে ভারতশাসনের প্রধান কাজ ছিল। ভারতে কোন স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা অথবা ভারতবাসীর জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সে সময়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি ক্রমশঃ জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে দেখিয়া তিনি অবিলম্বে Official Secrets Act অর্থাৎ রাজ্যের গুপ্তমন্ত্র বিষয়ক একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইলেন। এই আইনের উদ্দেশ্য হইল—তাঁহার আমলে শাসন ও সমরবিভাগীয় সমস্ত ব্যাপারই গোপন রাখিতে হইবে। লর্ড কার্জন তিব্বতে এক অভিযানকারী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। যে সময়ে ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, চারিদিকে হাহাকার ও প্লেগের আক্রমণে যখন লক্ষ লক্ষ প্রজা অসহায়ভাবে মরিতে লাগিল, তখন তিনি দিল্লীনগরে মহাসমারোহে এক বিরাট দরবারের আয়োজন করিয়া বিপন্ন ও দরিদ্র প্রজাদের অর্থ জলের ন্যায় ব্যয় করিতে লাগিলেন। ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেম অথবা জাতীয় প্রেরণা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন

না। প্রাচীন রোমের কূটনীতি অনুসরণ করিয়া ভারতবাসীদের নানাভাবে বিচ্ছিন্ন ও একতাবিহীন করিয়া তিনি কুশাসনবিধি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শাসনকালেই ইংরাজের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির জন্য বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীকে সর্বরূপে বিচ্ছিন্ন করা। এমন হঠকারিতা ও স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া তিনি এই সকল কার্য করিলেন যে, সাতকোটি বাঙালীর সম্মিলিত আবেদন তাঁহার নিকট মোটেই গ্রাহ্য হইল না। তাহার ফলে বাঙালীরা ইংলণ্ডজাত সমস্ত পণ্যদ্রব্য বর্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমস্ত বাঙ্গলায় এই স্বদেশী আন্দোলন দেখিতে দেখিতে প্রচণ্ড দাবানলের মতন ছড়াইয়া পড়িল। দেশবাসী সকলে একমত হইয়া বঙ্গবিভাগ রোধ করিবার জন্য বড়লাট ও ভারতসচিবকে আবেদন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই আবেদনে ভারতপ্রবাসী ও ইংলণ্ডবাসী কোনও উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। যাহা হউক, আশা করা যায় এই বিদেশী পণ্য-বর্জনের পরিণাম হইতে স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধিকারপ্রমত্ত ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বিচারবুদ্ধি জাগ্রত হইবে।

ভারতবাসীরা রাজভক্ত ও শান্তিপ্রিয় জাতি। কিন্তু দেড়শত বৎসর যাবৎ বিদেশী ও সহানুভূতিহীন শাসকদের শোষণে এক্ষণে তাঁহারা সর্বহারা ও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবাণী (The Queen's Proclamation in 1857) একদিন না একদিন কার্যে পরিণত হইবে—এই আশা ভারতবাসীরা যদি পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে এতদিন ভারতে যে ভয়ানক বিপ্লব ও অশান্তির আগুন দেখা দিত তাহাতে আর সন্দেহ কি! ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহের বিভীষিকা দূর হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিম্নলিখিত ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইল ঃ

"আমরা বৃটিশশাসিত ভারতীয় উপনিবেশের আর বিস্তার প্রার্থনা করি না। অপর কেহ আমাদের রাজ্যে অথবা অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহা বরদাস্ত করিব না, এবং আমরাও কাহারও রাজত্বে বা অধিকারে হস্তক্ষেপ করিব না। আমরা যেমন আমাদের অধিকার, সম্ভ্রম ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব তেমনি এদেশীয় রাজাদের সম্ভ্রম, সম্মান ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা আমরা কর্তব্য বলিয়া মনে করিব। আমরা আশা করি, দেশীয় রাজাগণ এবং আমাদের প্রজাবৃন্দ শান্তি ও সুশাসনের ফলে ক্রমশঃ সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন।

"আমাদিগের সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রজাদের প্রতি যে কর্তব্য পালন করিয়া থাকি, সেই কর্তব্য আমরা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রজাদের উপরেও সমানভাবে পালন করিব। আশা করি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আশীর্বাদে সেই সকল কর্তব্য বিশ্বস্ততা ও বিবেকনিষ্ঠার সহিত নিষ্পন্ন করিতে আমরা সমর্থ হইব।

"খৃষ্টান ধর্মে আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞতার সহিত এই ধর্মগত শান্তি আমরা অন্তরে অনুভব করি। তাহা সত্ত্বেও অন্যধর্মাবলম্বী আমাদের প্রজাগণের উপর আমাদের নিজস্ব ধর্ম চালাইবার জন্য কোন প্রকার বলপ্রয়োগ করিব না। আমাদের রাজশক্তির ইহাই অভিপ্রায় ও সম্মতি যে, কোনও ব্যক্তি অন্য ধর্মগ্রহণ অথবা নিজের ধর্ম পালন করিলে তাহার জন্য অনুগ্রহ লাভ অথবা নির্যাতন ভোগ করিবে না। বরং সকলেই সমানভাবে আইনের নিরপেক্ষ আশ্রয় পাইবে। রাজকর্মচারীদের প্রতি আমাদের কঠোর আদেশ যে, তাঁহারা আমাদের কোন প্রজার ধর্মবিশ্বাসে বা পূজা উপাসনায় হস্তক্ষেপ বা বাধা দিতে পারিবেন না। অন্যথায় তাঁহারা রাজ-অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে অসন্তোষের পাত্র হইবেন।

"আমরা ইহাও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের প্রজাদের মধ্যে যাহার যে জাতি, ধর্ম অথবা বর্ণ হউক না কেন, যদি তাহার উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মদক্ষতা কর্তব্যসম্পাদনের সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় না দিয়া তাহাকেই রাজকার্যে নিযুক্ত হইবার জন্য সমস্ত সুবিধা দিতে হইবে (কিন্তু লর্ড কার্জন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জাতিগত নিকৃষ্টতার জন্যই উচ্চকর্মে নিযুক্ত হইবার কোন যোগ্যতাই ভারতবাসীদের নাই।)

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহার রাজ্যাভিষেকের দিনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণাবাণীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই পবিত্র অনুজ্ঞা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান্ আমলাতন্ত্র প্রতিপালন করিয়াছেন কি ? ইহার উত্তরে আমরা বলিব—না।

ভারতবাসিগণ এক্ষণে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আপনাদের প্রতিনিধিগণকে পাঠাইতেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের একটি বাণীর সত্যতা তাঁহারা এক্ষণে মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই বাণীটি এই ঃ "যখন কোন জাতি আপনাদের দেশ আপনারাই শাসন করেন, তখনই তাহার সার্থকতা ও সত্যতা বুঝা যায়। কিন্তু যখন এক জাতি অন্য একজাতির উপর শাসনকার্য চালায় তখন সেই শাসনকার্যের কোনই অর্থ হয় না। বিজয়ী জাতি বিজিতজাতিকে শুধু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত করে। পরাধীন জাতিদের দেশ বিজয়ী জাতির অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্র ভিন্ন আর কিছু নয়। বিজয়ী জাতি পরাধীন জাতির অধিবাসীদের গরু মহিষ প্রভৃতি পশুর ন্যায় দোহন করিয়া শুধু নিজেদের ও নিজের জাতির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিই সাধন করিয়া থাকে।"

ভারতবাসীরা এক্ষণে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী শাসক জাতির প্রচণ্ড তরবারি যখন সর্বদা তাহাদের

মাথার উপর ঝুলিতেছে, তখন তাহাদের ন্যায় পরাধীন জাতির পক্ষে ইহা এক দারুণ সমস্যার ব্যাপার। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অধিবাসীরা যদি জানিতে চান যে, তাঁহাদের দেশে ইংরাজশাসন চলিতে থাকিলে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ভারতবাসীদের বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন।

ইংলণ্ডবাসী ভারতবন্ধু মিষ্টার রেডি (Mr. Reddy) যথার্থই বলিয়াছেন: "খৃষ্টান মিশনারীদের মারফতে ইংলণ্ড ভারতবাসীদের জন্য পরলোকে সোনার সিংহাসনের ব্যবস্থা করিতেছেন বটে, কিন্তু এই জগতে তাহাদিগকে সামান্য একটা কাঠের চেয়ার দিতেও তাঁহারা মোটেই রাজি নহেন।"[৩১]

৩১। *India*, Oct. 13, 1905.

পঞ্চম অধ্যায়

॥ ভারতে শিক্ষানীতির বিবর্তন ॥

ভারতের শিক্ষানীতিকে চারিটি বিভিন্নযুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, প্রাক্-বৌদ্ধযুগ অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আগেকার কাল। দ্বিতীয়, বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও প্রভাবের সময় অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বৎসর হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত। তৃতীয়, মুসলমান রাজত্বকাল ও চতুর্থ ব্রিটিশ-শাসনের অধীন বর্তমান যুগ।

কোনও জাতির শিক্ষার আদর্শ কি জানিতে হইলে তাহার সভ্যতার সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কারণ কোনও জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার সহিত তাহার শিক্ষার আদর্শও সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে, ইহাদের একে অন্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পূর্ব আলোচনা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বৈদিক যুগ হইতেই হিন্দু সভ্যতার সূচনা। ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, সেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় হিন্দুগণ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারি বেদ সংকলন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্-সমূহ এই বেদের অন্তর্গত। এগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় রচিত এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র। অন্যান্য জাতিদের ন্যায় হিন্দুরাও তাঁহাদিগের বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করেন। লিখিবার কৌশল প্রণালী উদ্ভাবিত হইবার বহুপূর্বে এই চারি বেদ আচার্যদিগের নিকট হইতে শিষ্যেরা শ্রবণ, মনন ও কণ্ঠস্থ করিয়া মুখে মুখে তাহা শিক্ষাদান ও প্রচার করিতেন। সেই সুদূর অতীত কালে এই সকল বেদকে অধ্যয়ন করা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-

বংশজাত বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইত।[১]

প্রাচীন যুগে হিন্দুদের জীবনধারা চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগ ছাত্রাবস্থা। আর্যবংশীয় বালকেরা আট হইতে বার বৎসর বয়সের মধ্যে বিদ্যারম্ভ করিতেন। ছাত্রাবস্থায় আর্যবালকদের গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করিতে হইত। বর্তমান যুগে যেমন প্রত্যেক সভ্য ও স্বাধীন দেশে ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছাত্রাবাসে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসর বাস করেন, প্রাচীন ভারতেও তেমনি বিদ্যাশিক্ষার্থী বালকেরা আপনাদের গৃহ হইতে চলিয়া গিয়া কয়েক বৎসর গুরুগৃহে বাস করিতেন। এক, দুই, তিন অথবা চারি বেদকে সমগ্রভাবে অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রাচীনকালের বিদ্যার্থীরা গুরুর সহিত তাঁহার আশ্রমে বার, চব্বিশ, ছত্রিশ এমন কি আটচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত বাস করিতেন। আচার্য উপাচার্য ও অন্যান্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের গৃহে ফিরিবার সময়ে ছাত্রেরা যথোপযুক্ত উপহার-দ্রব্য গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপে দান করিতেন। হিন্দুপ্রথা অনুসারে কোনও শিক্ষক বা আচার্য অর্থের বিনিময়ে বিদ্যা বিক্রয় করিতে পারেন না অথবা তাহার জন্য কোনও প্রকার বেতন লওয়া শিক্ষকের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রদের গুরুদক্ষিণা দান করার বিধি সে সময়ে প্রচলিত ছিল। গৃহে ফিরিয়া ছাত্রগণ বিবাহের পর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। এই সকল ছাত্রদের কেহ কেহ

১। পরে ব্রাহ্মণ্যযুগে বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণই একমাত্র বেদ পড়িবেন, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের জন্য পুরাণপাঠে অধিকার এবং শূদ্রের পক্ষে এই তিন বর্ণের সেবা-শুশ্রূষা নির্দিষ্ট হইল।

আবার অধ্যয়নকাল শেষ হইলেও গৃহে ফিরিতেন না। আকুমার ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বেদাদি শাস্ত্র ও বিবিধ জ্ঞানের অনুশীলনে ও তপস্যায় তাঁহারা সমস্ত জীবন নিয়োজিত করিতেন।

বেদবিধিনির্দিষ্ট বিবিধ যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জ্ঞান অর্জন, নৈতিক চরিত্র গঠন এবং যথাযথ সাধনার দ্বারা যাহাতে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বেদের সহিত ছাত্রগণকে ছয় বেদাঙ্গও যেমন শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ[২] অধ্যয়ন করিতে হইত। ধর্মশাস্ত্র বিশেষ করিয়া বেদ অধ্যয়নের জন্য এই বেদাঙ্গ সকলে পারদর্শিতা লাভের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ছয় বেদাঙ্গের প্রথম অঙ্গ শিক্ষা অর্থাৎ স্বর, লয় ও মাত্রার সহিত বেদ মন্ত্রাদির যথাযথ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ পদ্ধতি (স্বরবিজ্ঞান)। দ্বিতীয় অঙ্গ ছন্দ অথবা শব্দের মাত্রা ও গতি পদ্ধতি। বেদের সুক্তগুলি বিবিধ ছন্দে রচিত। এইগুলি বিশুদ্ধভাবে আবৃত্তি ও গান করিতে হইলে ছন্দের মাত্রা ও উচ্চারণ-বিধি প্রভৃতি জানা একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের পক্ষে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্য বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব হয় না। কারণ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের জিহ্বা সেই প্রকারে অভ্যস্ত না থাকায় তাঁহারা সংস্কৃত শব্দ ঠিকভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। এজন্য বেদাধ্যায়ী হিন্দুছাত্রদের স্বর-উচ্চারণ-

২। "তথা হি শিক্ষা স্বরবর্ণোচ্চারকং শাস্ত্রম্। কল্পো বেদবিহিতকর্মণামানুর্বেণ কল্পনাশাস্ত্রম্। ব্যাকরণং শব্দবোধকমগ্লেচ্ছত্বকারকং শাস্ত্রম্। নিরুক্তং পদবিভাগমন্ত্রার্থদেবতানিরূপণার্থং শাস্ত্রম্। ছন্দোগায়ত্র্যাদিছন্দসাং জ্ঞানশাস্ত্রম্।"—শিক্ষাপ্রকাশঃ

প্রণালী, ছন্দ, মাত্রা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্পন্ন ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে হয়। প্রায় ১৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে হিন্দুরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসম্পন্ন সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও গ্রীকভাষার ব্যাকরণই পৃথিবীর অন্য সকল ভাষার ব্যাকরণ অপেক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহার পর বেদাঙ্গের চতুর্থ অঙ্গ নিরুক্ত। ইহাতে প্রত্যেক শব্দের অর্থ এবং একই শব্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কেমন করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা দেখানো হইয়াছে। ইহার পর কল্প। শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র, গৃহ্যসূত্র এবং সুল্বসূত্র এই চারিভাগে কল্প বিভক্ত। শ্রৌতসূত্রে যাগ, যজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতির নিয়মসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ধর্মসূত্রে নাগরিকদের কর্তব্য, গৃহ্যসূত্রে গৃহস্থ-ব্যক্তিদের কর্তব্য এবং সুল্বসূত্রে যজ্ঞের বেদী নির্মাণ সম্বন্ধে জ্যামিতি বা রেখাবিজ্ঞান ও ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত প্রভৃতি ক্ষেত্র বিষয়ক আলোচনা করা হইয়াছে। সর্বশেষ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে শুভদিন, লগ্ন, ক্ষণ প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্য ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইত। জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে বেদজ্ঞান অসম্ভব এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও সম্পন্ন করা যায় না। এইজন্য বেদে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক নানা নির্দেশ ও ইঙ্গিত দেখা যায়।

এই বেদশাস্ত্র ও বেদাঙ্গ অধ্যয়নই প্রাচীন হিন্দুদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভারতীয় এই তিন উচ্চবর্ণেরাই এই সমস্ত শিক্ষালাভে অধিকারী ছিলেন। গুরুগৃহে থাকিয়া বিনা বেতনে একান্তে শিক্ষালাভ করা ছাড়াও প্রকাশ্য-ভাবে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ও প্রথা সে সময়ে প্রচলিত ছিল। বিদ্যোৎসাহী রাজা ও মহারাজাদের সভায় সে সময়ে বহু পণ্ডিত থাকিতেন এবং এই জন্যই প্রাচীন ভারতে রাজসভাগুলি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে সভাপণ্ডিতগণ বিনা বেতনে

বহু ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতেন। ইহা ছাড়া সে সময়ে নানাস্থানে শিক্ষার নানা প্রতিষ্ঠান ও পরিষদ বর্তমান ছিল। এগুলি এখনকার দিনের পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরই অনুরূপ। ডক্টর ডব্লিউ. আই. চেম্বারলেন, পি-এইচ্. ডি. লিখিয়াছেন: "খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৈদিক যুগ হইতে ব্রাহ্মণযুগে হিন্দুদের ধর্মভাবের পরিণতি হইতেছিল, সেই সময়ে ভারতের রাজসভাগুলি প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। * * ইহার কিছুকাল পরে ১০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বহু শিক্ষা-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হয়, এই পরিষদগুলি এখনকার দিনের কলেজের মতন।[৩] জনসমাজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও পণ্ডিতরাই প্রবর্তন ও স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্ররা সেই শিক্ষায়তনের গুরুপল্লীতে আচার্য ও অধ্যাপকদিগের সহিত একই বাটীতে বাস করিতেন এবং গুরুর সাংসারিক কার্যের সহায়তার বিনিময়ে বিদ্যা, নিজেদের আহার ও বস্ত্রাদি পাইতেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার তাঁহার *History of Sanskrit Literature* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন: "দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও আইনবিদ্যায় সুপণ্ডিত একুশজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপককে লইয়া এই সকল পরিষদের প্রত্যেটির শিক্ষকমণ্ডলী গঠিত হইত। কোন কোন সময়ে তিন চারি জন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ একত্র হইয়া গ্রাম্য এক একটি ক্ষুদ্র শিক্ষা-পরিষদ্ গঠন করিতেন।"[৪]

উপনিষদেও আমরা এই প্রকার বিশ্ববিদালয়ের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদানপ্রণালীর উল্লেখ দেখিতে পাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে

৩। W. I. Chamberlain, Ph. D.: *Education in India*, p. 20.

৪। "শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম; স আজগাম জৈবলিং প্রবাহণং পরিচারয়মাণং*।"—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৬।২।১

বর্ণিত আছে যে, বিদ্যালাভের জন্য শ্বেতকেতু পাঞ্চাল রাজ্যের শিক্ষাপরিষদে গমন করিয়াছিলেন। এই শিক্ষায়তনগুলিতে বেদশাস্ত্র দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, হিন্দুদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিবিধ প্রকার আইন, কৃষি, বিষয়সম্পত্তি, লগ্নি, উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির বিভাগ প্রভৃতির বিধিনিষেধ সম্বন্ধীয় বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। আজ পর্যন্ত ইংরাজশাসনকালেও এই সকল নিয়ম-কানুন অনুসারে হিন্দুসমাজ চলিতেছে। ইংরাজশাসকগণ এই হিন্দুবিধিগুলির কোনও পরিবর্তন করিতে অথবা ইহাদের অপেক্ষা আরও উচ্চতর আইন প্রণয়ন বা প্রচলন করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে আমরা কোনও অতিরঞ্জন করিতেছি না। যে সকল ছাত্র আইন বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রোম্যান ও ইউরোপীয়ান আইনশাস্ত্র অনেক বৎসর অধ্যয়ন করার পর অবশেষে হিন্দু আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের অধ্যয়ন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না।

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, খৃষ্টপূর্ব চৌদ্দ শতাব্দী হইতে ছয় শতাব্দীর মধ্যে প্রাক্-বৌদ্ধযুগে হিন্দুগণ আপনাদের ষড়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, সংখ্যাশাস্ত্র, মহর্ষি কপিল উদ্ভাবিত সাংখ্যদর্শন প্রতিপাদিত বিশ্বজগতের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ, অধ্যাত্মবিজ্ঞান, কণাদের বৈশেষিকদর্শন, ও বেদান্তদর্শন—এ সমস্তই ষড়দর্শনের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে হিন্দুছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা শিক্ষাপরিষদ্‌সমূহে এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, দশমিক ভগ্নাংশ, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাও বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব হইতে শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই অতি প্রাচীনকালে হিন্দুরা এই সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রকে কি করিয়া আয়ত্ত

করিয়াছিলেন, ইহাতে আপনারা বিস্মিত ইহতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ করিয়াছে যে, ভারতবর্ষের বৈদিক যুগের ধর্মমত হইতেই দর্শন ও বিজ্ঞানের এই সকল বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদে উল্লিখিত বৈদিকযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বেদী রচনা করিবার নিয়মপদ্ধতি হইতে যে শাস্ত্র উৎপত্তি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহাই জ্যামিতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃত্ত, ত্রিভুজ, অথবা বৃত্তের অভ্যন্তরে ত্রিভুজ প্রভৃতির অঙ্কন উল্লেখ আছে। বৌদ্ধযুগে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় যখন জ্যামিতির ব্যবহার আর চলিত না, তখন বীজগণিত সেইস্থান অধিকার করিল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন: "বীজগণিতের বৈজ্ঞানিক নীতি ভারতে যেভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, বাস্তবিকই তাহা উল্লেখযোগ্য। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণায় ও জ্যামিতিক প্রামাণ্য বিষয় প্রতিপাদন ব্যাপারে বীজগণিতের প্রয়োগ হিন্দুদের এক বিশেষ উদ্ভাবনীশক্তির পরিচায়ক। এই বিষয়ে বীজগণিতের পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ-নৈপুণ্য আধুনিক ইউরোপীয় গণিতজ্ঞগণেরও বিস্ময়পূর্ণ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।"[৫]

ইহা ব্যতীত বৌদ্ধযুগের বহুকাল পূর্বে রচিত প্রাচীন হিন্দুদের জাতীয় ইতিহাস এবং তাঁহাদের বিভিন্ন দর্শন ও বিজ্ঞানের সারতত্ত্ব রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই মহাকাব্য ভারতে সকল শ্রেণী ও জাতির হিন্দু নরনারীগণ পাঠ করেন। যাহারা বেদাদি শাস্ত্র পাঠে অযোগ্য ও অসমর্থ তাহাদের জন্যই এই দুইটি মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। লিখিবার কলাকৌশল

৫। Sir R. C. Dutt : *Civilization in Ancient India*' Vol. II. p. 246.

উদ্ভাবিত হইবার বহুকাল পূর্ব হইতেই বেদ এবং হিন্দুদের অন্যান্য দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল। এই সমস্ত শত শত বিপুল কলেবর গ্রন্থ আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি। শুধু স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে ও মুখে মুখে গুরুপরম্পরায় এগুলি যে শিক্ষাদান ও প্রচার করা হইত তাহা পাশ্চাত্ত্যবাসীরা কি বিশ্বাস করিতে পারেন? পুরুষানুক্রমে এই সমস্ত বিরাট ও দুরূহ বিষয় মুখে মুখেই শিক্ষা দেওয়া হইত। তখনকার দিনে ভারতবাসীদের কি আশ্চর্য স্মৃতিশক্তিই না ছিল! মহাভারতে সর্বশুদ্ধ একলক্ষ শ্লোক আছে। আমেরিকা যাইবার পূর্বে আমি একজন ব্রাহ্মণবংশীয়া মহিলাকে দেখিয়াছিলাম—তিনি মহাভারত কাব্যটির সমস্ত শ্লোক আগাগোড়া মুখস্থ বলিতে পারিতেন। এখনও ভারতবর্ষে এমন অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন যাঁহারা কোন শাস্ত্রগ্রন্থ ও তাহার ভাষ্যসমূহ না দেখিয়া অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন। হিন্দুদের সমস্ত শাস্ত্রই সর্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। পরে কোন কোন প্রদেশের কথিত ভাষায় ক্রমশঃ এই শাস্ত্রগুলির অনুবাদ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এই কথিত প্রাদেশিক ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় একশত পঞ্চাশ। এই কথিত ভাষার সাহায্যেই ভারতের জনসাধারণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে। নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও কথকতা প্রভৃতি হইয়া থাকে। জনসভায় কোনও সদ্‌গ্রন্থ বা শাস্ত্রের মূল সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া পরে কথিত ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করার এই প্রাচীন রীতি এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। যাহারা লিখিতে বা পড়িতে জানে না এই প্রকার লোকেরা কথকতা অথবা অন্য কোন শাস্ত্রপাঠের সভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিয়া ধর্ম ও নীতি শিক্ষা করে।

প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে আয়ুর্বেদ অর্থাৎ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিবার জন্য চিকিৎসা-বিদ্যালয় ছিল। 'আয়ুঃ' শব্দের অর্থ জীবন এবং 'বেদ' অর্থে বিদ্যা বুঝায়। অতএব আয়ুর্বেদ বলিতে 'জীবন-বিজ্ঞান' বুঝিতে হইবে। হিন্দুদের সমগ্র চিকিৎসাশাস্ত্র অথবা ভেষজবিজ্ঞান এই আয়ুর্বেদের অন্তর্গত। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অপেক্ষাও ইহা প্রাচীনতর। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম উদ্ভাবক হিপোক্রেটসের (Hippocrates) অবস্থিতি কালেরও (খৃষ্টপূর্ব চারশত বৎসরের) অনেক পূর্বে এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র ভারতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এমন কি প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হিন্দুদের যাবতীয় ঔষধ প্রস্তুত ও তাহাদের ব্যবস্থা দেওয়া হইত। যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে এই ঔষধগুলি তৈয়ারী এবং চিকিৎসার কার্যে ব্যবহার করা হইত। যাহাতে ছাত্রেরা এই প্রকারে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে সেই নিমিত্ত চিকিৎসাবিদ্যার জন্য উচ্চশ্রেণীর বিদ্যায়তন-সমূহ ছিল। বৌদ্ধযুগে হিন্দুদের এই চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ঔষধাবলীর সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপ্রসূত অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ পুস্তক রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 'চরকসংহিতা' ও 'সুশ্রুতসংহিতা' সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থগুলি অল্পকালের মধ্যে দেশে ও বিদেশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল এবং আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়া খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ্-অল্-রসিদের রাজত্বকালে আরবদেশবাসীদের নিকটে সেই গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে পরিচিত হইল। আজও পর্যন্ত এই সব গ্রন্থ হিন্দুদের কবিরাজী চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রধান অবলম্বন হইয়া আছে। এই উভয় গ্রন্থেই শারীরবৃত্ত (physiology) এবং শারীরস্থান বিজ্ঞান (anatomy) সম্বন্ধে ব্যাপক ও গভীরভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই গ্রন্থগুলিতে রোগলক্ষণ, রোগনির্ণয়, রোগের নানাবিধ নিদান এবং

তাহাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাষা প্রাচীন হইলেও যে সময়ে জগতের অন্য কোনও দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান ছিল না, তখন সেই অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাধি চিকিৎসার উদ্ভব হইয়াছিল।

রসায়ন-বিজ্ঞানেও (chemistry) হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই পরিচিত ছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন: "ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কেন না রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিবিধ যৌগিক দ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য বহু মৌলিক পদার্থ তখনকার সময় হইতেই ভারতবর্ষে পাওয়া যাইত। পশ্চিম ভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে খনিজ লবণ (rock-salt) ব্যবহার করা হইত। তিব্বত হইতে সোহাগা আনা হইত। সোরা এবং সোরা ও গন্ধকের সংমিশ্রণের দ্বারা লবণক্ষার সহজেই উৎপন্ন করা যাইত। কচ্ছদেশে ফটকিরি তৈয়ারী হইত। হিন্দুগণ নিশাদল (sal ammonia) প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিও জানিতেন। স্মরণাতীত কাল হইতেই চূণ, কাঠ-কয়লা, গন্ধক প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার করার পদ্ধতি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যাবতীয় ক্ষারদ্রব্য (alkalies) এবং অম্ল (acids) পদার্থগুলিও তাঁহারা বহুশতাব্দী পূর্ব হইতেই ব্যবহার করিতে জানিতেন। এই সকল পদার্থের ব্যবহার আরববাসিগণ আবার হিন্দুদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন কোন ধাতব পদার্থের রোগনাশক শক্তিও হিন্দুদের বিশেষভাবে জানা ছিল। রসাঞ্জন (antimony) এবং শঙ্খবিষ (arsenic) তাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন। তাহা ছাড়া পারদ, হরিতাল প্রভৃতি অন্যূন নয়টি ধাতুর সংমিশ্রণে তাঁহারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। লৌহ, তাম্র, সীসা, টিন, দস্তা প্রভৃতি ধাতুজাত অম্লজানের রাসায়নিক

ক্রিয়ার প্রভাবে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থসমূহের এবং সীসার ব্যবহারও তাঁহাদের জানা ছিল। লৌহ, তাম্র, রসাঞ্জন (antimony), পারদ এবং হরিতালের সহিত গন্ধকের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ তাঁহারা ঔষধ তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন। ইহা ব্যতীত সাল্‌ফেট অফ্ কপার (তুঁতিয়া), দস্তা এবং লৌহের ব্যবহারও তাঁহারা জানিতেন। ডায়াসিটেট অফ্ কপার এবং কারবোনেট অফ্ লেড য়্যাণ্ড আয়রণ্ নামক যৌগিক পদার্থগুলিও তাঁহারা ব্যবহার করিতেন।"[৬]

ডক্টর রয়লি (Dr. Royle) তাঁহার *Hindu Medicine* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ "প্রাচীন গ্রীক ও রোম্যানগণ ধাতুজাত ঔষধগুলির বাহ্যপ্রয়োগ করিতে জানিলেও সাধারণের বিশ্বাস যে, আরববাসিগণই এই সকল ধাতুজাত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা সর্বপ্রথম প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাগ্রন্থে দেখিতে পাই যে, হিন্দুরাই সর্বপ্রথম বহুপ্রকার ধাতুজাত ঔষধসমূহের সেবনের ব্যবস্থা করিয়াছেন"[৭]

ইতিহাস হইতে জানা যায় গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডার আপনার শিবিরে কয়েকজন বিচক্ষণ হিন্দু চিকিৎসককে সদা-সর্বদা রাখিতেন। যে-সমস্ত কঠিন ব্যাধি গ্রীক চিকিৎসকগণ সারাইয়া দিতে পারিতেন

৬। Sir R. C. Dutt: *Civilization in Ancient India*, Vol II. p. 254.
প্রাচীন ভারতের রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা গবেষণা ও উন্নতি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্যপূর্ণ ইতিহাস জানিতে হইলে মনীষী বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত *Hindu Chemistry* নামক গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেরই পাঠ করা উচিত।

৭। Royle: *Hindu Medicine*. p. 45.

না সে-সমস্ত রোগ হিন্দু চিকিৎসকগণ আরোগ্য করিতেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মুসলমান বাদশাহ হারুণ-অল্-রসিদ্ আপনার রাজসভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ২৬০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দের সমসাময়িক প্রাচীন কালে সুবিখ্যাত বৌদ্ধসম্রাট অশোক শুধু নরনারী ও শিশুদিগের জন্যই নয় পরন্তু পশুদেরও চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে প্রবাসকালে গ্রীক রাজদূতরূপে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থানকারী মেগাস্থিনীস্ দেখিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন বর্ণের ও অবস্থার হিন্দুদের জন্য নানাপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। ইহাদের মধ্যে যে বিদ্যালয়গুলি ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেগুলিতে পুরোহিত ও ধর্মশিক্ষকরূপে ছাত্রদিগকে গঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের বিধি ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা প্রদান করা হইত। ক্ষত্রিয়-জাতিদের বিদ্যালয়গুলিতে প্রধানতঃ যুদ্ধবিদ্যাই শিক্ষা দিবার বিধি ছিল। বৈশ্যবালকেরা ব্যবসায়-বিদ্যা ও শ্রমশিল্প শিক্ষা-প্রদানের বিদ্যালয়ে যাইত। আর শূদ্রজাতীয় বালকেরা হাতের কাজ শিখিবার বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইত।

বৌদ্ধযুগে এবং মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত বিবিধ বিজ্ঞানে ও দর্শনের নানা বিভাগে হিন্দুদের সংস্কৃতি বিপুল উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সুবিখ্যাত হিন্দু জ্যোতির্বিদ্ আর্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। বৈজ্ঞানিক মনীষার জন্য তাঁহাকে 'ভারতের নিউটন' নামে অভিহিত করা হয়। আর্যভট্ট বীজগণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সমগ্র জগতের মধ্যে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন

যে, পৃথিবীই আপন মেরুদণ্ডের (axis) উপর নির্ভর করিয়া আবর্তিত হইতেছে (সূর্য নয়।) *Jewish Encyclopaedia* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থমালায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত লিখিয়াছিলেন ঃ "পৃথিবী গোলাকার এবং তাহা আপন মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া সদা-সর্বদা আবর্তিত হইতেছে—এই মতবাদের আবিষ্কার কোপার্ণিকাসকে (Copernicus) চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে কোপার্ণিকাসের বহুপূর্বেই এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সত্য হিন্দুদের নিকট সুপরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিন্দুরা এই বৈজ্ঞানিক সত্য আর্যভট্টের নিকট হইতে শিক্ষা করেন।"[৮]

ইহা ছাড়া সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ কি তাহাও আর্যভট্ট আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম মাধ্যাকর্ষণের (law of gravitation) রহস্য আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর পরিধির নির্ভুল পরিমাণ তিনি (আর্যভট্ট) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ্ বরাহ মিহির ৫০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক ইনি যে সব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে 'বৃহৎ সংহিতা' নামক গ্রন্থ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিপুলকলেবর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থখানিতে প্রাকৃতিক তথ্যসম্বন্ধে বিশদভাবে নানাপ্রকার বিবরণ দেওয়া আছে। ব্রহ্মগুপ্ত হিন্দুদের প্রখ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ্‌দের মধ্যে অন্যতম। ৬২৮ খৃষ্টাব্দ ইঁহার অভ্যুদয় কাল। ইনি স্বরচিত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থে গ্রহ ও উপগ্রহগণের স্থান নির্দেশ এবং চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণসম্বন্ধে নানা বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে ইঁহার রচিত একখানি বহু মূল্যবান গ্রন্থ

৮। *Jewish Encyclopaedia.* Vol. XII, p. 689.

আছে। আজ পর্যন্ত বারাণসী ও অন্যান্য স্থানে বহু হিন্দু-মান-মন্দিরের (Observatory) ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। এই সময়ে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হিন্দুসম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল। সাহিত্য-সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই সময় চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সহিত রোম্যান সম্রাট আগাষ্টাস্ সিজার, ইংলণ্ডের মহানুভব রাজা আলফ্রেড, ফরাসী সম্রাট শার্লেম্যাইয়াঁ (Charlemagne) বৌদ্ধসম্রাট অশোক এবং বাগদাদের খলিফা হারুণ-অল্-রসিদের তুলনা হইতে পারে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য সংস্কৃতি ও বিদ্যাচর্চা ব্যাপারে হিন্দুদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত লোক, কবি, ঔপন্যাসিক, কথকঠাকুর, নাট্যকার, জ্যোতির্বিদ্, অভিধানকার, ঐতিহাসিক অথবা আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভারতের যে কোন ব্যক্তির নিকট মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। বিজ্ঞান, নাটক, কাব্য অথবা সাধারণ শিক্ষার উৎসাহদাতা আধুনিক ইউরোপের যে কোন সম্রাটের সহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্য সমতুল্য। নয়জন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি 'নবরত্ন' নামে বিক্রমাদিত্যের সভাকে অলঙ্কৃত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি ও নাট্যকার কালিদাসের নাম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।[১] মহাকবি কালিদাস নাট্যপ্রতিভায় ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের সমতুল্য বলা যাইতে পারে। কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' ইংরাজী ছাড়া আরও কোন কোন

১। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় 'নবরত্ন' নামে নয়জন মহাপণ্ডিতদের নাম যথা : কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, অমরসিংহ ('অমরকোষ' নামক সংস্কৃত কবিতায় রচিত অভিধানকার) ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট ও ঘটকর্পর।

ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আগাষ্টাস্ উইলিয়াম্ ফন্ শ্লেগেল, আলেকজাণ্ডার ফন্ হামবোল্ট্ এমন কি গ্যেটের ন্যায় বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষিগণের দ্বারাও ইহা প্রধান শ্রেণীর নাটকীয় সৃষ্টির নিদর্শন বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া বিশ্ববিখ্যাত মহাকবি গ্যেটে লিখিয়াছেন ঃ

> "অয়ি শকুন্তলে, যদি তোমাকে মনুষ্য-যৌবনের নবোদ্গত প্রসূন ও তাহার বার্ধক্যের পরিপক্ক ফল বলিয়া সম্বোধন করি ; অথবা যাহাতে আত্মার তৃপ্তি, আত্মার সন্তোষ ও আত্মার হর্ষোৎপাদন হয় তাহাই বলিয়া তোমকে সম্বোধন করি ; যদি একই মধুময় নাম স্বর্গ ও মর্ত্যের যাবতীয় সুখকর পদার্থের সংজ্ঞাস্বরূপ হয় তবে সেই নাম শকুন্তলা, যে নাম উচ্চারণে সব কিছু বলা হ'য়ে যায় ?"

কালিদাসের 'শকুন্তলার' সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অল্পবিস্তর শুনিয়াছেন। তাহা ছাড়া 'বিক্রমোর্বশী' 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি কালিদাসের রচিত আরও কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর নাটক আছে। কাব্যসৃষ্টিপ্রতিভার দিক দিয়া কালিদাসের রচিত খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত'-কে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও শেলীর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলীর সমান কাব্যগুণসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন ঃ "ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের ন্যায় কালিদাসও প্রেমানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখিতেন এবং প্রকৃতির রহস্য ও নিয়মসম্বন্ধে যে কোন হিন্দুকবি অপেক্ষাও তিনি অধিকতর অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী ছিলেন। ভারবি, দণ্ডী, বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভর্তৃহরি, ভবভূতি প্রভৃতি প্রতিভাশালী নাট্যকার ও কবিগণ কালিদাসের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী তাঁহাদের অবস্থিতি কাল। বারশত বৎসর পূর্বে যেভাবে এই সকল কবিদের রচনাবলী অধ্যয়ন করা হইত এখনও সেসব ভারতবর্ষের সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, বিদ্যায়তন ও সংস্কৃত কলেজগুলিতে সেইভাবে পঠিত হয়।

'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'হিতোপদেশে'র[১০] নীতি-উপাখ্যানগুলিই গ্রীসদেশবাসী ঈশপ্ (Æsop) ও পিল্‌পের (Pilpay) রচিত উপকথার ভিত্তি-স্বরূপ। এই সকল নীতিকথা এখন পর্যন্তও ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যবিষয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই নীতি-কথাগুলি ভারতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল এবং কালক্রমে পৃথিবীর অন্য অনেক সভ্যজাতির ভাষায় তাহারা অনূদিত হইয়াছে।

স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন: পারস্য বাদসাহ নওশারোয়ানের রাজত্বকালে (৫৩১ হইতে ৫৭২ খৃষ্টাব্দ) পারস্যভাষায় 'পঞ্চতন্ত্র'-এর অনুবাদ হয়। পারস্য ভাষা হইতে প্রথমে আরবীভাষায় এবং আরবীভাষা হইতে অনুমান ১০৮০ খৃষ্টাব্দে সাইমিয়ন শেথ্ (Symoen Seth) কর্তৃক গ্রীক ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়। অনুমান ১২৫১ খৃষ্টাব্দে আরবী হইতে স্পেনীয় ভাষায় 'পঞ্চতন্ত্র' মুদ্রিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্রের প্রথম জার্মাণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।"[১১]

ইহা ব্যতীত হিন্দুদের যে সমস্ত পুরাণগ্রন্থ আছে সেগুলি একত্র করিলে বিশাল গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। এই পুরাণগুলি সহস্র বৎসর পূর্বেকার মত আজপর্যন্ত হিন্দুদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রিয় পাঠ্য হইয়া আছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে এবং মধ্যযুগে হিন্দুজাতির সভ্যতার ধারা এবং

১০। হিতোপদেশের নীতিকথাগুলিই Sir Edwin Arnold *The Book of Good Counsels* এই নাম দিয়া ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

১১। Sir. R. C. Dutt : *Civilization in Ancient India*, Vol. II, p 297.

ইংরাজদের ভারতে আগমনের পূর্বপর্যন্ত ভারতবাসীদের শিক্ষার আদর্শ কী প্রকার ছিল, সে-সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে অনুমান করিতে পারি। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমানদের আক্রমণের সময় হইতে হিন্দুদের কতবার যে ভাগ্যবিপর্যয়, নানাবিধ জাতীয় সঙ্কট, রাষ্ট্রীয় অধীনতা ইত্যাদির ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে নিজেদের রক্ষার জন্য যুদ্ধবিগ্রহ ও নানা উপদ্রবের মধ্যে থাকিতে হওয়ায় কোনপ্রকার বিজ্ঞানের বা জ্ঞানের অনুশীলন করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ইহা ব্যতীত মুসলমানদের উন্মুক্ত তরবারি ও তাহাদের দ্বারা প্রজ্বলিত প্রচণ্ড অগ্নিপ্রবাহ হিন্দুদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বহু গৌরবময় প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। কোরাণ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ পাঠ অথবা জ্ঞানানুশীলন মুসলমান শাসকদের দ্বারা কখনও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই। যাহাতে সাধারণে কোরাণ পাঠ করিতে পারে এই জন্যই তাঁহারা মসজিদগুলির মধ্যে কোরাণ শিক্ষাদানের জন্য মক্তব (আরবী পাঠশালা) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, মোগল সম্রাট আওরঙ্‌জেব খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহার রাজত্বকালে নাকি জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বহু নগরে অনেক বিদ্যালয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমনকি, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তির সত্যতার জন্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। সাধারণতঃ মুসলমানদিগের ধারণা যে, সমুদয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সারতত্ত্ব ও জ্ঞান একমাত্র কোরাণের মধ্যেই নিহিত, অতএব কোরাণ ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক পাঠ করার কোনই প্রয়োজন নাই। সেইজন্য মুসলমানেরা হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও দর্শনের যাবতীয় গ্রন্থ দেখিতে পাইলেই সে

সমস্ত ধ্বংস করিয়া দিতেন। হিন্দুসমাজে জাতিভেদের কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মণজাতি মুসলমানদিগের সহিত মেলামেশা করিতে চাহিতেন না। এই জাতিভেদের একটি দিক অন্ততঃ ভাল ছিল আর তাহারই ফলে ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদিগের ধ্বংসকারী হাত হইতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষাপ্রদানের উদ্দেশ্যে মুসলমান রাজত্বকালে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় (মক্তব) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনেক হিন্দু বালক এই সকল মক্তবে আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করিত। শিক্ষাব্যাপারে হিন্দুজাতির কোনও কুসংস্কার না থাকায় ইহা তাঁহা-দিগের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। মুসলমানদের প্রবর্তিত আরবী ও ফারসী উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে অলঙ্কারশাস্ত্র (rhetoric), ন্যায়শাস্ত্র, আইনবিদ্যা এবং মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শুধু মুসলমান ছাত্রগণকেই শিক্ষা দিবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। হিন্দু ছাত্রগণের এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ অধিকার ছিল না। তাহারা এই সকল উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সূচনাকালেও মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত এই উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে কেবল মুসলমান ছাত্রগণ ইউক্লিডের জ্যামিতি, টলেমির (Ptolemy) জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করিত।

খৃষ্টান মিশনারীরাই ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন দিনেমার (Danish) জাতীয় খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত ট্রাঙ্কুইবারে আসিয়া উপস্থিত হন এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে বাইবেল প্রচার করিবার জন্য ঐ স্থানের প্রচলিত ভাষাগুলি শিখিতে আরম্ভ করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন

কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের দিক দিয়া অবশ্য এই স্কুলগুলির তেমন উপযোগিতাও ছিল না। কেননা হিন্দু-ছাত্রদের খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করাই মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক মণ্ডলী খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার ও প্রচার উদ্দেশ্যে ভারতে একটি সমিতি স্থাপন করেন। কিন্তু খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত এই সমিতির কার্য বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ইহার পর ইংলণ্ড হইতে খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকগণের তৃতীয় প্রচার-সমিতি বাঙলাদেশে স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে উইলিয়ম কেরী (William Carey), জন্ মার্শম্যান (John Marshman) প্রভৃতি বিশিষ্ট ও প্রতিভাশালী কয়েকজন মিশনারী এই প্রচার-সমিতির মুখপাত্র হইয়া ভারতে আসিলেন। ইঁহারা প্রচলিত ও কথিত ভাষাগুলি আয়ত্ত করিয়া বাইবেলের শিক্ষা প্রচারের জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবাসীদের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজমন্ত্রী উইলবারফোর্স (Wilberforce) উক্ত খৃষ্টাব্দে রচিত কোম্পানীর সনন্দ আইনে ভারতবাসীদের ইংরাজী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সেখানে ইংরাজী শিক্ষক পাঠাইবার দুইটি ধারা সংযোগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে কোম্পানীর প্রধান পরিচালকগণ প্রবলভাবে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে মার্শম্যান প্রদত্ত রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে: "সে সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারদের মধ্যে একজন বলিয়াছিলেন যে, নির্বুদ্ধিতাবশতঃ যুক্তরাজ্যে স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা করায় আমেরিকা আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আমরা পুনরায় সেই নির্বুদ্ধিতার কার্য করিব না। যদি ভারতবাসীদের শিক্ষালাভের জন্য এতই আগ্রহ থাকে তবে তাহারা

সেজন্য ইংলণ্ডে আসিতে পারে।”[১২] বর্তমানকালে ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই কূটনীতি এখনও বর্তমান। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের সেই কূটনীতি বা সেইরূপ একটা ভীতিভাব দৃশ্যতঃ যদিও এতদিনে অনেকটা চলিয়া গিয়াছে এবং ভারতের নানাস্থানে বহু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি ইংলণ্ড এবং ইউরোপ ও আমেরিকার নানা রাজ্যে ছাত্রগণ যে প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা পায়, ভারতবর্ষে ছাত্রদের মধ্যে সেই প্রকার শিক্ষা প্রচলন করা ভারতের ইংরাজ সরকার নিরাপদ বলিয়া মনে করেন না। এই আশঙ্কার জন্য ইংরাজ রাজত্বকালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুসলমানদের জন্য একটি কলেজ এবং লর্ড কর্ণওয়ালিশ বারাণসীতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের জন্য একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারতপ্রবাসী ইংরাজ বিচারকদের বিচারকার্যে সহায়তা করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগণকে আইন বিদ্যায় শিক্ষিত করাই এই দুইটি কলেজ-স্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইহার পর বিশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজ সরকার ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার করিতে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সর্বপ্রথম ভারতের রাজস্ব হইতে দশহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ দেড়লক্ষ টাকা বাঙ্গলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রদেশের অধিবাসীদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী দশবৎসর পর্যন্ত এ সম্বন্ধে

১২। J. C. Marshman's *Evidence, Lords' Second Report*, 1853.

কোন কিছু করা হয় না।[১৩] ইতিমধ্যে বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি এবং সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ও অগ্রণী হিন্দু-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের শক্তিশালী নেতৃত্বে হিন্দুরা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম নিজের একক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারণ সে সময় পর্যন্ত ভারতে কোনও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। ভারতবাসীদের মধ্যে রাজা রামমোহনই সর্বপ্রথম ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে গিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। এখনও পর্যন্ত ব্রিষ্টলে তাঁহার সমাধি-মন্দির বর্তমান আছে। রাজা রামমোহনের সমসাময়িক কালে ডেভিড্ হেয়ার নামে একজন স্কটল্যাণ্ডবাসী ভদ্রলোক কলিকাতায় বাস করিতেন। ইঁহার ঘড়ির ব্যবসা ছিল। হেয়ার সাহেব অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন ও বিপুল উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। রাজা রামমোহন হেয়ার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কার্যারম্ভ হইল। উদ্যোগী হেয়ার সাহেব এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিজ্ঞাপন লিখিয়া বিলি করিতে লাগিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজ-কর্মচারী ও হিন্দুসমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির আগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ইহাই

১৩। এ সম্বন্ধে Sir Charles Trevelyan's *Evidence, Lords' Second Report*, 1853 দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'হেয়ার স্কুল'। ইহাই বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম স্থাপিত উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে ইংরাজ সরকার এদেশের লোকেদের শিক্ষা বিস্তার উদ্দেশ্যে কোন কিছু করিবার পূর্বেই হিন্দুদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ইহা স্থাপিত হইয়াছিল।[১৪] মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙলা এই তিন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষাপ্রণালী নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৮২০ খৃষ্টাব্দে একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুই বৎসর ধরিয়া এ বিষয়ে কিছুই করা হইল না। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের তৎকালীন গভর্ণর স্যার টমাস মনরো মাদ্রাজ প্রদেশের সাহিত্য ও ললিত কলার অবনত অবস্থা এবং জনসাধারণের দারুণ অজ্ঞতা দেখিয়া স্বয়ং এ বিষয়ে তদন্ত আরম্ভ করেন। এই তদন্তের ফলে জানিতে পারেন যে, প্রাচীন হিন্দুপ্রথা অনুসারে শুধু এক মাদ্রাজ প্রদেশেই এক কোটি বিশ লক্ষ নরনারীর মধ্যে তাহাদের শিক্ষার জন্য বার হাজার চারশত আটানব্বুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিষয়ে মনরো সাহেব কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারদিগের নিকট একটি রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রিপোর্ট জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টের একস্থানে লিখিত আছেঃ "আমার মনে হয় মাদ্রাজের সমগ্র অধিবাসিগণের এক-চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিক, এবং বলিতে পারা যায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় উন্নত না হইলেও কিছুদিন পূর্বে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে শিক্ষার যে অবস্থা

১৪। এ সম্বন্ধে বিখ্যাত খৃষ্টান মিশনারী ও শিক্ষাব্রতী আলেকজাণ্ডার ডাফ সাহেবের *Evidence, Lords' Second Report*, 1853 দ্রষ্টব্য।

ছিল, তাহার তুলনায় এই অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত ভাল, ইহা বলিতেই হইবে।[১৫]

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এর গভর্ণর লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন্ তদন্তের ফলে জানিতে পারেন যে, শুধু এক বোম্বাই প্রদেশেই হিন্দুদিগের এক হাজার সাত শত পাঁচটি স্কুল ও কলেজ ছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন বাঙ্গলার সাতকোটি অধিবাসীর বিদ্যাশিক্ষার জন্য বঙ্গদেশে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত তিন হাজার তিন শত পঞ্চান্নটি স্কুল ছিল। হিন্দুজাতির জ্ঞান, বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রতি কি প্রকার আগ্রহ ছিল ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময় প্রত্যেক গ্রামেই একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় (পাঠশালা) থাকিত। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে লিখন, পঠন, গণিত, পরিমিতি (জরিপ) প্রভৃতির প্রাথমিক পাঠগুলি শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালা ব্যতীত পূর্বকথিত শিক্ষাপরিষৎ বা কলেজও অনেক ছিল। এই সমস্ত কলেজে ব্যাকরণ, গণিত, অলঙ্কারশাস্ত্র (rhetoric), কাব্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের বিবিধ বিষয় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই কলেজগুলির সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলির তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল।

জনসমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার দশ বৎসর পূর্বে বিলাতের পার্লামেণ্ট ভারতবাসীদের শিক্ষা বিধানের জন্য যে দশ হাজার পাউণ্ড (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) মঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই অর্থ ব্যয় করিয়া কোম্পানী কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজ' (এক্ষণে

১৫। *Minute dated* March 10, 1826

'প্রেসিডেন্সী কলেজ') নামে একটি ইংরাজী কলেজ, প্রাচ্য বিদ্যা-সমূহ শিক্ষার জন্য ছয়টি কলেজ এবং বাঙ্গলা ও রাজপুতনায় কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। উক্ত কমিটি প্রাচ্য বিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকসকল প্রকাশের জন্যও মনোযোগী হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একটি প্রেস খুলিয়াছিলেন।

১৮২৩ হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য প্রধান প্রধান কলেজগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কতকগুলি ক্লাস বাড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন বিশেষ আর কিছু কার্য হইয়া উঠে নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক জনশিক্ষার এই কমিটিতে আরও সদস্য লইয়া ইহাকে বৃহত্তর আকারে পরিণত করিয়া মেকলে সাহেবকে (T. B. Macaulay) ইহার প্রেসিডেন্টপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও রসময় দত্ত এই দুইজন সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু এবং নবাব টাকাওয়ার জঙ্গ এই কমিটির সদস্য নির্বাচিত হইলেন। মেকলে সাহেবের সহায়তা ও সমর্থনে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তারিখে নিম্নলিখিত প্রস্তাব অনুমোদন করাইয়া লইলেন।[১৬] তাহার ফলে

১৬। মেকলে সাহেবের (১৮০০-৫৯ খৃষ্টাব্দ) সাম্রাজ্যবাদিতা এবং পরাধীন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। তিনি বিজয়ী জাতিসুলভ অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার বশবর্তী হইয়া ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শ, সংস্কৃতি তাহাদের চরিত্রের প্রতি দারুণ শ্লেষ, অবজ্ঞা ও ঘৃণাপূর্ণ মন্তব্য আপনার *Historical Essays* ও *Biographical Essays* প্রভৃতি পুস্তকের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙালী জাতিকে অতি হেয় প্রতিপন্ন করিবার কুপ্রচেষ্টা বর্তমান। এই মনোবৃত্তির জন্যই উক্ত কমিটির প্রেসিডেন্টরূপে তিনি ভারতীয় ও আরবীয় বিদ্যা ও সংস্কৃতির

ভারতে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইংরাজী ভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া গেল। উক্ত কমিটির গৃহীত প্রস্তাবগুলি যথা,

প্রথম: ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সম্যক্ উন্নতিসাধন করাই ভারত সরকারের শিক্ষাবিস্তারনীতির প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইল।

দ্বিতীয়: এখন হইতে আর কাহাকেও বৃত্তি দেওয়া হইবে না। তবে বর্তমানে বৃত্তিপ্রদানের যে সকল ব্যবস্থা আছে, ভারতবাসী তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা যতদিন দেখাইতে পারিবে ততদিন তাহা প্রচলিত থাকিবে—তাহা আপাততঃ বন্ধ করা হইবে না।

তৃতীয়: প্রাচ্যদেশীয় পুস্তক প্রভৃতির মুদ্রণকার্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার ফলে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা দ্বারা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে ইউরোপের যাবতীয় বিদ্যার প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মাদ্রাজে এই সময় পাচিয়াপা (Pachiapa) নামে জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক প্রায় আশী হাজার পাউণ্ড (একলক্ষ বিশ হাজার টাকা) ধর্মকার্যের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন। ঐ টাকা হইতে বিশেষ একটি অংশ লইয়া মাদ্রাজের হিন্দু অধিবাসীরা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একটি উচ্চশ্রেণীর কলেজ স্থাপন করেন। বর্তমানে উহাই 'পাচিয়াপা

উপযোগিতা একেবারে তাচ্ছিল্যের সহিত অস্বীকার করিয়া ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সংস্কৃতির প্রবল সমর্থন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন: "ইংলণ্ডের যে কোন একটি লাইব্রেরীর যে কোন একটি শেলফ্-এ (Shelf) রক্ষিত যে শ্রেণীর পুস্তক সকলই থাকুক, সংস্কৃতি ও জ্ঞানসম্পদের দিক দিয়া তাহারা ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সর্বোৎকৃষ্ট সমস্ত রচনাবলী হইতে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ।"

কলেজ' নামে পরিচিত। মাদ্রাজের ইহাই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী শিক্ষার কলেজ, ইহার এখনও উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্কচ কার্কের 'জেনারেল য়্যাসেম্বলী' নির্বাচিত খৃষ্টান মিশনারীরূপে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ কলিকতায় আসিবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় একটি ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষাদান কার্য সফলতা অর্জন করে, কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার অপেক্ষা হিন্দু বালকদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করাই ডাফ্ সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যের বংশবর্তী হইয়া তিনি অনেকগুলি হিন্দুছাত্রকে প্রলুব্ধ করিয়া খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে হিন্দুসমাজের হিতৈষী ও নেতাদের দৃষ্টি পড়িল এবং এখন হইতে আর কোন হিন্দু বালককে মিশনারীদের স্কুলে পড়িতে যাইতে দেওয়া তাঁহারা বন্ধ করিলেন। এদেশে অবস্থানকালে ডাফ্ সাহেব তাঁহার স্কুলের (Duff College) ছাত্রগণের মধ্য হইতে কেবলমাত্র চল্লিশ জনকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দু-বালকদের এই ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে কলিকাতায় হিন্দু-সমাজে দারুণ বিক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল।[১৭] এই সময়ে আমেরিকার স্বাধীন চিন্তাবাদী মনীষী টমাস্ পেন্ (Thomas Paine) রচিত *Age of*

১৭। মিশনারীদের এই কুপ্রচেষ্টা দমনের জন্য স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রভৃতি হিন্দুসমাজের নেতারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ইহার ফলে 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় মিশনারীদের স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের যাওয়া বন্ধ হইল। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম নিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

Reason নামে সুপ্রসিদ্ধ বইখানির বহুসংখ্যক কপি কলিকাতায় আসিয়া পড়ে। এই গ্রন্থে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তিদ্বারা খৃষ্টান ধর্ম ও বাইবেলের ধর্মনীতি ও শিক্ষার অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সমস্ত খৃষ্টান মিশনারীদের নিকট এই গ্রন্থ এক ভীষণ বিভীষিকা। ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে *Age of Reason* এমনি সমাদর লাভ করিল যে, শীঘ্রই উহা ছাত্র ও সুধী সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। ডাফ্ সাহেব দেখিলেন এই পুস্তক থাকায় হিন্দুদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং তিনি বাজারে *Age of Reason*-এর যতগুলি কপি পাইলেন সমস্তই কিনিয়াই প্রকাশ্য রাজপথে পোড়াইয়া ফেলিলেন। কিন্তু হিন্দুরা উক্ত পুস্তক পুনরায় ছাপাইয়া আপনাদের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কলিকাতায় হিন্দুসমাজ জাগ্রত হইল। তখন হইতে হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্বায় সমাজের বালকগণের ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য নিজেরাই স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। এই সমস্ত হিন্দু নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহান চরিত্র, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জনহিতৈষণা ও দেশবাসীর শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে তাঁহার সাফল্যমণ্ডিত মহৎ প্রচেষ্টার কথা দেশে সকলের নিকটই সুপরিচিত। ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে কোনও সাহায্য না লইয়া নিজের একক চেষ্টা দ্বারাই বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় 'মেট্রোপলিটান্ কলেজ' ও কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ও স্কুলগুলি এখনও সগৌরবে বর্তমান আছে। 'মেট্রোপলিটান কলেজ' ও তাহার শাখা স্কুলগুলি 'মেট্রোপলিটন

ইনিষ্টিটিউসান্' নামে মহানগরী কলিকাতায় বহু সহস্র ছাত্রের বিদ্যা-লাভের অন্যতম বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানরূপে দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত কলেজটি ও স্কুলগুলি সম্পূর্ণরূপে হিন্দু প্রতিষ্ঠান। ইহার পরিচালকমণ্ডলী, অধ্যাপক-বৃন্দ, শিক্ষকগণ ও ছাত্রেরা সকলেই হিন্দু। ইঁহাদেরই পরিচালনা ও অধ্যাপনার গুণেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে আজও সহস্র সহস্র ছাত্র প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।

ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষালাভের পূর্বে যাহাতে দেশীয় ছাত্রগণ প্রচলিত ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় একশত স্কুল স্থাপন করেন। এই সকল স্কুল হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা যাহাতে রাজসরকারের কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্য তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত প্রস্তাবটি পাশ করাইয়া লইলেন। ইহার ফলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের মধ্যে সরকারী চাকরী লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়ায় তাঁহারা কলিকাতা ও মফঃস্বলের নগরগুলিতে অনেক কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজী ভাষায় শিক্ষালাভ ও শিক্ষাপ্রদানের প্রবল বাসনা বাঙ্গলা দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রকাশিত হইল; এ বিষয়ে কোন জাতিভেদের বৈষম্য চলিল না। সকল বর্ণ ও শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠায় বাঙ্গলার নগরে ও গ্রামে বহু স্কুল স্থাপিত হইতে আরম্ভ করিল।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজের (বর্তমানে 'মহসীন কলেজ') প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার তিন দিনের মধ্যেই বারশত ছাত্রের নাম কলেজের তালিকাভুক্ত হইল। এই সঙ্গে একটি স্কুলও স্থাপিত হইয়াছিল;

সেটিও দেখিতে দেখিতে অসংখ্য ছাত্র দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল, একান্নটি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে আট হাজার দুইশত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচ হাজার একশত বত্রিশ জন ইংরাজী, চারিশত ছাব্বিশ জন সংস্কৃত, পাঁচশত বাহাত্তর জন আরবী এবং সাত শত ছয় জন পারসী ভাষা অধ্যয়ন করিতেছে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড প্রাচ্যশিক্ষার উন্নতির উদ্দেশ্যে সরকারী তহবিল হইতে পঁচিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্ণর মিষ্টার টমাসন (Mr. Thomason) ভারতে চিরচলিত গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করিবার জন্য এক নূতন নীতি অবলম্বন করেন। সেই নীতির কার্যক্রম এই প্রকার:

প্রথমঃ কয়েকটি গ্রামের মধ্যে একটিকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অবস্থান এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হইতে এক মাইলের বেশী দূর হইবে না।

দ্বিতীয়: প্রত্যেক মহকুমার সদরে একটি করিয়া মধ্যম ইংরাজী স্কুল (Middle School) স্থাপিত হইবে।

তৃতীয়: প্রত্যেক জিলার সদরে একটি করিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারগণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া এইভাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইল এবং চারি বৎসরের মধ্যে সমস্ত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আটটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল সরকারী স্কুলগুলি অবৈতনিক ছিল না। এইগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ছাত্রদের নিকট হইতে শ্রেণীগুলির তারতম্য অনুসারে মাসিক মাহিনা বাবদ একটাকা হইতে

আরম্ভ করিয়া বার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইত। বে-সরকারী স্কুলগুলির অপেক্ষা সরকারী স্কুলগুলির বেতনের হার অধিক ছিল। মিশনারীদের স্কুলগুলির অধিকাংশই প্রাথমিক বা প্রাইমারী ছিল। তাহাদের মধ্যে শুধু তিন চারিটিতে মাধ্যমিক আদর্শের শিক্ষা দেওয়া হইত। দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য কয়েকটি মিশনারী স্কুলে ছাত্রদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হইত না। মেয়েদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য ইংরাজ সরকার ঐ সময় পর্যন্ত কোনই চেষ্টা করেন নাই। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার উদ্যম এসময়ে ইংরাজ সরকারের কোনই সহায়তা পায় নাই। এদিকে শিক্ষিতা হিন্দু বালিকারা যাহাতে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে—এই সর্বনাশকর উদ্দেশ্য লইয়া মিশনারীরা হিন্দুবালকদের জন্য স্কুলের ন্যায় এখন তাঁহারা মেয়েদের জন্যও স্কুল খুলিলেন। মিশনারীদের এই সকল স্কুলে হিন্দু-বালিকারা হিন্দুর পূর্ব পুরুষের ধর্ম ও সমাজের অযথা নিন্দা শ্রবণ করিত। মিশনারীদের প্রদত্ত শিক্ষার ইহা এক দারুণ ত্রুটি। যাহাই খৃষ্টান ধর্মের অনুকূল নয়, খৃষ্টীয় আদর্শের বিরোধী ও খৃষ্টানদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বহির্ভূত, যাহা তাঁহাদের মাপকাঠি নির্ণয় করিতে পারে না তাহাই তাঁহারা গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার বশীভূত হইয়া মিথ্যা, দুর্নীতিপূর্ণ ও পাপজনক ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। মিশনারীদের মন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—তাঁহাদের সম্প্রদায়ের সীমানার বাহিরে যে সত্য ও প্রকৃতধর্ম থাকিতে পারে ইহা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারেন না এবং সেইজন্যই অখৃষ্টান জাতিদের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সত্যানুভূতি থাকিলেও সে সকলের মহিমা উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। হিন্দুদের অবতার ও মুক্তিপথ-প্রদর্শক মহাপুরুষদিগকে মিশনারীরা মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন না;

বরং তাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দুমাত্রেই অনন্তকাল নরকভোগ করিবার জন্যই নির্দিষ্ট হইয়া আছে! এই কারণে তাঁহাদের চক্ষে প্রতিভাত 'পৌত্তলিক' হিন্দুদের আত্মাকে পরিত্রাণ করাইবার জন্য মিশনারী মহাশয়দের 'ব্যগ্রতা' ও ব্যস্ততার যেন আর অন্ত নাই। কী উদ্দেশ্যে খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতবর্ষে 'অখৃষ্টান' অর্থাৎ হিন্দু বালক বালিকাদের জন্য এইসব স্কুল কলেজ স্থাপন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদেরই স্বধর্মী একজন আমেরিকান মিশনারী লিখিয়াছেনঃ "অখৃষ্টানদের সমাজের সঙ্গে অবাধে মেলামেশার দ্বারা যাহাতে তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত মিশনারী স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। * * এই সমস্ত স্কুল ভারতে খৃষ্টধর্ম বিস্তারের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের মধ্যে যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার মুক্তিবার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে চমৎকার সুযোগপ্রদ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারক। * * আমি নির্ভয়েই বলিতেছি, অন্য কোন উপায় অপেক্ষা এই সকল স্কুলের সাহায্যেই অধিকতর লোককে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে—এই উপায়েই খৃষ্টধর্মের মধ্যে অধিকতর বিধর্মীদের আনা সম্ভব হইয়াছে।"

এই উক্তি হইতেই জানা যাইবে খৃষ্টান মিশনারীরা কী প্রকার গোঁড়া ও ধর্মান্ধ। অবৈতনিক (বিনা পয়সায়) শিক্ষাপ্রদানের নামে ইঁহারা দরিদ্র হিন্দু বালক বালিকাদের সহিত কেমন প্রতারণা করেন। দরিদ্র হিন্দু বালক বালিকারা বিনা পয়সায় লেখাপড়া শিখিবার আশায় মিশনারীদের এই সমস্ত স্কুলে ভর্তি হয়। কিন্তু শিক্ষার আলোকের পরিবর্তে তাহাদের কোমল চিত্তে কতকগুলি কুসংস্কার ও ধর্মের নামে কতকগুলি বিজ্ঞানবিরোধী অসত্যভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যাওয়া হয়। ফলে তাহারা পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনকে এবং তাহাদের সমাজ ত্যাগ

করিয়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এই মিশনারীরা কোন মতেই বুঝিতে পারে না কি কারণে হিন্দুরা নিজেদের অবতার ও ঋষিদের পরিত্যাগ করিয়া সেমেটিক্‌দের বিশেষতঃ ইহুদীদের ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষদের ভক্তি ও পূজা করিবে। কোন্ যুক্তিতে হিন্দুরা নিজেদের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে ভুলিয়া যাইবেন এবং তাঁহাদের সত্যদ্রষ্টা পূর্বপুরুষগণের উপলব্ধ সনাতন আর্য ধর্মকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন? কিসের জন্য হিন্দুরা নিজেদের দিব্যদ্রষ্টা ঋষিদের পরিত্যাগ করিয়া ইহুদী প্রবক্তাদের অনুগামী হইবেন? অবশ্য যে সমস্ত জাতির মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাব, যথার্থ দার্শনিক প্রতিভা অথবা উচ্চশ্রেণীর নৈতিক আদর্শ নাই, যীশুখৃষ্টের সমতুল্য কিংবা তাঁহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর সন্ধান যাহারা পায় নাই খৃষ্টধর্মের পতাকা-তলে আনন্দে তাহারাই আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা বহু প্রাচীন কাল হইতে সুসভ্য উন্নত জাতি। যাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তিশালী অবতারগণের আবির্ভাব হইয়াছে তাহারা কখনও যীশুখৃষ্টকে পরিত্রাতা বলিয়া তাঁহার ধর্মমতকে গ্রহণ করিতে পারে না। হিন্দুদের এই সকল অবতার পুরুষেরা ন্যাজারেথবাসী যীশুখৃষ্টের সমান; সুতরাং হিন্দুদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার পূর্বে খৃষ্টানধর্ম-প্রচারকগণ প্রথমে ইহুদী-গণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ আবার বৃদ্ধি করা হইল। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন-কার্যে প্রয়োজন মত কোন কোন বিষয় পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করিবার জন্য লর্ডস্ কমিটি (Lords' Committee) গঠন করিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, কমিটিতে

সেই আলোচনাও হইল। সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া কমিটি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিজেদের এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন। এই সিদ্ধান্তই ভারতে ইংরাজ সরকার কর্তৃক অবলম্বিত শিক্ষাদান নীতির সনন্দপত্র। আজও পর্যন্ত ইহা ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষানীতির ভিত্তিস্বরূপে বর্তমান। কমিটি ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের ও কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ব্রিটিশ-শাসিত তিনটি প্রদেশের এই তিনটি প্রধান মহানগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুকূলে নিজেদের মত প্রদান করিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের এই ব্যবস্থার দ্বারাই ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রের বিস্তৃতি সাধিত হয়। নিম্নলিখিত সংস্কার-বিধিগুলি ইহার অঙ্গীভূত ছিল ঃ

"প্রথম ঃ ভারতে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি সাধনের ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্বতন্ত্র একটি নূতন বিভাগ খুলিতে হইবে।

"দ্বিতীয় ঃ কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

"তৃতীয় ঃ এদেশে যত প্রকারের স্কুল আছে তাহাদের শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিতে হইবে।

"চতুর্থ ঃ বর্তমানে এদেশে যেসব সরকারী স্কুল ও কলেজ আছে সেগুলি রক্ষা করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে আরও স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

"পঞ্চম ঃ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নূতন নূতন স্কুল স্থাপন করিতে হইবে।

"ষষ্ঠ ঃ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার উদ্দেশ্যে দেশীয় পাঠশালা ও অন্যান্য প্রকারের স্কুল স্থাপন কার্যে আরও অধিক মনোযোগ দিতে হইবে।

"সপ্তম ঃ এই সকল বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্যের জন্য (grants-in-aid) একটি ব্যবস্থার প্রচলন করিতে হইবে।"

"যে সমস্ত স্কুলে রীতিমতভাবে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, যেগুলি স্থানীয়

বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের দ্বারা পরিচালিত এবং সরকার নিযুক্ত ইন্সপেক্টারগণ পরিদর্শন করিতে পারেন এবং বেতনের হার অল্প হইলেও তাহা ছাত্রদের নিকট হইতে লওয়া হয় এই প্রকারের বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক টাকা দিয়া সাহায্য করা হইবে। অবশ্য এই সাহায্য কার্য সরকারী তহবিলের মজুত টাকা যেমন থাকিবে সেই পরিমাণ অনুসারেই হইবে।"

এই সরকারী আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে অন্তত পাঁচটি বিভিন্ন প্রণালী অনুসৃত হইত। যথা ঃ

প্রথম ঃ শিক্ষকগণের বেতনের আংশিক ভার গ্রহণ। এই প্রথা শুধু মাদ্রাজ প্রদেশেই প্রচলিত। শিক্ষকের যোগ্যতা অনুসারে সরকারী তহবিল হইতে তাঁহার বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেওয়া হয় মাত্র। এই প্রথা মাধ্যমিক (Secondary) শিক্ষা সংক্রান্ত স্কুলগুলিতেই বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঃ বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল অনুসারে সরকারী সাহায্য। মাদ্রাজের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এবং বোম্বাই প্রদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে এই নিয়মানুযায়ী সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। যে সমস্ত স্কুলের ছাত্রেরা সরকারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, সরকার শুধু সেই সব স্কুলেই অর্থ সাহায্য করিবেন।

তৃতীয় ঃ শিক্ষকগণের বেতনের আংশিক অর্থ প্রদান এবং স্কুলের পরীক্ষার ফল অনুযায়ী ঐ সকল স্কুলে অর্থ সাহায্য দান—এই দুইয়ের একযোগে ব্যবস্থা।

চতুর্থ ঃ নির্দিষ্ট কোন একটা সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট অর্থসাহায্য প্রদান। উত্তর ও মধ্যভারতে অধিকাংশ স্থানেই এই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার তিন অথবা পাঁচবৎসরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন।

পঞ্চম ঃ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদের পুরস্কার দিয়া শিক্ষার জন্য তাহাদের

আগ্রহ বৃদ্ধি করা। এই প্রকার সাহায্য বাঙ্গলাদেশের কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয়েই করা হইয়া থাকে।[১৮]

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত ব্যবস্থার অন্তর্গত সাতটি নিয়মের প্রচলন ফলে সমগ্র ভারতে যথাবিহিতভাবে ক্রমশঃ শিক্ষার বিস্তৃতি হইতেছে। উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা এবং প্রাথমিক অবস্থার শিক্ষার বাহনরূপে দেশীয় চলিত ভাষার প্রচলন হইল। শিক্ষার জন্য সরকারী আর্থিক সাহায্য দান সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে হইত। যে সমস্ত স্কুলে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষার সম্বন্ধ নাই শুধু সাধারণ শিক্ষাই দেওয়া হয়, এই প্রকার সকল স্কুলই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আর্থিক সাহায্য পাইয়া আসিয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং 'লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়'-এর আদর্শে এদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার উদ্দীপনা আরও অধিক লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। ক্রমশঃ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে একটি এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ভারতে সর্বশুদ্ধ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক একজন করিয়া মহাধিপাল (Chancellor) থাকেন। প্রত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক গভর্ণরই এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাধিপাল নিযুক্ত হন। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একজন অধিপাল (Vice-Chancellor) থাকেন। অন্ততঃপক্ষে ত্রিশজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও প্রভাবশালী ভদ্রলোককে লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্ত্রণা পরিষদ্

১৮। এই পাঁচটি নিয়মের ইংরাজী নাম যথাক্রমে *Salary Grant System, Results Grant System, Combined Salary Results System, Fixed Period System* এবং *Captitative System.*

বা Senate গঠিত হয়। এই সেনেট-এর সদস্যগণই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিধির পরিচালক ও তাহার আয়ব্যয় নির্ধারক। সেনেটের এই সদস্যগণ নিজেদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন কানুন গঠন করিয়া তাহার অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। কারণ সরকারের অনুমোদন এই সমস্ত আইন প্রচলনের পক্ষে অপরিহার্য। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় শিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষা সিনেটের পরিচালনা ও ব্যবস্থা অনুসারেই হইয়া থাকে। এই সকল পরীক্ষায় সেনেট-সভা হইতে নির্বাচিত বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ অথবা বাইরের শিক্ষাব্রতিগণ পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি চারিটি বিভিন্ন বিভাগে (Faculty) বিভক্ত, যথা, প্রথম : সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি। দ্বিতীয় : আইনবিদ্যা। তৃতীয় : চিকিৎসাবিদ্যা। চতুর্থ : ইঞ্জিনীয়ারিং বা যান্ত্রিক ও বাস্তুকর্ম বিদ্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সিণ্ডিকেট (Syndicate) ইহার কর্মনির্বাহক মণ্ডলী। ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার বা অধিপাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আট জন সদস্য লইয়া এই সিণ্ডিকেট গঠিত। সিণ্ডিকেট পরীক্ষক মনোনয়ন, পরীক্ষাসমূহের ব্যবস্থা, উপাধি, সম্মান ও পুরস্কার প্রদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করেন। স্কুল, কলেজ ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিবিধ বিষয়ক পাঠ্য-তালিকা (Syllabus) নির্বাচন করিবার উদ্দেশ্যে সিণ্ডিকেট কর্তৃক fellow অথবা সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচক মণ্ডলী (Board of studies) গঠিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকলের ফেলো (fellow) বা সদস্যগণের সহিত ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা অথবা ইউরোপের অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' বা সদস্যগণের কোন সাদৃশ্য নাই। ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যেরা সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক। দেশের মধ্যে যে

সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও সুবিদ্বান ব্যক্তি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকেই এই পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সকল সদস্যদের পদে ইউরোপীয়ান অথবা ভারতীয় যে কোন সুবিদ্বান ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই এবং শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক মণ্ডলীও নাই। স্কুল ও কলেজের উপাধি পরীক্ষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অধীনে ও ব্যবস্থা অনুসারে পরিচালিত হয়। ঐ সকল পরীক্ষার শেষে কয়েক মাস পরে ছাত্রগণ পরীক্ষার ফলাফল জানিতে পারে। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যথাসময়ে উপাধিপত্র পাইয়া থাকে। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে।

যে সমস্ত বিষয়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় সেই বিষয়গুলি—প্রথম: ইংরাজী সাহিত্য; দ্বিতীয়: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রাচীন অথবা চলিত ভাষা; তৃতীয়: পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন; চতুর্থ: ইতিহাস; পঞ্চম: ভূগোল; ষষ্ঠ: পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি।[১৯]

উচ্চ ইংরাজী স্কুলের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হইতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনে ভারতবাসীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অনেক হাইস্কুল ও কলেজ আছে। কলেজে প্রবেশ

১৯। এই বইয়ের বিষয়-বস্তু বক্তৃতা আকারে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রদত্ত হয়। এখন সব আমূল পরিবর্তন হইয়াছে।

করিবার পর ছাত্রেরা এফ. এ.র (First Examination in Arts) জন্য দুইবৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করে। ইহার পর তাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিতে হয়। ছাত্রদের নিম্নলিখিত বিষয় অধ্যয়ন করিতে হয়ঃ (১) ইংরাজী সাহিত্য, (২) প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন কোন ভাষা অথবা প্রাদেশিক ভাষার (Vernacular) সাহিত্য, (৩) তর্কশাস্ত্র, (৪) গণিত, (৫) ইতিহাস ও ভূগোল এবং (৬) পদার্থবিজ্ঞান। দুই বৎসরে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ও তাহাদের পরীক্ষায় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইলে বি. এ. ক্লাসে তাহারা ভর্তি হয়। এখানেও শিক্ষালাভের নির্দিষ্ট কাল দুই বৎসর। বি. এ. ক্লাসের জন্য দুইটি বিভাগ আছেঃ সাহিত্য বিভাগ এবং বিজ্ঞান বিভাগ। সাহিত্য বিভাগের জন্য (১) ইংরাজি সাহিত্য, (২) কোন একটি প্রাচীন সাহিত্য অথবা প্রাদেশিক ভাষা (Vernacular), (৩) গণিত এবং চতুর্থ এবং পঞ্চম বিষয়ের জন্য নৈতিক দর্শন, ইতিহাস, এবং উচ্চতর গণিত—এই তিনটি হইতে দুইটি। বিজ্ঞান বিভাগ (১) ইংরাজি, (২) গণিত, (৩) রসায়ন, (৪) প্রাকৃতিক ভূবিজ্ঞান, (৫) পদার্থ বিজ্ঞান, শারীর বৃত্ত অথবা ভূবিদ্যা হইতে একটি বিষয়। এম. এ. ডিগ্রির জন্য সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, নৈতিক দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস অথবা গণিত-এর যে কোন একটিতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত কোন কোন ছাত্র আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিবার জন্য মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয় এবং যথাকালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ সকল বিষয়ে উপাধি লাভ করে।

বিগত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্য আরব্ধ হইয়া এই শিক্ষানীতি চলিয়া আসিতেছে। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে স্কুল ও কলেজগুলিতে মোট ছাত্র-সংখ্যা ৪৪০৫০৪২। এই সময়ে শহরকে বাদ দিয়া প্রত্যেক

সেখানে সকল প্রকার শিক্ষায়তনের মোট ছাত্র-সংখ্যা মাত্র ৪৪,১৮,০০০ জন। ভারতবাসীদের শিক্ষার জন্য ইংরাজ সরকার কতটাকা ব্যয় করেন? প্রতি প্রজার শিক্ষার জন্য বার্ষিক মাত্র ১½ পেনি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ পয়সা খরচ হইতেছে! বাস্তবিক কী অজস্র টাকাই না ব্যয় হইতেছে! যে ভারতে শিক্ষার এমন ব্যবস্থা, সেখানে এই দেড়শত বৎসর ইংরেজ শাসনের ফলে যে পুরুষদের মধ্যে শতকরা এগারজন ও মেয়েদের মধ্যে দুইশতের মধ্যে একজন মাত্র শুধু লিখিতে ও পড়িতে পারিবে তাহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে? ভারতে জাতীয় শিল্পকার্য এখন এমন ধ্বংস হইয়াছে যে, সে কার্য শিখিবার জন্য শ্রমশিল্প, যন্ত্রপাতি-নির্মাণ ও অন্যান্য কার্যকরীবিদ্যার জন্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আজ সম্পূর্ণ প্রয়োজন। কিন্তু বিদেশী শাসকজাতি এবিষয়ে একপ্রকার উদাসীন। ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে অবহেলা ব্রিটেনের চরিত্রে ঘোর কলঙ্ক আরোপ করে।"[২০]

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কোনও স্কুল বা কলেজ নাই। বড়লাটের কাউন্সিলের তৎকালীন অন্যতম আইন সদস্য মিষ্টার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (Drinkwater Bethune) স্বয়ং দশ হাজার পাউণ্ড (দেড় লক্ষ টাকা) দান করিয়া কলিকাতায় সর্বপ্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[২১] এই বিদ্যালয় ভারতের বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত। এখানে অধ্যয়ন করিয়া

২০। Rev. Dr. J. T. Sunderland: Paper on *The Causes of Famines in India* before the Canadian Institute, p. 22.

২১। বেথুন সাহেব প্রতিষ্ঠিত এই বালিকা-বিদ্যালয় কয়েক বৎসর পরে একটি উন্নতিশীল কলেজে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতায় ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এখানে কয়েকশত ছাত্রী অধ্যয়ন করিয়া

ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রদের ন্যায় কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভারতীয় ছাত্রীরাও প্রতি বৎসর উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে দেশহিতৈষী ও স্বদেশপ্রাণ হিন্দুরা নিজেদের প্রচেষ্টা, উদ্যম ও অর্থদ্বারা অনেক স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। বহু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকাগণের একত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। সমগ্র ভারতে বালিকা ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।[২২] কিন্তু এমন অনেক হিন্দু পরিবার আছেন, যেখানে বালিকারা বাড়ীতে থাকিয়াই গৃহ-শিক্ষক ও অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া বিদুষী হইয়া উঠেন। ভারতে এমন অনেক নারী আছেন, যাঁহারা আজ পর্যন্তও লেখাপড়ার সংস্রবে আসেন নাই। কিন্তু নিরক্ষর হইলেও ধর্মভাব, নৈতিক পবিত্রতা, চারিত্রিক শুচিতা, গৃহধর্ম-পালন ও মানুষের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা বিষয়ে তাঁহারা অনেক পরিমাণে উন্নতা। তাঁহারা বহু ধর্মপুস্তক, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য ও মহাপুরুষদের পুণ্য জীবন ও উপদেশ প্রভৃতি পণ্ডিত ও কথক প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়া সুশিক্ষা লাভ করেন।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ; সেখানে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা পঁচাশী জন কৃষিজীবী। কিন্তু উন্নত প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া যাহাতে এই কৃষিজীবী ব্যক্তিরা আপনাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, সে উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট কৃষিশিক্ষা বিস্তারের জন্য

উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন। ইঁহাদের অনেকে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

২২। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশঃই ইহার বহুগুণ বাড়িয়া চলিয়াছে।

কোন স্কুল স্থাপন করেন নাই। এই সেদিন মাত্র একটি কৃষিবিদ্যার কলেজ পুনায় স্থাপন করিয়াছেন।

একজন ভারতবাসীর বার্ষিক আয় মাত্র তিরিশ টাকা। এই অতি সামান্য আয় হইতে আবার শতকরা প্রায় পনের টাকা সরকারের খাজনা দিতেই খরচ হইয়া যায়। এই প্রকার আর্থিক অভাবে কী করিয়া লোকে শিক্ষিত হইতে পারে? তথাপি যে সমস্ত ভারতবাসী এই দারুণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, তাঁহারাও রাজ সরকার হইতে কোন উচ্চপদ লাভের আশা করিতে পারেন না। কারণ সমস্ত উচ্চপদগুলি ইংরাজদের জন্যই সংরক্ষিত। এই সকল ইংরাজ কর্মচারীদের প্রত্যেকেরই বেতন অনেক শত টাকা। কিন্তু ইঁহাদের অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত, সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত যে সমস্ত ভারতবাসী কার্য করেন, তাঁহাদের কাহারও মাহিনা ত্রিশ, চল্লিশ বা পঞ্চাশ এবং সহস্রের মধ্যে একজনের বেতন একশত টাকা মাত্র। কিছুকাল পূর্বেও চাকুরীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভারতবাসীরা অনেকেই উত্তীর্ণ হইয়া নিজেরা উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়া অধিকতর বেতন পাইবার একটি সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জনের দ্বারা 'ইউনিভার্সিটি বিল' নামে এক আইন জারী হওয়ার ফলে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলগুলি সমস্তই সরকারের সম্পূর্ণ শাসনাধীনে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী অফিসে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইতে এখন ভারতবাসীরা বঞ্চিত হইয়াছে। এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের মনোনীত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহই উচ্চ সরকারী চাকুরীলাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন না। লর্ড কার্জন 'অফিস্যাল সিক্রেট্ বিল' (Official Secret Bill) নামে আইন বিধিবদ্ধ করিয়া দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ভারতবাসীদের কয়েকজন বিচক্ষণ ও

সুবিদ্বান্ ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি জাতীয়তাবাদী দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ভারতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সরকারের শাসনপদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় কৌশল ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া স্বাধীন মনোভাব ব্যক্ত করিবার অধিকার তাহাদের নাই। এইভাবে ভারতের জনসাধারণকে একেবারে গভীর অজ্ঞানের অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছে। শাসনকার্যে একান্ত স্বৈরাচার অবলম্বন করা সত্ত্বেও লর্ড কার্জন অন্ততঃ একটি সৎকার্য করিয়াছেন। সেটি হইতেছে অতিরিক্ত রাজস্ব হইতে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে দুই লক্ষ বিশ হাজার পাউণ্ড (তেত্রিশ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর করা। আজিকার দিনে ভারতের একান্ত প্রয়োজন বিনাবেতনে শিক্ষালাভের অবাধ সুযোগ। ভারতবর্ষের জনসাধারণকে উন্নত করিতে হইলে শ্রমশিল্প ও কারিগরী শিক্ষা প্রদানের জন্য অনেক অবৈতনিক স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা এখন একান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতীত মেয়েদের জন্যও আরও বহু স্কুল-কলেজ খুলিতে হইবে। কিন্তু এই সব শিক্ষালয় খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত হইতে দেওয়া কোন-ক্রমে সঙ্গত নয়। দেশের যথার্থ হিতৈষী ও জনসেবক হিন্দুদের এই সকল স্কুল কলেজ নিজেদেরই তত্ত্বাবধান করিতে হইবে। এক্ষণে ভারতে এমন একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন যাহার অধীনে বহু স্কুল ও কলেজে দেশের ছাত্র ও ছাত্রীরা বিনা ব্যয়ে উচ্চশিক্ষার সহিত শ্রমশিল্প, কারিগরী ও অন্যান্য কার্যকরী বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষালাভের সর্ববিধ সুযোগ পায়।

ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন ছিল তখন সেই গৌরবদীপ্ত সুদূর অতীতে জ্ঞান বিজ্ঞান বিদ্যা ও প্রতিভার পরাকাষ্ঠায় সে জগতের সভ্যতার উন্নতশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। আজিকার দিনেও বহু শতাব্দী পরাধীন থাকিয়াও ভারতবাসীরা জগতের নিকট প্রমাণ করিয়াছেন—

মানব-প্রতিভার সকল দিকেই তাহারা ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী মনীষীদের সমকক্ষ। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা আজ পরাধীন অসহায় জাতিতে পরিণত। ব্রিটিশ শাসনের দারুণ দুর্বহ গুরুভার হিন্দুদের উন্নতির আগ্রহকে নিষ্পেষিত করিতেছে। হিন্দুর জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ ও অগ্রগতির শক্তিকে তাহা ধ্বংস করিতেছে। অধিকন্তু ইংরাজ শাসননীতির ফলে ভারতবাসী দিনে দিনে আরও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন। এই প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী হিন্দুরা নিজেদের ব্যয়ে ইংরাজ সরকার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষা অপেক্ষা উচ্চতর শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের জন্য প্রতিভাশালী ছাত্র ও ছাত্রীদের ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণী ও আমেরিকায় পাঠাইতেছেন। হিন্দুরা শিক্ষাবিমুখ জাতি নহেন। শিক্ষার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ও জ্ঞানলিপ্সা প্রবল। ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ইংরাজ জাতির নিকট হিন্দুরা কৃতজ্ঞ। ইংরাজ যদি ভারতবাসীর কোনও উপকার করিয়া থাকেন তবে তাহা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন। ইংরাজ শাসনের সমগ্র ইতিহাসে ভারতবাসীর প্রতি ইংরাজ জাতির ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ। ভারতে এক্ষণে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বীজ উপ্ত হইয়াছে, ভবিষ্যতে ভারতীয় বংশধরগণ তাহার সুফল লাভ করিবেন। মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার বলিয়াছেনঃ "জীবনের সম্পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে যে জ্ঞানলাভ তাহাই শিক্ষা।" বর্তমানে প্রচলিত ভারতে শিক্ষা-নীতির দোষ, ত্রুটি ও অপূর্ণতা সমস্তই হিন্দুরা জানিতে পারিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে যে সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ শিক্ষানীতি আছে তাহাকে নিজেদের দেশে স্থাপিত করিয়া আপনাদের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার সাধনের জন্য হিন্দুরা এখন প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যের মুকুটমণ্ডিত হইয়া উঠুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ॥

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের দিকচক্র উদ্ভাসিত করিয়াই আর্য সভ্যতার উদার উদ্ভিন্ন উষালোকের প্রথম প্রকাশ দেখা দিয়াছিল। (গ্রীস, রোম, আরব, পারস্য, অথবা আর কোন দেশেই এই আর্য সভ্যতার প্রথম প্রকাশ ভারতবর্ষের পূর্বে দেখা দেয় নাই। এই জন্যই ভারতবর্ষকে যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, বিজ্ঞানের বহুবিধ শাখা, জ্যোতিষ, নানাপ্রকার ললিতকলা, সঙ্গীতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং উচ্চশ্রেণীর নীতিবিজ্ঞান সমন্বিত সর্বোচ্চ ধর্মাদর্শের আদি জন্মভূমি বলা উচিত।) ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের শিখান হইয়া থাকে যে, গ্রীস ও রোম ইউরোপীয় সভ্যতার উৎপত্তিস্থল এবং পৃথিবীর যাবতীয়, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত গ্রীস এবং রোম হইতেই উদ্ভূত। কিন্তু ঐতিহাসিকতার দিক হইতে ইহা সত্য নয়। অন্যের কথা দূরে থাকুক—ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক, ও পুরাতত্ত্ববিদ্ এবং প্রাচ্যসভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মনীষী পণ্ডিতেরাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, বরং গ্রীসই তাহার বহু শ্রেষ্ঠ দার্শনিক চিন্তাধারা, বিজ্ঞান, কৃষ্টি এবং নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারার জন্য ভারতবর্ষের নিকট ঋণী।

যদি আমরা প্লিনি (Pliny), ষ্ট্র্যাবো (Strabo), মেগাস্থিনীস (Megasthenes), হেরোডোটাস (Herodotus), পরফাইরি (Porphyry) এবং অন্যান্য দেশের বহু প্রাচীন মনীষীদের

ঐতিহাসিক ও ভ্রমণবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় রচনাসমূহ অধ্যয়ন করি তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব ভারতবর্ষের সভ্যতাকে তাঁহারা কি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। (প্রকৃতপক্ষে ১৫০০ হইতে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ এই কালের মধ্যে হিন্দুগণ আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন যে, সেই সময়ে আর অন্য কোন জাতিই এসমস্ত বিদ্যায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে অথবা তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারেন নাই। অপরপক্ষে যে সমস্ত জাতি যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহুপূর্বে বাণিজ্য বা অপর কোন ব্যাপারে হিন্দুদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দুসভ্যতার ভাবে প্রভাবিত হইয়া আপনাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হিন্দু আদর্শের ছাঁচে গড়িয়াছিলেন।) দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি যেমন আমার পূর্ব এক বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, বৈদিক যুগে হিন্দুরা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বেদীর আকার ও আয়তন রচনার উদ্দেশ্যে জ্যামিতিবিদ্যার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এই রেখা ও ক্ষেত্র অঙ্কন-বিদ্যাই ক্রমশঃ জ্যামিতি-বিদ্যায় পরিণতি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর বহু পুরাতত্ত্ববিৎ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বপ্রথম স্থান লাভ করিবার জন্য গ্রীসের নিকট নয় পরন্তু ভারতবর্ষের নিকটেই এই পৃথিবী ঋণী। কোনও সমকোণী ত্রিভুজের (right-angled triangle) সমকোণের সম্মুখীন বাহুর (hypotenuse) উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র (square) যে অপর দুইটির বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের (square) সমষ্টির সমান[১]—এই জ্যামিতিক

১। "The square of the hypotenuse of a rectangular triangle is equal to the squares of its other two sides."

উপপাদ্যটির (theorem) উদ্ভাবক বলিয়া গ্রীকেরা পিথাগোরাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পিথাগোরাসের জন্মগ্রহণের অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্বেও হিন্দুরা এই বিষয়টির সহিত খুবই পরিচিত ছিলেন। এই জ্যামিতিক সত্যটির সম্বন্ধে হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত দুইটি সূত্র আছে :

> "প্রথম কোনও বর্গক্ষেত্রের (square) কর্ণের (diagonal) উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের পরিমাণফল পূর্বোক্ত বর্গক্ষেত্রের পরিমাণফলের দ্বিগুণ। দ্বিতীয়,—কোনও সমকোণবিশিষ্ট (right-angled) আয়ত ক্ষেত্রের (oblong) কর্ণের (diagonal) উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ-ফল ঐ আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণের সম্মুখীন অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত দুই বর্গ-ক্ষেত্রের পরিমাণ-ফলের সমান।[২]

জ্যামিতির এই সূত্র হিন্দুদের সুল্বসূত্রের অন্তর্গত। খৃষ্ট-পূর্ব অষ্টম শতাব্দী সুল্বসূত্রের রচনা কাল। গ্রীকদের মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, পিথাগোরাস ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ ইহা সত্য ঘটনা।[৩] কারণ পিথাগোরাসের রচনাবলীর মধ্যে আমরা এমন সমস্ত চিন্তা ও ভাবের সমাবেশ দেখিতে পাই যে, সে সমস্ত ভাব ও চিন্তা তখন একমাত্র হিন্দুদেরই জানা ছিল। ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোনও জাতির নিকট সে সমস্ত বিষয় পরিচিত ছিল না। সম্ভবত পিথাগোরাস হিন্দুগণের নিকট হইতে জ্যামিতি,

২। "The square of the diagonal of a square is twice as large as that square."
"The square of the diagonal of an oblong is equal to the square of both its sides."

৩। (i) Weber: *History of India*, pp. 38-39.
(ii) *Legacy of India*, p.4.

গণিত, জন্মান্তরবাদ, আত্মার জন্মের পূর্বে অস্তিত্ব, জীবাত্মার পরিণামে স্বর্গপ্রাপ্তি, অথবা তাহা অপেক্ষা আরও উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় চরম মোক্ষলাভ এবং যোগসাধনা, আমিষ ভোজনের নিষিদ্ধতা; নিরামিষ ভোজন, সংখ্যা-জ্ঞান ও পঞ্চমভূতের অস্তিত্ব এই সকল বিষয়ের, প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কারণ এই তত্ত্বগুলি তখন গ্রীসে অথবা মিশরে কাহারও জানা ছিল না। মিশরবাসীরা ও গ্রীকেরা তখন মাত্র ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, এই চারিটি ভূতের (উপাদানের) সন্ধান পাইয়াছিলেন। পঞ্চম পদার্থ ব্যোম (ether) সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। সেই প্রাচীন যুগে ভারতের হিন্দুরাই প্রথম ব্যোমের অস্তিত্ব অবগত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পিথাগোরাসের জন্মগ্রহণের বহুকাল পূর্বে হিন্দুরা এই তত্ত্ব ভারতে প্রচার করিয়াছেন। অধ্যাপক ই. ডব্লিউ. হপকিন্স্. (Prof. E. W. Hopkins) তাঁহার প্রণীত *Religions of India* অর্থাৎ 'ভারতের ধর্মতত্ত্ব-সমূহের বিবরণ' নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন: "খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতাব্দীরও আগে এবং পিথাগোরাসের জন্মগ্রহণের বহুপূর্বে তাঁহার ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্ব বলিয়া পরিচিত মতবাদগুলি ভারতেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।"[৪]

যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বন্ধ হওয়ার জন্য অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক হিন্দুদের মধ্য হইতে জ্যামিতির ব্যবহার ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতে থাকে এবং বীজগণিত ও পাটিগণিত জ্যামিতির স্থান অধিকার করে। অঙ্কশাস্ত্রে গ্রীকরা কখনই হিন্দুদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। দশমিক ভগ্নাংশের অঙ্ক উদ্ভাবনার জন্য

৪। E. W. Hopkins; *Religions of India.*

সমগ্র পৃথিবী হিন্দুদের নিকট ঋণী। আরবরা এই দশমিকের অঙ্ক হিন্দুদের কাছে শিখিয়া পরে তাহা সমস্ত ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। এই বিদ্যা গ্রীক ও রোম্যানদের মধ্যে জানা ছিল না। এই দশমিক অঙ্কের প্রণালী উদ্ভাবিত না হইলে ব্যবহারিক শাস্ত্ররূপে পাটীগণিতের (Arithmetic) কোনই সার্থকতা সম্ভব হইত না। হিন্দুরাই আরবদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জাতিদের বীজগণিত (Algebra) শিক্ষা দিয়াছিলেন। আরবেরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ইহা তাঁদের ভাষায় অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিওনার্দো দা পিশা (Leonardo da Pisa) ইহা ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমগ্র পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট হইতে বীজগণিত সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দুগণই সমতলক্ষেত্র ও বৃত্তাকার সম্বন্ধীয় ত্রিকোণমিতির (Trigonometry) প্রথম শিক্ষাদাতা। বিশ্ববিখ্যাত হিন্দু গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানবিৎ ভাস্করাচার্য ১১১৪ হইতে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি বীজগণিত, পাটীগণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিপুলকায় ও মৌলিক-তথ্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ রচনাদ্বারা ঐ সম্বন্ধে যাবতীয় সমস্যার সমাধান ও প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[৫] অনেক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও গণিতবেত্তা পণ্ডিত

৫। পাশ্চাত্ত্যদেশীয় সুপণ্ডিত অধ্যাপক কোলব্রুক (Prof. Colebrooke) ভারতীয় মনীষীদের উদ্ভাবিত বীজগণিত ও পাটীগণিতের অন্তর্গত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। বৃত্তাকার ত্রিকোণমিতি (Spherical Trigonometry) সম্বন্ধে কোন কোন অংশ অধ্যাপক উইলকিন্সনের দ্বারা ভাষান্তরিত হইয়াছে।

ভাস্করাচার্য প্রদত্ত গণিত বিষয়ক বহু সমস্যা তাঁহার জীবন-কালের বহু শত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাধান করিতে সমর্থ হন।৬ জ্যোতি-র্বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য অনুসন্ধানে হিন্দুগণই সর্বপ্রথম গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্র, চন্দ্র, রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপুঞ্জের বিভাগ ও অবস্থানক্ষেত্র নির্ণয় করিয়াছিলেন। চীন

৬। "To find the value of x so that ax^2+b shall be a square number" এই গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। এখানে তাহা বর্ণিত হইল:
অধ্যাপক ফ্রিম্যাট (Prof. Fremat) এই পুরাতন সমস্যাটির কিয়দংশ সমাধান করিবার পর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বীজগণিতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতগণকে ইহার সমাধানের জন্য বহুবার আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ইউলার (Euler) অবশেষে ইহার সমাধান করেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু মনীষী ভাস্করাচার্য যেভাবে ইহার সমাধান করিয়াছিলেন ইউলারও ঠিক সেই সমাধানে পৌঁছান। আর একটি প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য যে প্রণালীতে তাহা সমাধান করিয়াছিলেন ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ব্রুঙ্কারও (Lord Brounker) ঠিক সেই ভাবেই তাহা সমাধান করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের একটি সাধারণ সমাধান হিন্দু মনীষী ব্রহ্মগুপ্ত সপ্তম শতাব্দীতে যেভাবে করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিত ইউলার তাহা ব্রহ্মগুপ্তের পরে সপ্তদশ শতাব্দীতেও করিতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে মনীষী দ্যে লা গ্রাঁজ্ (De La Grange) ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে তাহার সমাধান করিতে সমর্থ হন। হিন্দু গণিতজ্ঞগণের বহু পরিচিত কুট্টকপ্রথা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ জানিতেন না। অবশেষে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যাচেট দ্যে মাজেরিয়াক (Bachet de Mezeriac) ইহার অনুবাদ প্রকশে করেন। Civilization in Ancient India, Vol II. P, 246.

ও আরব দেশবাসিগণ বহু কাল পরে হিন্দুদিগের নিকট হইতে এই সমস্ত বিষয় শিখিয়াছিলেন। বৈদিক সূক্তসমূহ গান করিবার পদ্ধতি হইতেই হিন্দুরা কালক্রমে সঙ্গীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে গান করিবার জন্যই প্রধানতঃ সামবেদ রচিত হইয়াছিল। সপ্তস্বর ও তিনগ্রাম (octave) সম্বন্ধে হিন্দুরা গ্রীকদিকের বহু পূর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন। সম্ভবত গ্রীকগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতেই ইহা শিখিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত জার্মাণ সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ওয়াগ্নার (Richard Wilhelm Wagner) তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতশাস্ত্রে গানের ধুয়া অথবা 'Leading motive' বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ বিষয়ে ভারতবাসীদের কাছে তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। এই 'Leading motive' বা গানের ধুয়া হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। হিন্দুদের সঙ্গীত শাস্ত্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচয় না থাকার জন্যই পাশ্চাত্যদেশীয় সঙ্গীত-শিক্ষার্থিগণ ওয়াগ্নারের[৭] সঙ্গীতের আভ্যন্তরিক রস, মর্মকথা ও মাধুর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের লাটিন অনুবাদ পাঠ করিয়াই ওয়াগ্নার ইহার অনেক তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এবিষয়ে তিনি যে জার্মাণ দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের (Schopenhauer) সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন, সে কথা বোধ হয় আপনাদের অনেকেরই জানা আছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির জন্যও পাশ্চাত্ত্য জগৎ ভারতের নিকট ঋণী। এই গ্রন্থের এক পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি বলিয়াছি যে, আলেক-

৭। রিচার্ড হ্বিলহেল্ম ওয়াগ্নার ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে লাইপ্‌জ্যিগ্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভিনিস্ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জাণ্ডারের (Alexander the Great) যুদ্ধশিবিরে কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক বাস করিতেন। শুধু তাহাই নয় বরং গ্রীক চিকিৎসকগণ অপেক্ষা হিন্দু চিকিৎসকগণকেই আলেকজাণ্ডার অধিকতর পছন্দ করিতেন। মেগাস্থিনীস, নিয়ার্কাস (Nearchus) ও আরিয়ান্ (Arrian) হিন্দু চিকিৎসকদের চিকিৎসা-নৈপুণ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। লণ্ডনের কিংস্ কলেজের (King's College) অধ্যাপক ডক্টর রয়লি (Dr. Royle) *Hindu Medicine* নামক তাঁহার সুবিখ্যাত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, গ্রীসদেশবাসী মনীষী হিপোক্রেটস (Hippocrates) পাশ্চাত্ত্য দেশে 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্তক' বলিয়া অভিহিত হন। তিনি থেসালে নগরে ৪৬০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। *Materia Medica* নামক তাঁহার গ্রন্থের যাবতীয় তত্ত্ব তিনি ভারতবর্ষীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৮] ডক্টর রয়লি বলিয়াছেন: "হিন্দুদিগের নিকট হইতেই আমরা (ইউরোপীয়েরা) চিকিৎসা বিত্তার প্রাথমিক তত্ত্বগুলি গ্রহণ করিয়াছিলাম।"[৯]

(পাশ্চাত্ত্য দেশে ইতিহাস রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক, গ্রীক মনীষী হেরোডোটাসের (Herodotus) অবস্থিতি-কাল খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। তিনি বলিয়াছেন, প্রাচীন কালে হিন্দুরাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ছিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণ মিশরবাসীদের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র হইতে জানা যায় যে, ব্যাবিলন এবং সিরিয়াবাসীদের সহিতও হিন্দুদের ব্যবসা-

৮। গ্রীক্ চিকিৎসাবিধানবিদ্ হিপোক্রেটসের ৩৫৭ খৃষ্টাব্দে এথেন্সে মৃত্যু হইয়াছে।

৯। Vide also Sir P. C. Roy's *Hindu Chemistry.*

বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। অপর এক প্রামাণ্য সূত্র হইতে আমরা অবগত হই যে, জনৈক হিন্দু দার্শনিক মনীষী এথেন্স নগরীতে সোক্রাটেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।) অধ্যাপক মোক্ষমূলার তাঁহার *Psychological Religion* নামক গ্রন্থে সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারি সোক্রাটেশের সহিত এই হিন্দু দার্শনিক মনীষীর আলাপ হইয়াছিল। তিনি সোক্রাটেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—সোক্রাটেশের দর্শনে কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার উত্তরে সোক্রাটেশ বলিয়াছিলেন—তাঁহার দর্শনে মনুষ্যজীবনের তত্ত্বান্বেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে সেই হিন্দু দার্শনিক মনীষী সহাস্যে সোক্রাটেশকে বলিয়াছিলেন: "ঐশ্বরিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ না করিয়া আপনারা কিরূপে মানবীয় তত্ত্বকে জানিতে পারিবেন?" এই প্রকার উত্তর একমাত্র হিন্দু ব্যতীত আর অন্য কেহই দিতে পারেন না। কারণ হিন্দুগণ জানেন—ঐশ্বরিক জ্ঞান হইতেই সর্বপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি। অতএব সর্বাগ্রে ঐশ্বরিক জ্ঞান লাভ অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া মানব-জীবনের কোন জ্ঞানের জন্য তাঁহারা উৎসুক হইতে চাহেন না।

রালফ্ ওয়াল্‌ডো এমার্সন (Ralph Waldo Emerson) বলিয়াছেন: "প্লেটো ইউরোপ ও এশিয়ার ভাব সমন্বয়ের অন্যতম আধার ছিলেন। তাঁহার দার্শনিক রচনাবলীতে প্রাচ্যদেশীয় চিন্তাধারা রূপ সূর্যোদয়ের সুবর্ণদীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।" (বাস্তবিক প্লেটোর ইন্দ্রিয় সংযম ও সাধনা সম্বন্ধীয় শিক্ষাবলীতে দেখা যায়, তিনি গ্রীক অপেক্ষা অধিকতর হিন্দুভাবাপন্ন। কারণ পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতির মধ্যে গ্রীকজাতিই সংযম ও সাধনায় সর্বাপেক্ষা কম আগ্রহশীল। আমার বন্ধু অধ্যাপক এডওয়ার্ড হাওয়ার্ড গ্রিগস্ (Prof. Edward Howard Griggs) নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির এক অধিবেশনে

'প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ' (*Philosophy of Plato*) নামক এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র 'ইন্দ্রিয়-সংযমের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় একথা প্লেটো প্রাচ্য দর্শনের প্রভাববশতঃই বলিয়াছেন।) তাঁহার এই উক্তি কখনই গ্রীক চিন্তাধারার অনুরূপ নয়। বিশেষতঃ আমরা যখন উপনিষদের সহিত তুলনা করিয়া প্লেটোর দার্শনিক রচনাবলী পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই যে, তাঁহার কথিত 'গুহার মধ্যস্থিত শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব' বেদান্তবর্ণিত মায়াবাদের রূপক বর্ণনা মাত্র। এই প্রপঞ্চময় জগৎ স্বপ্নবৎ, তাঁহার এই উক্তি এবং মানুষের দেহকে অশ্বরথের সহিত তুলনা প্রভৃতি তাঁহার জীবন-কালের বহু শতাব্দী পূর্বেকার বৈদিক ঋষিবৃন্দ প্রদত্ত বিশেষ পরিচিত উপদেশসমূহের প্রতিধ্বনি। দৃষ্টান্তস্বরূপে কঠ উপনিষদের একটি উক্তি আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছিঃ "এই মানবদেহ রথ, আত্মা দেহরথের রথী, বুদ্ধি ইহার সারথি, মন ইহার অশ্ব বল্‌গা (লাগাম), ইন্দ্রিয়গণ ইহার অশ্ব এবং ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহ ইহার গমন-পথ।"১০ ইংরাজ জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) এই বিষয় সমর্থন করিয়া বলিয়াছেনঃ "বেদান্ত এবং ইহার অন্তর্গত শিক্ষা-বিষয়ক বহু সুন্দর গ্রন্থাদি পাঠ করিতে করিতে কেহ বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারে না যে, পিথাগোরাস এবং প্লেটো তাঁহাদের

১০। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"
—কঠোপনিষৎ ৩।৪

বহু পূর্বকালবর্তী ভারতীয় ঋষিবৃন্দের সহিত একই উৎস হইতে আপনাদের জ্ঞানধারাকে আহরণ করিয়াছিলেন।”[১১]

আপনাদের জানা থাকিতে পারে যে, অধ্যাপক মোক্ষমূলার এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিৎগণ স্বীকার করেন য়্যারিষ্টটলের তর্কশাস্ত্র সম্ভবতঃ হিন্দুদের ন্যায়শাস্ত্রেরই গ্রীক ভাষায় রূপান্তরিত বস্তু মাত্র। আপনাদের একথাও মনে থাকিতে পারে যে, অধ্যাপক হপকিন্স্ (Prof. Hopkins) তাঁহার *Religion of India* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন থেলিস্ (Thales) ও পারমিনাইডিসের (Parmenides) জন্মগ্রহণের বহুকাল পূর্বে তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তাধারা ভারতবর্ষীয় ঋষিরা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আর গ্রীসের ইলিয়াটিক দর্শনকে (Eleatic School of philosophy) মনে হয় যেন উহা উপনিষদের ভাবরাশিরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। এমন কি, তিনি ইহাও মনে করেন এনাক্সিমেণ্ডার (Anaximander) এবং হিরাক্লিটাসের (Heraclitus) উদ্ভাবিত দার্শনিক চিন্তারাশি বোধ হয় প্রথমে গ্রীসদেশে উদ্ভব হয় নাই। বাস্তবিক আমাদের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের (Alexander the Great) ভারত আক্রমণের পর হইতে ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সম্বন্ধ আরও গভীর হইয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রাচীন কাল হইতেই বহু হিন্দু দার্শনিক এথেন্স (Athens) এবং গ্রীসের আরও বহু স্থানে বাস করিতেন। প্রাচীনকালে গ্রীসপ্রবাসী এই সকল হিন্দু-দার্শনিকেরা Gymnosophists নামে অভিহিত হইতেন। সে সময়ে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর

১১। *Works of Sir William Jones* (Calcutta Edition) pp. 20, 125 and 127.

গ্রীস ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের এক প্রধান মিলনকেন্দ্র ছিল এবং এই জন্য হিন্দু ও পাশ্চাত্ত্যজাতিদের মধ্যে এই নগর তাঁহাদের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সুযোগ লাভের এক বিশেষ প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ হইতে বহু মহাজ্ঞানী পুরুষ গ্রীসে গিয়াছিলেন। পরফাইরি (Porphyry) তাঁহাদের দিব্যজ্ঞান, নৈতিক পবিত্রতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বিশ্বের রহস্য উপলব্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। নিও প্লেটোনিজম্ মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক গার্বে (Prof. Garbey) বলিয়াছেন যে, হিন্দু দার্শনিকদের সহিত প্লটিনাসের ধর্ম ও দর্শনের মতবাদ সম্বন্ধে সাদৃশ্য বর্তমান। প্লটিনাসের শিষ্য পরফাইরি হিন্দুদের যোগসাধনার দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার একীভূত হওয়ার পদ্ধতি অবগত ছিলেন। এই যোগ-সাধনার পদ্ধতি পাশ্চাত্ত্যদেশের অধিবাসী ইহুদী, পারসী ও মিশরবাসী কাহারও সে সময়ে জানা ছিল না। প্লেটো এবং তাঁহার দার্শনিক মতাবলম্বীদের শিক্ষা ও প্রচারের ফলে নিও-প্লেটোনিষ্ট, ষ্টোইক (Stoics) প্রভৃতি সম্প্রদায় এবং আলেকজেন্দ্রিয়াবাসী ইহুদী মনীষী ফাইলো (Philo) হিন্দুদের দার্শনিক ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।[১২] যে Logos-তত্ত্ব

১২। **Neo-Platonists :** খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজেন্দ্রিয়া নগরে এই দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব ও প্রসারতা হইয়াছিল। গ্রীক দর্শন বিশেষতঃ প্লেটোর দার্শনিক মতবাদ এবং প্রাচ্যদেশীয় (ভারতীয়) যোগ-সাধনার সমবায়ে গঠিত। ভারতীয় যোগীদের ন্যায় এই মতাবলম্বীরাও ধ্যান ধারণা অভ্যাস দ্বারা ঐশ্বরিক সত্তাকে উপলব্ধি করা যায় ইহা বিশ্বাস ও তদনুযায়ী চেষ্টা করিতেন।

Stoics : জিনো নামক কঠোর তপস্বী ও মনীষী (Zeno f Citium) হইতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এথেন্স নগরীতে এই মতবাদের উদ্ভব

(শব্দব্রহ্মবাদ)[১৩] প্লেটোর দার্শনিক মতবাদের মূল ভিত্তি, যে তত্ত্ব নিও প্লেটোনিষ্টদের এবং ইহুদী মনীষী ফাইলোর দার্শনিক মতের প্রধান বনিয়াদ,—যাহার সম্বন্ধে সেণ্ট জন লিখিত খৃষ্টের জীবন-কথায় (Gospel according to St. John) প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে, তাহা

হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের মতবাদ তর্কশাস্ত্র, পদার্থ-বিজ্ঞান (Physics) এবং নীতিবিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ষ্টোয়িকরা কঠোর বৈরাগ্যবাদী এবং ধ্যানাভ্যাস, সংযম, তিতিক্ষা, বিষয়-সম্পত্তিতে নিস্পৃহতা ও সর্ববিধ ভোগসুখ ত্যাগের পক্ষপাতী। যে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ ইঁহাদের নিকট মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হয়।

১৩। **Logos:** Theory of Logos অথবা বাইবেলের শব্দব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে মনীষী অটো ফ্লাইডার (Otto Pfleiderer, D. D.) তাঁহার *The Jewis Greek Philosopy of Philo* নামক গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন: "এই Logos-conception বা শব্দ-ব্রহ্মবাদের ধারণাই আলেকজেন্দ্রিয়াবাসী ইহুদী মনীষী ফাইলোর (Philo, ইঁহার জীবনকাল ২০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) দার্শনিক মতের মূলসূত্র। ইহুদীদের ধারণায় পরিপুষ্ট বিশ্বসৃষ্টিকারী স্বপ্রকাশ আদিবাণী (*Word*) এবং ষ্টোইক-দের উদ্ভাবিত জগতের মধ্যে ক্রিয়াশীল ঐশ্বরিক জ্ঞানশক্তি (*Divine Reason*) এই উভয় মতবাদের সমবায়ে এই মত গঠিত হইয়াছে। ষ্টোইক্ মতাবলম্বীরা এবং ফাইলো উভয়েই বিশ্বাস করিতেন যে, এই আদিম Logos বা শাশ্বত শব্দ জগতের সৃষ্টি ও পালনকারী শক্তি। ইহা সুখদুঃখ পাপপুণ্য প্রভৃতি নানা বিপরীত বস্তুকে সর্বদা পৃথক ও বিরোধী করিয়া রাখে। এইজন্য ইঁহার নাম বিশ্বনীতি। ইহা নিখিল বিশ্ব বিষয়ের প্রয়োজন স্বরূপ, সর্বগত সর্বনিয়ামক ও সকলের নিয়ন্তা। তবে Stoic মতাবলম্বীদের ও ফাইলোর সহিত এই তত্ত্ব ব্যাপারে কিন্তু মতভেদও আছে। ফাইলো *Word* অথবা শাশ্বত শব্দকে কখনও ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন মনে করিতেন না, অথবা ইহাকে বিশ্বসত্তা (World substance) বলিয়া

সর্বপ্রথম ভারতেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বেদে আমরা এই শব্দব্রহ্মের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহাই হিন্দুদের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে প্রভাবিত ও গঠিত করিয়াছে। ভারত বহির্ভূত অন্যান্য দেশবাসীর ধর্মাদর্শেও এই শব্দব্রহ্মবাদ বা Logos-তত্ত্বের প্রভাব বর্তমান।

ধর্মগত ব্যাপারে খৃষ্টানধর্ম অনেক পরিমাণে ভারতের নিকট ঋণী। একথা শুনিয়া পাশ্চাত্ত্যদেশবাসী অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক সত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে

তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি ইহাকে ঈশ্বর ও জীবজগতের মধ্যবর্তী তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার নাম 'সর্বাগ্রে জাত ঈশ্বরের পুত্র' (first-born son of God), দেবদূতদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ (Oldest Angel), অথবা ত্রিত্ববাদের দ্বিতীয় ঈশ্বর (Second God)। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম সূচনা-কাল হইতেই মানবের ঈশ্বরানুভূতির ব্যাপারে ইহা মধ্যবর্তী (Mediator) হইয়া তাহার ধর্মসাধনার সহায়তা করেন। আবার তিনিই আবহমানকাল সূক্ষ্ম জড় পরমাণুসমূহকে একত্রিত এবং স্থূল বস্তুকে রূপায়িত করেন বলিয়া বিশ্বসৃষ্টির অন্যতম কারণ হইয়া আছেন।

"মানবজাতির ইতিহাসে বিশেষ করিয়া ইজরেল জাতির ধর্মসাধনব্যাপারে এই আদিম শাশ্বত শব্দ বা 'দ্বিতীয় ঈশ্বর' মানবের ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে মধ্যবর্তী পুরুষ (Mediator)। সাধারণতঃ ইনি আধ্যাত্মিক আদর্শের চরম পরিপূর্ণতা নহেন, কিন্তু মানবের মধ্যে যাহা কিছু মহান্, সত্য ও কল্যাণকর তিনি সে সকলের অবিশ্রান্ত উৎসস্বরূপ। যে সমস্ত মানবের অন্তরে তিনি অধিষ্ঠিত তাহাদের আধ্যাত্মিক ভোগ্যরূপে (real bread from heaven) তিনি নিজেকেই তাহাদের নিকটে প্রদান করেন। আর একমাত্র এই প্রকার মানবেরাই জগতের সর্ববিধ পাপ-প্রবৃত্তি ও ও সংসারের নিষ্ঠুর নিয়ম হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে চরম আশ্রয় পাইবে।" এ সম্বন্ধে J. M. Robertson : *Pegan Christ*, p. 40 দ্রষ্টব্য।

অস্বীকার করা অসম্ভব। যদি আমরা প্রাচ্যদেশীয় ধর্মমতগুলির ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, এ বিষয়ে এমন সমস্ত প্রমাণ আছে যেগুলি অকাট্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের অনুশাসন ও বিভিন্নদেশে তাঁহার দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণকে প্রেরণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্রাট অশোকের অবস্থিতিকাল ২৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। মহারাজ অশোক তাঁহার রাজত্বকালে বহু স্থানে প্রস্তরস্তম্ভে স্বীয় অনুশাসন ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুশাসন পাঠ করিলে জানা যায় যে, অশোক ভারতবর্ষের বাহিরে বহুদেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ধর্মপ্রচার কার্যে পাঠাইয়াছিলেন। সাইবেরিয়া হইতে সিংহল, চীনদেশ হইতে মিশর পর্যন্ত সর্বত্রই বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের দুইশত বৎসর পূর্বে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, আলেকজেন্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানেও বৌদ্ধধর্মের সাধনপদ্ধতি ও উন্নত নীতিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টের উপদেশবাণী বৌদ্ধদের এইবাদের জোরাল পুনরাবৃত্তি। খৃষ্টধর্মাবলম্বী ঐতিহাসিক মাহাফি (Mahaffy) এই সমস্ত বৌদ্ধধর্ম-প্রচারক সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—ইহারা যে খৃষ্টান ধর্মের অগ্রদূত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইঁহারা প্রচারকার্যের দ্বারা ইহুদীজাতির মধ্য হইতে সর্বত্যাগব্রতী এশিনী (Essenes) নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন।[১৪] স্বনামখ্যাত

১৪। **এশিনী সম্প্রদায় (The Essenes) :** যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্বে অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহুদীজাতির মধ্যে সাদিউকী (Sadducees) ও ফারিসী (Pharisees) নামে দুইটি সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। সাদিউকী সম্প্রদায়ের নাম ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্যাডক-এর (Sadoc)

রোম্যান ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny the Elder) খৃষ্টীয় ২৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এশিনীদের জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে প্লিনি বলিয়াছেন—ইহারা আজীবন

নাম হইতে উৎপন্ন। স্যাডক য়্যান্টিগোনাসের (Antigonus) একজন শিষ্য। য়্যান্টিগোনাস ২৬০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ধনী ইহুদীদের মধ্যে একজন প্রতাপশালী ধর্মনেতা ছিলেন। স্যাডক ও তাঁহার মতাবলম্বীরা পাপের শাস্তি পুণ্যের পুরস্কার এবং পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করিতেন না। সাদিউকীদের ধর্মমত ও বিশ্বাসবিধি শুধু ধনী ও সম্ভ্রান্ত-ব্যক্তিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে তাহা বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ব্যাবিলনের রাজা নেবুকাড্‌নেজার (Nebuchadnezzar) ৫৯৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে জেরুজালেম অধিকার করেন এবং বহুশত ইহুদীকে আপন রাজ্য ব্যাবিলনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৫৩৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে পারস্যরাজ সাইরাস (Cyrus the Great) ব্যাবিলন সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেন এবং অবরুদ্ধ ইহুদীদের মুক্তি দিয়া তাঁহাদের স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বহু বৎসর পারস্যদেশে অবস্থান করার ফলে এই সমস্ত ইহুদীর ধর্মমত অনেকাংশে পরিবর্তিত হয় এবং তাহারা জরথুস্ত্রের (Zoroaster) ধর্মনীতি ও বিশ্বাস অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্মবিশ্বাসের এই পরিবর্তনের জন্য সাদিউকীদের সহিত এই সমস্ত ইহুদীর মতভেদ হওয়ায় তাঁহারা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হন। 'হিব্রু' শব্দ 'Parush' হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম 'ফারিসী' (Separated বা বিচ্ছিন্ন দল) হইয়াছে।

ইঁহাদের পরবর্তীকালে ইহুদীদের নব সম্প্রদায়ের নাম 'এসিনী'। লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও ইহুদী জাতির সমাজতত্ত্ব ও ধর্মমতের ইতিহাসে সুপণ্ডিত ডক্টর এ. ক্যুয়েনেন (Dr. A. Kuenen) তাঁহার *Religion of Israel* গ্রন্থে বলিয়াছেন, এশিনীরা জনবহুল ও কোলাহলপূর্ণ নগরের বিলাস ও দুর্নীতির পঙ্কিল পরিবেশ হইতে

অবিবাহিত ও ব্রহ্মচারী থাকিয়া সর্ববিধ বৈষয়িক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নারীসম্পর্ক বর্জিত ও বৃক্ষতলবাসী সন্ন্যাসীদের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। একথা প্রমাণ করা যায় যে, যে সমস্ত বৌদ্ধ প্রচারক

বহুদূরে নির্জন গ্রামে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। Dead-Sea-র নিকটবর্তী কোনও স্থানে তাঁহাদের বাসভূমি ছিল।

এশিনীদের জীবন-যাপন প্রণালী সম্বন্ধে ডক্টর লিউইস্ জি. জেন্স্ (Dr. Lewis G. Janes) তাঁহার *A Study of Primitive Christianity* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের অনুমান একশত বৎসর পূর্বে ইহুদী জাতির মধ্য হইতে 'এশিনী' নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। হেরদের (King Herod) রাজত্বকালে এশিনীদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার ছিল। সম্প্রদায়গত আচার-নিষ্ঠায় এশিনীরা ফারিসীদের অপেক্ষা আরও গোঁড়া ছিলেন। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে যথারীতি অনুষ্ঠানের সহিত দীক্ষিত করা হইত। অবগাহন স্নান এই দীক্ষা-অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। দীক্ষিত এশিনীদের আজীবন ইন্দ্রিয়সংযম, ভোগসুখত্যাগ, সুনীতি ও নির্জনবাসের ব্রত গ্রহণ করিতে হইত। প্রত্যেক পর্বেই বিশেষতঃ বিশ্রাম-পর্বের (Sabath Day) দিনে রীতিমত অনুষ্ঠানের সহিত অবগাহন স্নান করার প্রথা এশিনীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রকাশ্য মন্দিরে বলিদান, উৎসবে যোগদান, কোন বিষয়ে শপথ করা তাঁহাদের মধ্যে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য তাঁহাদের কেহই টাকা জমাইতেন না এবং নিজস্ব বিষয় সম্পত্তি বলিয়া কোন বস্তুরই তাঁহারা অধিকারী ছিলেন না। দারিদ্র্য, সংযম, পবিত্রতা, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাঁহারা অবলম্বিত ব্রতরূপে পালন করিতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সমস্ত সম্পত্তি সঙ্ঘের সাধারণ ভাণ্ডারের অধিকারভুক্ত করা হইত। এশিনীরা সকলেই অবশ্য একস্থানে অধিক-দিন বাস করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানা স্থানে পরিব্রাজক

প্রাচীনকালে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন ও মিশরে সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন সন্ন্যাসী এশিনী সম্প্রদায় তাঁহাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। শেলিং (Schelling) সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer), ডিন্ ম্যানসেল (Dean Mansel) এবং ডি. মিলম্যান (D. Millman) প্রভৃতি খৃষ্টান মনীষীরাও স্বীকার করিয়াছিলেন—ভারত হইতে সিরিয়া,

রূপে ভ্রমণ করিতেন। জর্ডন্ (Jordon) নদীর নিকটবর্তী কোন এক অরণ্যপ্রায় নির্জন স্থানে তাঁহারা জমিতে চাষবাস, মৌমাছিপালন করিয়া মধু সঞ্চয়, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু পালন ইত্যাদি কাজ করিতেন। এশিনীদের পোষাক পরিচ্ছদ অতি সাদাসিধা রকমের ছিল। একটিমাত্র কটিবস্ত্র ও একটি চাদরই তাঁহারা সাধারণতঃ পরিতেন। সঙ্ঘে বিশেষ পর্বদিনে উপাসনা-কার্যের জন্য তাঁহারা সাদা রঙের একটি লম্বা ঢিলা আলখেল্লা পরিতেন।" ধর্মব্যাপারে এশিনীরা ইহুদীদের মতন জাভের (Yahveh) উপাসক অথবা একেশ্বরবাদী ছিলেন। ইহুদী-ধর্মের প্রবক্তা মোজেসের (Moses) এবং তাঁহার আদেশবাণীর (Torah) উপর তাঁহাদের অত্যন্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত কোনব্যক্তি মোজেসের উপর অশ্রদ্ধা বা অনাস্থা প্রকাশ করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি, এমন কি, মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিতে হইত। ফারসিদের মতন আচারনিষ্ঠ ও গোঁড়া হইলেও এশিনীরা কবর হইতে মৃতদেহের পুনরুত্থানে (resurrection) বিশ্বাসী ছিলেন না; বরং তাঁহারা আত্মার দেহান্তর গ্রহণ, আত্মার অমরত্ব এবং পাপী ও পুণ্যাত্মার শাস্তি ও শান্তিলাভে বিশ্বাস পোষণ করিতেন। নিজেদের ধর্মমত ও বিশ্বাসকে সমর্থন করিবার জন্য এশিনীরা অনেক সময় ধর্মশাস্ত্রের উক্তিসমূহকে আধ্যাত্মিক রূপকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতেন।

এশিনীরা উষাকালে পূর্বমুখে সূর্যের দিকে চাহিয়া উপাসনা করিতেন। ইহা হইতে তাঁহাদের উপর ভারতবর্ষীয় ধর্মসাধনার প্রভাব সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

প্যালেষ্টাইন ও মিশরে আগত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের প্রভাবে এশিনী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। অধিকন্তু ইহাও সকলের নিকট সুবিদিত যে, জন্ দি ব্যাপ্টিষ্ট (John the Baptist)

সংঘের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সন্ন্যাসীর সম্মতিক্রমে এশিনীদের সংঘনেতা নির্বাচিত হইতেন। চাষবাস, গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুপালন ও অন্যান্য যে কোন কাজ করিয়া তাঁহারা যে টাকা উপায় করিতেন সে সমস্তই তাঁহারা সংঘের সাধারণ ভাণ্ডারে জমা দিতেন। এই সাধারণ ভাণ্ডারের টাকা হইতেই সংঘের সন্ন্যাসীদের সকলের আহার, বস্ত্র ও অন্যান্য খরচ চালানো হইত। নিজের ব্যক্তিগত টাকাকড়ি অথবা বিষয়-সম্পত্তি রাখা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হওয়ায় সংঘে প্রবেশকালে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রতিজ্ঞা করিয়া দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিতেন। ধনী ও দরিদ্র, জমিদার ও ক্রীতদাস অর্থাৎ মানুষে মানুষে আর কোনরূপ ভেদ, সম্পত্তি-বৈষম্য ও ব্যবধান রাখার পক্ষপাতী তাঁহারা ছিলেন না। দাস-ব্যবসায় অথবা অপরকে শোষণ ও বঞ্চিত করিয়া টাকাকড়ি ও বিষয় বৃদ্ধির তাঁহারা ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং এই ঘৃণ্য কার্যে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের গর্হিত অভ্যাসের জন্য তাঁহারা প্রকাশ্যেই সদা সর্বদা প্রতিবাদ করিতেন। এই কারণে পরস্বলোভী স্বার্থপর ও প্রবঞ্চক ব্যক্তিদের নিকট তাঁহারা অপ্রিয় ছিলেন।

সংঘের নবদীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দীর্ঘ তিন বৎসর শিক্ষার্থী হইয়া থাকিতে হইত। এই তিন বৎসর পরে সংযম, পবিত্রতা, শুচিতা ও বৈরাগ্যের পরীক্ষায় সে ব্যক্তি উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইলে তাঁহাকে সংঘের পূর্বতন ও প্রবীণ সাধুদের সহিত একত্রে আহার ও বসবাস করিবার অধিকার দেওয়া হইত। ঈশ্বরে ভক্তি, মানবপ্রেম, সকল ব্যক্তির প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু হওয়া, কাহারও অনিষ্ট না করা, পাপ, অন্যায় ও নিষ্ঠুরতাকে ঘৃণা করা, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ, সঙ্ঘের সকলের বিশেষ করিয়া সঙ্ঘনেতার বিশ্বাসভাজন হওয়া, চুরি অথবা অন্যান্য কুকার্য দ্বারা

স্বয়ং এই এশিনী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট সম্বন্ধে ফরাসী মনীষী আর্ণেষ্ট রেনাঁ (Ernest Renan) লিখিয়াছেন: "জন্‌ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট ভারতীয় যোগীদের ন্যায় সংযম ও তপস্যাপূর্ণ

হস্তকে কলুষিত না করা, সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীদের নিকট নিজের মনোভাব গোপন না রাখা এবং মৃত্যুদণ্ড সত্ত্বেও সঙ্ঘের গোপনীয় বিষয় বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ না করা—এই সমস্ত প্রতিজ্ঞায় যথাবিহিত অনুষ্ঠানের সহিত আবদ্ধ হইলে তবে কোন ব্যক্তিকে এশিনীদের সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হইত। এশিনীরা কঠোর বৈরাগ্যব্রতী, নির্জনতাপ্রিয় ও তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। বৃথা বাক্যালাপ, অতিভোজন, অসংযত আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতার তাঁহারা ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রাচীন ইহুদী ঐতিহাসিক ফ্লাবিয়াস্‌ জোসেফাসের (Flabius Josephus) লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, এশিনীরা বিবাহ না করিয়া চিরজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করিতেন। নারীজাতির সহিত তাঁহারা কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতেন না—সর্ব্বতোভাবে নারীজাতির দৃষ্টি হইতে তাঁহারা দূরে থাকিতেন।

এশিনীরা গাছগাছড়া কিংবা অন্য কোন সহজপ্রাপ্য বস্তু হইতে অনেক রকম ঔষধ তৈয়ারী করিয়া বহু অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তির কঠিন রোগ সারাইয়া দিতে পারিতেন বলিয়া দরিদ্র জনসাধারণ তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে দেখিত! এই সম্প্রদায়ের কোন কোন সাধকের অলৌকিক শক্তি থাকার জন্য ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিল। জুডা (Juda) নামক জনৈক এশিনী কঠোর তপস্যা, পবিত্রতা ও ভবিষ্যদ্বাণী কথনের জন্য সে সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অনেকে বলেন এশিনী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পূর্ণ ইহুদী প্রভাব হইতেই। কিন্তু সেকথা সর্বাংশে সত্য নয়। ইহুদীদের একেশ্বরবাদ প্রভৃতি এশিনী-দের ধর্মবিশ্বাসে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিলেও এমন অনেক আচার

জীবন যাপন করিতেন। তিনি পশুচর্ম অথবা উটের লোমে প্রস্তুত বস্ত্র পরিধান করিতেন। পঙ্গপাল (locusts) এবং বন্য মধুই তাঁহার আহার্য ছিল। * * যদি ইজরেল জাতির প্রবক্তাদের

অনুষ্ঠান এশিনীরা মানিতেন যে, সেগুলি আদৌ ইহুদী ধর্মের অন্তর্গত নয়। সন্ন্যাসী হওয়া, মদ্য ও মাংস না খাওয়া, নিরামিষ আহার প্রভৃতি কোন-কালেই ইহুদী ধর্মে উপদেশ দেওয়া বা উৎসাহিত করা হয় নাই। অথচ এশিনীরা সন্ন্যাসী, সুরাপানবিরোধী ও নিরামিষভোজী। এই সমস্ত অনুষ্ঠান ভারতীয় ধর্মমতেই প্রধানতঃ পাওয়া যায়। অধিকাংশ পণ্ডিতদের অভিমত যে, সম্রাট অশোকের প্রেরিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীতে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, আফগানিস্থান, আর্মেনিয়া, তুর্কীস্থান, মিশর প্রভৃতি দেশে বহুবৎসর ধরিয়া স্থায়ীভাবে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের ফলে বৌদ্ধধর্মের বহু মূর্তি, চৈত্য এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মপ্রচারক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার ফলে একদল ইহুদীর মধ্যে বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য, অহিংসার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। তাহা হইতেই 'এশিনী' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা যে যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু পূর্বে সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহার স্বপক্ষে বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। অতএব বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শের ফলেই যে এশিনী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি একথা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

ফিলো, প্লিনি, জোসেফাস্, সোলিনাস্, পরফাইরী, এফিফেনিয়াস্ ইউসিবিয়াস্, জেকব এবং ওয়ালিস বাজ্ প্রভৃতি প্রাচীন ইহুদী ও গ্রীক পণ্ডিতদের বিবরণ হইতে এশিনী সম্প্রদায়ের উৎপত্তিকাল সঠিকভাবে নির্ণীত না হইলেও অনেকের অনুমান খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীতেই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

শেষ অধ্যাত্মজ্ঞানসম্পন্ন বংশধর এই অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীদের ভিতর না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ভাবিতাম যে, আমরা আর ইহুদী দেশে নাই; সে দেশ ত্যাগ করিয়া আমরা হিন্দুদের দেশে গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে বাস করিতেছি।"[১৫] রেনাঁ আরও বলিয়াছেন: "যাঁহারা ইহুদী যুবকদের শিক্ষাদান করিতেন তাঁহারা সংসারত্যাগী ছিলেন। ব্রহ্মণ্যধর্ম অবলম্বী ভারতীয় ধর্মগুরুদের সহিত তাঁহাদের কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল। এ সমস্ত ধর্মগুরুরা ভারতীয় মুনিদের আধ্যাত্মিক প্রভাবে কি প্রভাবিত হয় নাই? যেমন সেণ্ট ফ্রান্সিসের[১৬] সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীগণ মধ্যযুগে

১৫। Ernest Renan: *Life of Jesus*, p. 126.

১৬। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ একজন কঠোরতপা ও সিদ্ধ খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরপ্রেম, তপস্যা, সংযম ও ধর্মানুভূতি সম্বন্ধে অনেক মনোরম আখ্যান প্রচলিত আছে। ইনি একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে ভোগবিলাসে জীবন যাপন করিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে ধর্মভাবের প্রাবল্যে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসীর কঠোর তপস্যার জীবন যাপন করিতে থাকেন। যীশুখৃষ্টকে একান্তভাবে ধ্যান ও চিন্তা করার ফলে ১২২৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লা ভেরানিয়ায় (La Varania) তাঁহার এক দিব্যদর্শন হয়। সেই সময় হইতে যীশুখৃষ্টের দেহের যে যে স্থানে ক্রুশবিদ্ধের জন্য রক্তপাত হইয়াছিল সেণ্ট ফ্রান্সিসের দেহেরও সেই সকল স্থানে 'রক্তক্ষত চিহ্ন' (Stigmata) দেখা দেয়। সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ইটালীর অন্তর্গত য়্যাসিসি (Assisi) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'য়্যাসিসির সিদ্ধ সাধু ফ্রান্সিস্' (St. Francis of Assisi) নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনুমান ১১৮২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জন্মগ্রহণ করেন। ১২২৬ খৃষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি সুবিখ্যাত ফ্র্যান্সিসক্যান্ (Franciscan) নামক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ধর্মপ্রচারের জন্য ইউরোপ ও অন্যান্য বহু দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তেমনি প্রাচীনকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রচারকগণ দেশে দেশে আপনাদের ধর্মভাব প্রচার করিতেন। সে সমস্ত দেশের লোক বৌদ্ধ প্রচারকদের ভাষা জানিত না অথচ তাঁহারা ঐ সব বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংযত পবিত্র ধ্যানশীল জীবনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইত। ঐ সকল বৌদ্ধ প্রচারকগণ সিরিয়া ব্যাবিলোনিয়ার ন্যায় হয়ত জুডিয়া দেশেও গমন করিয়া থাকিবেন।"[১৭]

রেঁনা (Renan) ইহার পর আরও বলিয়াছেন: "কিছুকাল ধরিয়া ব্যাবিলন বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারের মূল কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। Boudasp অথবা বোধিসত্ত্ব ক্যাল্‌ডিয়ার একজন মহাজ্ঞানী পুরুষ বলিয়া সুবিখ্যাত। তিনি স্যাবেইজম্ (Sabaism) প্রথার প্রবর্তক ছিলেন। Sabaism অর্থে Baptism (অভিষেক স্নান) অর্থাৎ যথাবিহিত অনুষ্ঠানপূর্ণ স্নানান্তে কোন ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষিত করা বুঝায়। এ সম্বন্ধে রেঁনা পুনরায় বলিয়াছেন: "যেরূপেই হউক, ইহা আমাদের বিশ্বাস যে, জন্ দি ব্যাপ্টিষ্ট্, এশিনীগণ এবং ইহুদী ধর্মগুরুদের প্রতিপালিত বহু বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান সেই প্রাচীন্ যুগের প্রভাব হইতে উৎপন্ন যাহা সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্য দেশ হইতে প্রবর্তিত অনুষ্ঠান হইতে গৃহীত হইয়াছে। যে ধর্মসম্প্রদায় জন্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলনীতি ও প্রকৃতি এবং তাঁহার নিজস্ব নামের বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্র-স্থল ছিল ক্যাল্‌ডিয়া (Chaldea)। আজ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে ঐ সকল নিয়মই ধর্মসাধনার উপায় বলিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। এই বৈশিষ্ট্য ব্যাপটিজ্‌ম্ (Baptism) অর্থাৎ ধর্মদীক্ষালাভের সময় সম্পূর্ণ

১৭। Ernest Renan: *Life of Jesus*, p. 127.

অবগাহন-স্নান। ইহুদীগণ এবং প্রাচ্যদেশীয় ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে জলের দ্বারা সমস্ত দেহ ধৌত করার অভ্যাস সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এশিনী সম্প্রদায় এই অবগাহন প্রথার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থায়িত্ব বিধান করিয়াছিলেন।” অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ধর্মকার্যে এই ভারতীয় অবগাহন স্নানের প্রথা ভারতবর্ষ হইতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ এশিনীদের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। অবশেষে এই অবগাহন-স্থানই জন্ দি ব্যাপটিষ্টের ধর্মমতে দীক্ষাগ্রহণ করিবার সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ম্যাথ্যু (Matthew), মার্ক (Mark), এবং লিউক (Luke) প্রণীত যীশুর প্রত্যেক জীবন-কাহিনীর (Gospel) মধ্যে নিষ্কলুষ কুমারী মেরীর গর্ভধারণ, (Immaculate conception), যীশুর অলৌকিক জন্মবিবরণ, রাজা হেরদ্ (Herod) কর্তৃক যীশুর জন্মকালে বহু শিশুহত্যা এবং শিশুর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রবাহ যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহুশতাব্দী পূর্বে (১৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত) শ্রীকৃষ্ণের এবং গৌতম বুদ্ধের (৫৪৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দে জন্ম) জীবনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক অবতারবাদের এই ধারণা, হিন্দুদের সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব। ইহুদীজাতিরা সে সময়ে ইহা অবগত ছিলেন না। ইহুদীজাতি যীশুখৃষ্টকে কখনও ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু হিন্দুরা বহু প্রাচীন যুগ হইতেই অবতারবাদে বিশ্বাসী। যীশুর জন্মগ্রহণের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে আবির্ভূত অনেক ঈশ্বর-অবতারকে হিন্দুরা স্বীকার করিয়াছেন। অবতারবাদ হিন্দুধর্মের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। ধর্মোপদেশ-দানপ্রসঙ্গে যীশু যে সমস্ত গল্প (parables) বলিতেন, খৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু পূর্বেই তাহার অনেক কাহিনী অবিকল হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ অপব্যয়ী পুত্র

ও বিবাহ-উৎসবের কাহিনী আমরা বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশে দেখিতে পাই। বুদ্ধদেব এই সমস্ত কাহিনী উপদেশ দিবার সময়ে তাঁহার শিষ্যদের বলিতেন। ইহা যীশুর জন্মগ্রহণের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। যীশুর বর্ণিত কাহিনীগুলি বুদ্ধদেবের কথিত গল্পমালার অনুরূপ। রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের উপসনাপ্রণালী, সন্ন্যাসীদের মঠ, মেয়েদের সন্ন্যাসাশ্রম, আশ্রম-জীবন, জীবের নরকভোগ প্রভৃতি বহু ধারণা, বিশ্বাস ও প্রথা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সঙ্ঘের নিয়মাবলী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমত ও সম্প্রদায় সকলের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বুদ্ধদেবই সর্বপ্রথম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পৃথকভাবে বাস করিবার জন্য স্বতন্ত্র বহু মঠ ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বার্লাম্ (Barlaam) ও জোসাফাটের (Josaphat) নামের আবরণে বুদ্ধদেব রোম্যান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্বীকৃত সিদ্ধপুরুষগণের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছেন, এবং গ্রীক ও রোম্যান চার্চে—তাঁহার পর্বদিন খৃষ্টিয়ান ধর্মসঙ্ঘের পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট আছে।[১৮] বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ ইউরোপীয় খৃষ্টান জ্ঞানযোগী (Christian Gnostics)[১৯]

১৮। Vide Joseph McCabe: *Modern Rationalism*, p. 9; J. M. Robertson: *Pagan Christ*, p. 334; *Christianity and Mythology*, p. 165.

১৯। **Christian Gnosticism:** খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উদ্ভূত ইউরোপের খৃষ্টান সাধক-সম্প্রদায় বিশেষের মতবাদ। এই সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ইঁহাদের ধর্মসাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ প্রভৃতি অখৃষ্টান কোন কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাবের ফলে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। ইঁহারা যোগসাধনায় অনুরক্ত ও ভারতীয় সন্ন্যাসীদের ন্যায় সদসদ্ বিচারশীল ছিলেন। ঐশ্বরিক তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞানের

এবং ম্যানিসিয়ানদের (Manichaeans)[২০] ধর্মমতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্জন্মবাদ প্রচার ও প্রচলন করিয়াছিলেন।[২১] ওরিগেন (Origen)[২২] প্রমুখ বহু প্রাচীন যুগের খৃষ্টান ধর্মাচার্যগণ আত্মার জন্মের পূর্বে অস্তিত্ব ও পরজন্মে বিশ্বাস করিতেন। এই

অধিকারী বলিয়া ইঁহারা নিজেদের দাবী করিতেন। এই সম্প্রদায় এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও ইঁহাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব এখনও বহু খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। পূর্বতন খৃষ্টান ধর্মমত ইঁহাদের প্রভাবে বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

২০। **Manichaeism**ঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ম্যানি (Mani) নামক জনৈক ব্যাবিলনবাসী সাধকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত। ২৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়া নিহত হন। জরথুস্ত্রীয়দের দার্শনিক মত, বৌদ্ধ নীতিবাদ, ব্যাবিলনবাসীদের পৌরাণিক বিশ্বাস এবং প্রাচীন ইউরোপের নষ্টিক (Gnostics) ও খৃষ্টানদের কোন কোন ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণে এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত গঠিত। এক সময়ে এই ধর্মমতাবলম্বীদের তুরস্ক, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, মিশর ও এমনকি ভারতবর্ষেও দেখা যাইত। ইঁহাদের মতে 'আলো' এবং 'অন্ধকার' বিশ্বের এই দুইটি মাত্র মূলতত্ত্ব। মানবাত্মা সর্বদা শুভ ও অশুভ অথবা আলো ও অন্ধকার এই দুই বিপরীত শক্তির চিরন্তন বিরোধের ফলেই সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ইহাই ইঁহাদের ধর্মমতের মোটামুটি সারতত্ত্ব।

২১। অধ্যাপক হফ্‌কিন্স বলিয়াছেনঃ "দার্শনিক মতবাদের জন্য নিও-প্লেটোনিষ্ট ও খৃষ্টান নষ্টিক সম্প্রদায় ভারতের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী।" Joseph McCabe *Modern Rationalism*. pp. 9-13ও দ্রষ্টব্য।

২২। ওরিগেন গ্রীসদেশবাসী প্রথম যুগের খৃষ্টানদের মধ্যে বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মাচার্য। ১৮৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। নিজ স্বাধীন ধর্মবিশ্বাসের জন্য ইঁহাকে কয়েকবার লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হইতে

জন্মই মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ জন্ম নয়,—মানুষ এই জন্মের পূর্বে বহুবার পৃথিবীতে আসিয়াছে এবং ইহার পর আরও বহুবার সে জন্মগ্রহণ করিবে—ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল। ৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিকাংশ খৃষ্টানই পূর্বজন্ম ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু রোম্যান সম্রাট প্রথম জাষ্টিনিয়ান্ ৫৩৮ খৃষ্টাব্দে এক আইন জারী করিয়া এই মতবাদকে খৃষ্টান সমাজ হইতে উচ্ছেদ করেন। এই বিশ্বাসকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নিম্ন-লিখিত শাসনবাণী বিধিবদ্ধ ও ঘোষণা করাইয়াছিলেন: "আত্মা এই জন্মের পূর্বে ছিল এবং ভবিষ্যতেও সে আবার জন্মগ্রহণ করিবে—এই প্রকার অলীক মতবাদে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে, সে ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত (Anathema) হইবে।" ইহুদীগণও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস করিতেন না, কারণ তাঁহাদের ধর্মে এবিষয়ে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ধ্যান-রসিক (mystic) হিন্দু যোগীদের প্রভাবের ফলে জন্মান্তর-বাদ কারাইৎ (Karaites) এবং আরও কোন কোন ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইয়া পড়ে। *Jewish Encyclopaedia*-র অভিমত: "কাবালা (Cabala) অর্থাৎ গুপ্ত যোগসাধনার প্রচারের কাল

হইয়াছিল। এজন্য ২৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার ডেসিয়ান নগরে কারারুদ্ধ হন। 'হেক্সাল্পা' (Hexalpa) নাম দিয়া ওরিগেন ওল্ড টেষ্টামেণ্টের কোন কোন অংশ সমালোচনা করেন এবং এপিকিউরীয়ানদের (Epicurean) ভোগসুখসর্ব্বস্ব মতবাদের কুপ্রভাব ও কবল হইতে খৃষ্টান ধর্ম্মকে স্বীয় পাণ্ডিত্য ও মনীষার দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। নিও-প্লেটোনিজম্ ও খৃষ্টান নষ্টিকদের আধ্যাত্মিক মরমীবাদ (Mysticism) ওরিগ্যানের ধর্মবিশ্বাস ও দার্শনিক মতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ২৫৪ খৃষ্টাব্দে ওরিগেনের মৃত্যু হয়।

হইতেই এই জন্মান্তরবাদে ইহুদীদের বিশ্বাস জন্মাইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ যে সকল ব্যক্তি স্থূল জগতের অতীত অতীন্দ্রিয় কোন নিগূঢ় তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন না, এমন সকল লোকের মধ্যেও অনেকে এই মতে আস্থাবান হইয়া পড়িলেন"। উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হইয়াছে ঃ "ওরিগেন এবং প্রথমযুগের আরও অনেক খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ন্যায় সেই প্রাচীনকালে কাবালিষ্টগণ (Cabalists) মানবাত্মার পুনর্জন্মবাদের যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারশীলতা প্রমাণ করিতেন।"[২৩] অধ্যাপক মোক্ষমূলারের অভিমতে পাণিনি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-প্রণেতা। পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণ জগতের সর্ববিধ ভাষার তুলনামূলক আলোচনার পথপ্রদর্শক। আমরা যে সমস্ত ইংরাজী শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদের অনেকগুলিরই উৎপত্তির সন্ধান সংস্কৃত ভাষা হইতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কয়েকটি শব্দ এখানে উল্লেখ করিতেছি। ইংরাজী 'Mother' শব্দটি ল্যাটিন ভাষায় *Mater* ও সংস্কৃত ভাষায় "মাতৃ' বলা হয়। সেই প্রকারে ইংরাজীতে father, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষায় যথাক্রমে *pater* ও পিতার (পিতৃ)। এইপ্রকারে brother শব্দটির সংস্কৃত রূপ ভ্রাতর (ভ্রাতৃ) sister স্বসা, daughter দুহিতৃ, path পথ, serpent সর্প, bond বন্ধ ইত্যাদি। ইংরাজী punch শব্দটির সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। ইহার মূল অর্থ five

২৩। **Cabala:** ইহুদীদিগের মধ্যে একসময়ে প্রচলিত মরমীবাদ ঈশ্বরতত্ত্ব এবং বিশেষ গোপনীয় যোগসাধনা ও ক্রিয়া অনুষ্ঠানপূর্ণ ধর্মশাস্ত্র। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্যক্তিরা কাবালিষ্ট নামে পরিচিত। ইহারা ইহুদীদের অন্যতম ধর্মপুস্তক তালমুদ-কে নানাপ্রকার ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে করিতেন। —Dr. Kunen : *The Religion of Israel*, Vol III, pp. 314-315.

বা পাঁচ, সংস্কৃত ভাষায় 'পঞ্চ'। Give him a punch" এই ইংরাজী বাক্যটির আক্ষরিক অর্থ 'ঐ ব্যক্তিকে পাঁচটি আঙ্গুল অর্থাৎ হাত দাও।' আমরা পানীয় দ্রব্যবিশেষকে punch বলিয়া থাকি। এই পানীয় দ্রব্য পাঁচ প্রকার বস্তুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়।

ইসপ্ (Æsop) ও পিল্পের (Pilpay) নীতিকথামূলক গল্পগাঁথা প্রধানতঃ ভারতীয় রচনা। আমি একথা আমার পূর্ববক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক ইতরপ্রাণীদের কাহিনী অবলম্বনে হিন্দুদের এই সব নীতিকথা বহুশতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার শিশুদের মনকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। এই সমস্ত নীতিকথা পড়ে নাই, এমন কোন বালক-বালিকাকে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ র‍্যোমান আইন (Roman Law) এবং র‍্যোমান্ আইন বিজ্ঞান (Roman Jurisprudence) হিন্দুদের সম্পূর্ণাবয়ব আইনশাস্ত্র হইতে প্রভাবমুক্ত নয়।

এক্ষণে বর্তমান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় ভারতবর্ষের প্রভাব কিভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আমি বলিব। যাঁহারা জার্মাণ দার্শনিক শোপেনহায়ারের রচনাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহেই জানেন যে, শোপেনহায়ারের উপর বৌদ্ধচিন্তাধারা ও বেদান্তের প্রভাব পরিপূর্ণভাবে পড়িয়াছে। বেদান্ত ও উপনিষৎ পাঠ করিয়া শোপেনহায়ার তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপে বলিয়াছেন: "উপনিষৎ (বেদান্ত) অপেক্ষা মানবজাতির পক্ষে আর অধিকতর কল্যাণকর কোনও গ্রন্থাবলী নাই। ইহারা আমার জীবনে সান্ত্বনাস্বরূপ হইয়াছে; আমার মৃত্যু সময়েও ইহারা আমার সান্ত্বনা স্থল হইবে।"[২৪]

২৪। "মোগল সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মোহম্মদ দারাশিকোর প্রচেষ্টায় ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত হইতে পারসী ভাষায়

অধ্যাপক মোক্ষমূলারও বলিয়াছেন : "যদি এমন কোন দর্শনশাস্ত্র থাকে যে, যাহার আলোচনায় শান্তিপূর্ণ মৃত্যু সম্ভব হয়, তবে সেই দর্শনশাস্ত্র একমাত্র বেদান্ত ভিন্ন আর কোন দর্শনশাস্ত্রই নয়।" শোপেনহায়ারের সাক্ষাৎ শিষ্য ডক্টর পল্ ডয়সন্ তাঁহার *Philosophy of the Upanishads* নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "নিখিল কল্যাণের নিদান আমাদের অন্তর্যামী যে ঈশ্বর তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা ওল্ড টেষ্টামেন্ট্ (Old Testament) বর্ণিত ইজরেলদের জিহোভার মধ্যে পাই না। ইহুদীদের জিহোভা বিশ্বজগৎ হইতে অনেক দূরে এবং আমাদের নিকট হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। প্রকৃত যিনি ঈশ্বর তিনি আমাদের দিব্যস্বরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন। এই তত্ত্ব এবং আরও অনেক বিষয়ে আমরা উপনিষদ্ হইতে শিক্ষালাভ করি। খৃষ্টানদের যে ধর্মবোধ তাহার সম্পূর্ণতা সাধন করিতে হইলে ও তাহার সর্বদিকে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখার জন্য আমাদিগকে উপনিষদের শিক্ষাকে গ্রহণ করিতে হইবে।" প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতেই ইউরোপের আধুনিক

পঞ্চাশখানি উপনিষদের অনুবাদ হইয়াছিল। ঐ পারসী অনুবাদ আবার ১৮০১ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ এই কালের মধ্যে আঁকেতিল দ্যুপারঁ (Anquetil Duperron) লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।"—Paul Deussen : *Philosophy of the Upanishads*, p. 36.

কুমার দারাশিকোও বেদান্তের নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্বসম্বন্ধে যে সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদ গ্রন্থ পারসী ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাহার নাম 'শির্-ই-ইস্রার্', অর্থাৎ 'গোপন হইতে গোপনীয় তত্ত্ব' (*Most secret of All Secret Truths*)। ইহা ছাড়া দারাশিকো প্রণীত 'মায়্-মোয়াজ্জেল-বাহরন্' (*Union of Two Oceans*) ও 'তর্জমান্-ই-ই ইস্রার' প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

দর্শনসমূহ নবজীবন লাভ করিয়াছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ভারত শাসনকালে চার্লস্ উইলকিন্স্ ইংরাজী ভাষায় ভগবদ্গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন।[২৫] ভগবদ্গীতার এই ইংরাজী অনুবাদ এক্ষণে *Song Celestial* অথবা 'স্বর্গীয় সঙ্গীত' নামে অভিহিত। বিশ্ববিখ্যাত মনীষী টমাস্ কার্লাইল (১৭৯৫—১৮৮১) ভগবদ্গীতার এই ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকায় ভগবদ্গীতার আরও অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ফ্রেডারিক্ শ্লেগেল, ভিক্তর ক্যুজাঁ, য়্যামিয়েল, পল্ ডয়েসেন্, বার্নুফ, মোক্ষমূলার এবং এমার্সন বেদান্তের ভাবরাশি ও চিন্তাধারার প্রবল সমর্থক ছিলেন। বাস্তবিক আমেরিকায় এমার্সনই (১৮০৩—১৮৮২) হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম প্রচলন করেন। তিনি তাঁহার পত্রিকায় বলিয়াছেন যে, উপনিষদ্ আলোচনা তাঁহার চিত্ত বিনোদনের পক্ষে বিশেষ প্রিয় বিষয়। সম্ভবতঃ অনেকেই এমার্সন রচিত *Brahm* (ব্রহ্ম) নামক কবিতাটি পড়িয়া থাকিবেন। ইহার প্রথম চারি ছত্র এইরূপ ঃ

"If the red slayer thinks he slays,
Or if the slain thinks he is slain,
They know not well the subtle ways,
I keep, and pass, and turn again."

২৫। চার্লস উইলকিন্সের পূর্বে ভগবদ্গীতার দুইটি ফরাসী অনুবাদ হইয়াছিল। এই দুইজন অনুবাদকারের নাম মঁসিও পঁ (M. Pon) এবং ইউজাঁ বার্নুফ (Eugine Burnouf)। বার্নুফ মোক্ষমূলারের সাংস্কৃতিক গুরু।

অর্থাৎ,

হত্যাকারী যদি ভাবে সেই হত্যা করে
অথবা নিহত ব্যক্তি ভাবে আমি হত ;
তাহারা সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে না পারে,
নানা রূপে আসি থাকি যাই অবিরত।

এমার্সনের এই উক্তি ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকের স্বচ্ছন্দ ভাবানুবাদ মাত্র। উক্ত শ্লোকটির মূল ও অনুবাদ এইরূপ ঃ

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥[২৬]

অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি এই আত্মাকে হত্যাকারী বলিয়া ভাবে, অথবা মনে করে এই আত্মা কাহারও দ্বারা নিহত হয়, তাহা হইলে জানিতে হইবে উহারা কেহই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নয়। কারণ আত্মা কাহাকেও হত্যা করেন না অথবা কাহারও দ্বারা হত হন না। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত কঙ্কর্ড (Concord) নগরবাসী ঋষিকল্প মনীষী থোরো (Thoreau)[২৭] এমার্সনের ন্যায়

২৬। গীতা ২।১৯

২৭। ঋষিকল্প মনীষী হেনরি ডেভিড থোরো ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুলাই আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ম্যাসাচুটেসাস প্রদেশের অন্তর্গত কঙ্কর্ড (Concord) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বিদ্যার্জনের স্থান। স্বীয় দার্শনিক মনীষা, সত্যান্বেষিতা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাব ও পুণ্যচরিত্রের জন্য থোরোর নাম জগতের সাংস্কৃতিক সমাজে সুপরিচিত। নির্জনে ধর্মসাধনা, তপস্যা ও জ্ঞানানুশীলনের উদ্দেশ্যে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বৈষয়িক কার্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ওয়াল্ডেন পণ্ডস্‌-এর নিকটে অরণ্যবহুল, নির্জন ও শান্তিময় স্থানে ধ্যানী সাধকের জীবন যাপন করিতে থাকেন। উপনিষদ্‌, ও ভগবদ্‌গীতার ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিবার ফলে থোরো ভারতীয় আর্যঋষিদের উদার ধর্মাদর্শের প্রতি একান্ত অনুরক্ত

বেদান্তের মহতী শিক্ষার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। থোরো এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ "হিব্রুদের অপেক্ষা হিন্দুরা ধর্মবিষয়ে অধিকতর শান্ত সমাহিত ধীর ও বিচারশীল। সম্ভবতঃ তাঁহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উপলব্ধি ও জ্ঞান অবাধ ও পবিত্রতর, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা ও ধ্যান-ধারণাদি সহায়ে তাঁহাকে উপলব্ধির কথা হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু হিব্রুজাতির ধর্মপুস্তক শুধু ঈশ্বরকে ভয়, পাপ-পুণ্য বোধ, অনুতাপ ইত্যাদি নিতান্ত স্থূল ও ক্ষুদ্র ব্যাপারেই পরিপূর্ণ। অনুতাপ, ঈশ্বরকে ভয়, সর্বদা নিজেকে পাপী ভাবা এই সমস্ত কখনই ঈশ্বরকে লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নয়। ইহা দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে না, বরং চিরদিন তাঁহার কাছ হইতে বহুদূরে পড়িয়া থাকে। যিনি জ্ঞানী ও ধীর তিনি অনুশোচনার পথ বর্জন করিবেন। কারণ অনুতাপ কেবলই মানুষকে ভীত, সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত করিয়া দেয়। মানুষ যতই ঘোর পাপী হউক না কেন এই পাপবোধ, অনুতাপ ইত্যাদি হীনভাব দূর করিয়া দিয়া সে ঐকান্তিক প্রেম ও আকুলতার সহিত ধর্মসাধনায় রত থাকিলে ঈশ্বরের সঙ্গে মহাযোগে

হইয়া পড়েন। থোরো আমেরিকার অন্যতম দার্শনিক মনীষী এমার্সনের সহিত ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। এই দুই মনীষী সাংস্কৃতিক ভাব আদান-প্রদানের জন্য বহুকাল উভয়ে একত্র বাস করিয়াছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট বৈচিত্র্যের পশ্চাতে পরম পরিপূর্ণ শাশ্বত সত্যের সন্ধানের ফলে থোরো যে অমিত জ্ঞানসম্পদ অর্জন করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি জগদ্বিখ্যাত। থোরোর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে *Walden or the Life in the Woods* নামক পুস্তক বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা তাঁহার আরণ্যক তপস্বী জীবনের পবিত্র স্মৃতি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে কঙ্কর্ড সহরে থোরোর দেহত্যাগ হয়।

যুক্ত হইবে—ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। নিজের অহমিকা ত্যাগ করিয়া আত্মবিস্মৃত হইলে মানুষ ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করিতে পারে।

"যে প্রকার ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে হিন্দুরা যাবতীয় নিষিদ্ধ ও গর্হিত কর্মের আলোচনা, বিচার এবং সে সমস্ত হইতে বিরতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

"যখনই আমি বেদের কোন অংশ পাঠ করিয়াছি, তখনই আমার মনে হইয়াছে যেন সুদূর আকাশের অপার্থিব কোন অলক্ষিত উচ্চতা হইতে এক পবিত্র জ্যোতি আমার উপর আবির্ভূত হইয়াছে। বেদের এই মহতী শিক্ষায় কোন সঙ্কীর্ণ কুটীল ভাবের লেশ নাই, মহাজ্ঞান লাভের এই বিস্তীর্ণ রাজপথ। ইহার আদর্শ সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতামুক্ত, ইহা সহজ, সরল ও সার্বজনীন। মনে হইয়াছে যেন আমি গ্রীষ্মকালের রাত্রে অগণিত নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের তলায় বসিয়া আছি। ধীরে ধীরে সেই আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল এবং তাহার রজতশুভ্র নির্মল জ্যোৎস্নার বিপুল বন্যাস্রোত আকাশ হইতে প্রবাহিত হইয়া আমাকে যেন অবশেষে নিমজ্জিত করিয়া দিল।

"যাগযজ্ঞ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ডের বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন পরিত্যাগ করিয়া আপনার ঐকান্তিক অনুরাগ ও ঈশ্বরপ্রেমের আতিশয্যে ভক্ত-সাধক কি ভাবে পরিপূর্ণ মানসিক পবিত্রতা লাভ করেন, ইহাই বেদান্তের শিক্ষা।

"বেদের একটি মাত্র বাণীর উপলব্ধি ম্যাসাচুসেট্‌স্[২৮] প্রদেশের সর্ব সম্পদ লাভ অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান্।

২৮। ম্যাসাচুসেটস্ (Massachusetts সংক্ষেপে Mass.) আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত একটি বিখ্যাত প্রদেশ। বোষ্টন (Boston) ইহার প্রধান নগর।

"বেদসমূহে ঈশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বরূপসম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা মানুষকে সত্যই জ্ঞান দান করে। হিন্দুদের মতন হিব্রুদের সূক্ষ্ম ও মার্জিত জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ভাব সমন্বিত সভ্যতা নাই। হিব্রুদের ধর্ম ও দর্শন বন্য, অশিষ্ট ও বর্বর জাতিদের পক্ষেই উপযুক্ত।

"আমি কোনও বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় অথবা দার্শনিক মতবাদের গোঁড়া পক্ষপাতী নয়। 'খৃষ্টান' ও হিদেন (heathen) প্রভৃতি নামে এবং ধর্মে ধর্মে যাহা ভেদ, বিবাদ, বিদ্বেষ, বৈষম্য, ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে আমি এই প্রকার অজ্ঞানতা ও গোঁড়ামীর দরুণ বিচারহীনতার প্রশ্রয় দিই না। ইহাদের প্রতি আমার কোনই সহানুভূতি নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন এই সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, পক্ষপাতিত্ব, অতিরঞ্জন-কারিতা ও গোঁড়ামী হইতে আমি চিরদিন মুক্ত থাকিতে পারি। যিনি প্রকৃত সত্যান্বেষী দার্শনিক তাঁহার নিকট জগতের সকল জাতি ও ধর্মসম্প্রদায় মাত্রেই সমান। ব্রহ্ম, হরি, বুদ্ধ, পরমাত্মা ও গড্ (God) প্রভৃতি প্রত্যেক নাম আমার নিকট সমানভাবেই প্রিয়।"

বর্তমান যুগে সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগতের উপর ক্রমশঃই ভারতীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। ইউরোপ আমেরিকার সুশিক্ষিত নরনারীদের অনেকেই এখন গোঁড়া খৃষ্টান-ধর্মের কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, যুক্তিহীন মতবাদ, অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতিক প্রথা ও নিয়মকানুন আর মানিতে চাহেন না। বেদান্তের সার্বজনীন উদার ধর্মাদর্শ হইতে তাঁহারা এক্ষণে জন্মমৃত্যু সমস্যার সমাধান, বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন, চরম শান্তি ও চিরন্তন আনন্দলাভের সন্ধান পাইতেছেন। পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মতবাদের সহিত বেদান্তের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বর্তমান। বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্মের নৈতিক প্রভাব এখনকার দিনে ইউরোপ ও আমেরিকার বহু ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অনুভূত হইতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের বহু

ব্যক্তি এখন মাছ মাংস খাওয়া ত্যাগ করিয়া নিরামিষ আহারের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। নিউ ইয়র্কে আমি বিড়াল ও কুকুরদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল দেখিলাম। কিন্তু আমি আমার পূর্ব এক বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, ২৬০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বৌদ্ধ সম্রাট অশোক ভারতবর্ষে এই প্রকার হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার পর নব চিন্তাধারার (New Thought) প্রবর্তন এবং ধ্যান-ধারণা ও প্রাণায়ম অভ্যাসের আগ্রহ ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদের উপরে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক প্রভাবেরই সত্যকে প্রমাণ করিতেছে। খৃষ্টীয়ান সায়েন্টিষ্ট্ (Christian Scientist) সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ এডির (Mrs. Mary Baker Eddy) প্রণীত 'সায়েন্স য়্যাণ্ড্ হেল্‌থ (*Science and Health*) নামক গ্রন্থের পূর্ব পূর্ব সংস্করণগুলিতে ভগবদ্‌গীতা হইতে উদ্ধৃত বহু উক্তি মুদ্রিত ছিল। আমেরিকার বিখ্যাত মনস্বিনী সিলিয়া থাক্স্‌টার (Celia Thaxter) ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ হইতে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিতা হইয়াছিলেন। রাসিয়ান মহিলা ম্যাডাম হেনরিয়েটা প্রেটোর্ডেনা ব্লাভাটস্কি (Madam H. P. Blavatsky) প্রতিষ্ঠিত থিওছফিষ্ট সম্প্রদায় ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা বিস্তার করিয়াছেন। আমি অবগত হইয়াছি যে, এমনকি সুদূর মেক্সিকো প্রদেশেও বেদান্তের ভাবরাশি ক্রমশঃই দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

সুদূর অতীত যুগ হইতে হিন্দুগণ অন্যায়ের অপ্রতিকার, অহিতের পরিবর্তে হিতসাধন, বিদ্বেষের পরিবর্তে প্রেমদান এবং সর্বমানব ও জীবকে আত্মবৎ ভালবাসা প্রভৃতি উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অভ্যস্ত। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন 'Love thy neighbour as

thyself', অর্থাৎ 'তোমার প্রতিবেশীদের তুমি ঠিক তোমার নিজের মতনই ভালবাসিবে।' কিন্তু কেন মানুষ নিজের প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে তাহার কোন কারণ বা আভ্যন্তরিক অর্থ যীশু প্রদর্শন করিয়া যান নাই। বেদে আমরা তাহার কারণ দেখিতে পাই যেমন: "তোমার প্রতিবেশী ও তুমি স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। তুমি ও তোমার প্রতিবেশী একই আত্মা। অতএব তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে।" বেদান্ত বলেন: "তত্ত্বমসি", অর্থাৎ তুমিই সেই আত্মা, যিনি সর্বজীবে পরিব্যাপ্ত। সর্বজীবের সহিত একাত্মতা উপলব্ধিই প্রেম। হিন্দুরা এই উচ্চ নৈতিক আদর্শ আপনাদের জীবনে প্রত্যহই পালন করিয়া থাকেন। হিন্দুদের এই উচ্চ নৈতিক ভাবের সুযোগ পাইয়া এশিয়া এবং ইউরোপের রাজ্যলিপ্সু পরাস্বপহারী জাতিরা বারবার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম এক খৃষ্টান জাতির তরবারির বলে তাহাদের নিকট পরাধীন। অথচ এই খৃষ্টান জাতিদের যিনি ধর্মগুরু সেই যীশুখৃষ্ট অন্যায়ের অপ্রতিকার, অনিষ্টের পরিবর্তে ইষ্টসাধন, শত্রুদের প্রতি ভালবাসা প্রভৃতি উচ্চ নৈতিক আদর্শ আপনার মহাজীবনের দৃষ্টান্তে সমগ্র জগতের নিকট প্রচার করিয়াছিলেন[২৯] রাজনৈতিক

২৯। "Blessed *are* they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.—Matt. V. 10

"Resist not evil, but whosoever shall smite thee on the right cheek, turn to him the other also—Matt. V. 39.

For the people who crucified him Jesus prayed "Father, forgive them; for they know not what they do".

—Luke, XXIII, 34.

জাতিহিসাবে ইউরোপবাসী এই সকল তথাকথিত খৃষ্টানরা তাঁহাদের ধর্মগুরুকে কখনও অনুসরণ করেন না। অন্যায়ের অপ্রতিকার অথবা শত্রুদিগকে ভালবাসার নৈতিক নিয়ম কখনই তাঁহারা পালন করেন না। অপরপক্ষে তাঁহারা সর্বদাই ভোগবিলাসে মগ্ন এবং কিসে নিজেদের রাজ্য ও আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি হয় তাহার জন্যই তাঁহারা সর্বদাই তৎপর। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কোন চিন্তা বা অনুরাগ তাঁহাদের মধ্যে আদৌ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইউরোপের খৃষ্টান জাতিগণ প্রথমে ধর্মব্যবসায়ী মিশনারীদের সেই সব দেশে পাঠাইয়া থাকেন। এই সকল খৃষ্টান মিশনারীরা শ্বেতাঙ্গ জাতিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অন্যতম যন্ত্রের ন্যায় পৃথিবীর নানাদেশে গিয়া সেখানে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান জাতির রাজনৈতিক আধিপত্যের সূচনা করে। বিশ্বপ্রীতি ও মানবপ্রেমের জীবন্ত মূর্তি যীশুখৃষ্টের ধর্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিলেও এই সব খৃষ্টান মিশনারী কোনও দেশে কখনও শান্তি, ঐক্য ও প্রেম বিতরণ করেন নাই। কিন্তু বন্দুক, কামান ও অস্ত্রসম্ভারের বিভীষিকা বিস্তার দ্বারা তাঁহারা অখৃষ্টান জাতিদের উচ্ছেদের সহায়ক হইয়া থাকেন। এসম্বন্ধে ইংরাজ জাতিদের দ্বারা তিব্বতের অভিযান অন্যতম দৃষ্টান্ত। সেখানে নিরীহ সরল ও দরিদ্র তিব্বতবাসীরা ইংরাজদের ব্যবহৃত 'ম্যাক্সিম গান' নামক কামান সকলের দ্বারা কিভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। পর্টুগীজ এবং ওলন্দাজ এই দুই শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান জাতি এক হাতে বাইবেল ও অপর হাতে বন্দুক লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা দক্ষিণভারতের বহু হিন্দু মন্দিরকে ধ্বংস করিয়াছিলেন। এইসব নৃশংস ও নিষ্ঠুর অত্যাচার ভারতীয় হিন্দুদের পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব। ধর্মের নামে খৃষ্টান মিশনারীরা জাপানের বহু বৌদ্ধ

মন্দির ও স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস করিয়াছিলেন। অবশেষে জাপানী রাজ-সরকার ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগকে জাপান হইতে বিতাড়িত করেন। খৃষ্টান জাতিদের এই সব নৃশংস ধ্বংসকার্য আমরা কখনও ভুলিয়া যাইতে পারি না। অপরপক্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ বন্দুক ও কামানের পরিবর্তে শান্তি ও শুভেচ্ছার বাণী বহু দেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রভাবে বহু অবনত জাতি সভ্যতার স্তরে উন্নীত হইয়াছে।

চীন, জাপান, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের জন্য বৌদ্ধধর্মেব বিবিধ কল্যাণকর কার্যাবলীর কথা আপনারা চিন্তা করুন। চিত্রবিদ্যা, মূর্তিশিল্প, ললিতকলা প্রভৃতির দ্বারা জাপানী সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য বৌদ্ধ সভ্যতার নিকট জাপানীরা ঋণী। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তৃতি হইয়াছে। সেই সময় হইতে জাপানে সেখানকার অন্যতম ধর্মমত কংফুৎসু এবং সিণ্টো ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম শান্তি ও নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে।

৬৫ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তাও[৩০] ও কংফুৎসু চীন দেশের এই দুই প্রসিদ্ধ ধর্মমতের অসংখ্য মতাবলম্বীদের সহিত চীনদেশবাসী বৌদ্ধগণ সদ্ভাবে ও নির্বিবাদে বাস করিতেছেন। বৌদ্ধধর্ম ঐ দুই ধর্মের কোন কিছুই ধ্বংস করে নাই। বরং আপনার মহান্ আদর্শে ঐ মতাবলম্বীদের চিত্তকে আরও উদার, সভ্য ও উন্নত করিয়াছে। লাফকাডিয়ো হার্ণ (Lafcadio Hearn) জাপান সম্বন্ধে তাঁহার এক গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম জাপানে কী বিপুল কল্যাণকর কার্য সাধন করিয়াছে

৩০। স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত *Great Saviours of the World*, পুস্তকে *Loa Tze and His Teachings*-এ 'তাও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

সে সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা এইচ্. ফিল্ডিং হল (H. Fielding Hall) প্রণীত *The Soul of a People* পুস্তকটি পাঠ করিয়াছেন তাঁহার ঐ পুস্তকে বর্ণিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মনুষ্যত্ব মানবপ্রেম ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী সম্বন্ধে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অপর জাতির ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতার ভাব হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে চিরকাল বর্তমান। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানদের পারস্যদেশ আক্রমণের ফলে জরথুষ্ট্রীয় ধর্মাবলম্বী পারসীরা ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে পারসীরা ভারতবর্ষে আপন ধর্মবিশ্বাস লইয়া নিরুপদ্রবে বাস করিয়া নানা বিষয়ে আপনাদের উন্নতি সাধন করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরা বিশেষতঃ ইংরাজদের মধ্যে অনেক উদারচেতা ব্যক্তি এখন হিন্দুদের এই পরধর্মমত-সহিষ্ণুতার মহান ভাবে মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হইয়া ইহা অনুশীলন করিতেছেন। অপরজাতির রাজ্য ও ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া নিজেদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিবার দুর্নীতি হিন্দু ও বৌদ্ধরা কখনও শিক্ষা করেন নাই। তাঁহারা শুধু মতবাদ বা মৌখিক উপদেশেই নয় পরন্তু আপনাদের জীবনের সুদৃষ্টান্তে সমগ্র জগৎকে সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুরা এবং বৌদ্ধগণ প্রকৃতপক্ষে জগতের যথার্থ ধর্মগুরুর মহাকার্য সাধন করিয়াছেন। ধর্মসাধনার আদর্শকে জীবনে পরিণত করিয়া ধর্মকে কি ভাবে প্রচার করিতে হয় ইহা তাঁহারা জানেন। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে ইউরোপীয় জাতিদের পররাজ্য অধিকারের অগ্রদূত মিশনারীগণ আজ তাঁহাদেরই অসভ্য বর্বর ও পৌত্তলিক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।[৩১]

৩১। এ সম্বন্ধে উদারচেতা ইংরাজ মনীষী বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি (Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield) বলিয়াছেন: "পাশ্চাত্ত্য-

যুক্তিবিচার প্রণালী অবলম্বনে শুধু বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চা অপেক্ষা বাস্তব জীবনে নীতিবাদ ও আধ্যাত্মিক ভাবকে অধিগত করাই হিন্দু ও বৌদ্ধগণ সর্বদা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। ভারতবর্ষে ধর্মই চিরকাল দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ললিতকলা, সঙ্গীত ও মানব-প্রতিভার অন্যান্য ক্ষেত্রেও উৎসস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম হইতেই হিন্দুরা আপনাদের শিক্ষাদর্শ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য ধর্মই তাঁহাদের নিকট জীবনশক্তির ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। ধর্মই ভারতবর্ষে প্রধান, যুক্তিবিচার অবলম্বনে বিদ্যার অনুশীলন সেখানে গৌণ। হিন্দুরা বহির্জগতের কোন ব্যাপার বা রীতিনীতির সংস্কার অপেক্ষা হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন। এই জন্যই সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর হিন্দু সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বণিক্‌বৃত্তি অথবা শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের উৎকট অভিলাষের উপর নয় পরন্তু নৈতিকশক্তি ও আধ্যাত্মিকতার যে শাশ্বত নিয়ম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দু-সভ্যতার সৌধ স্থাপিত হইয়াছে। অপরকে প্রতারণা দ্বারা উৎকট স্বার্থসিদ্ধি, পরস্বাপহরণ দ্বারা নিজেদের বিষয় সম্পদবৃদ্ধি, বাণিজ্যে অন্যায় অধিকার বিস্তার, নিরীহ নির্বিরোধী

বাসিগণ! তোমরা আজ কাহাকে অসুখী বলিতেছ? এশিয়াকে? এশিয়া অসুখী? যে এশিয়া ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র ও আধ্যাত্মিক চিন্তারাশির জন্মভূমি! সেই এশিয়া? আজ যদি এশিয়ার নিদ্রা আসিয়া থাকে তবে তাহার সেই নিদ্রাবস্থা জগতের অন্যসব দেশের জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষাও প্রাণময়। প্রতিভাশালী মানুষের স্বপ্নাবস্থা সাধারণ মানুষের জাগিয়া থাকা অপেক্ষাও অধিকতর সক্রিয়। 'এসিয়া অসুখী' এমন নির্বোধ বাক্য আর কখনও উচ্চারণ করিও না। এশিয়ার জন্য নয় পরন্তু আমি আজ ইউরোপের অসুখী অবস্থার জন্যই বিলাপ করিতেছি।"

শান্তস্বভাব দুর্বল জাতিদের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ও তাহাদের লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন প্রভৃতি পাশব নীতিপূর্ণ ইউরোপীয় সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতা সমপ্রকৃতিসম্পন্ন নয়।

যিনি ধর্মশাস্ত্রসমূহে পারদর্শী, সুবিদ্বান ও বিবিধ বিদ্যায় জ্ঞানী, যিনি সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী, সমস্ত নৈতিকনিয়ম পালন-কারী, দরিদ্র নিঃস্ব ও বিপন্ন ব্যক্তিদের যিনি সাহায্য করেন, মন্দ ব্যবহারের বিনিময়ে যিনি মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, প্রেম দ্বারা হিংসাকে এবং দানের দ্বারা যিনি লোভকে জয় করিয়াছেন এই প্রকার ব্যক্তিকেই হিন্দুরা সভ্য বলিয়া থাকেন। এই সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর নৈতিক গুণ। যিনি প্রকৃতপক্ষে সভ্য এই সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁহার চরিত্রের অলঙ্কার হওয়া উচিত। যে পশু-প্রবৃত্তি ও নীচ মনোভাব মানুষের জন্মগত সংস্কার সে সমস্তকে জয় করিয়া এই সব নৈতিক গুণকে অভ্যাস ও বিকাশ করাই প্রকৃত সভ্য ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। এই সমস্ত সদ্‌গুণই সভ্য মানুষকে অসভ্য বর্বর লোক ও ইতর প্রাণী হইতে উন্নত বলিয়া প্রমাণ করে। ইউরোপ ও আমেরিকায় আমরা দেখিতে পাই লোকে শুধু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে সভ্য ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। শুধু বাহিরেই নয় প্রকৃত সভ্য নরনারীর অন্তরও ভদ্র শিষ্টাচারী ও মার্জিত হওয়া উচিত। কারণ আচরণে আন্তরিকতা না থাকিলে তাহা প্রকৃত সভ্যতা হইতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি লাভ এবং বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে।[৩২]

৩২। বেঞ্জামিন ডিসরেলি এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "এই এশিয়া আবার জাগিবে। আবার ইহা ইউরোপের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিবে। জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যাহা আজ পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতা বলিয়া

'জোর যার মুল্লুক তার'—এই প্রাচীন বর্বর নীতিই সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্ত্য জাতিদের মূলমন্ত্র। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দৃষ্টি বাহিরের দিকে, প্রাচ্য সভ্যতার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য ঐহিক উন্নতি ও অভ্যুদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য লাভই ইহার একান্ত অভিপ্রায়। প্রাচ্য সভ্যতার চরম লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ। নৈতিক বিধির অনুশীলন তাহার এই উৎকর্ষ লাভের সহায়ক মাত্র। ইউরোপের তথাকথিত ধর্মই তাহার সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। সেখানে খৃষ্টীয়ান চার্চে ধর্মের বিচারালয়ের (Inquisition) অনুশাসন এবং ধর্মযাজকদের জনসমাজের উপর অযথা ও অবিশ্রান্ত অত্যাচার ও দণ্ডবিধান মানুষের স্বাধীন চিন্তার সম্পূর্ণ বিরোধী। গ্যালিলিও (১৫৬৪—১৬০২ খৃষ্টাব্দ) এবং গিয়ার্ডনো ব্রুনো প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মধ্যযুগে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের হাতে কী দারুণ নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা আপনাদের অনেকেরই স্মরণ আছে। খৃষ্টান চার্চের এই অযথা অত্যাচারের ফলে কী হইল? সেখানে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন ও ধর্মানুষ্ঠান অসম্ভব হইয়া পড়িল। চিন্তার স্বাধীনতা প্রকৃত সভ্যতার চির সহচর। যে সভ্যতা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক

অভিহিত সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা ইউরোপে কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে? গ্রেট ব্রিটেন দ্বীপটি ফ্রান্স এবং রাইন নদীর উভয় তীরে কিছুদূরের মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ। ইউরোপের অধিকাংশ এশিয়ার মতই অসাড় ও নিষ্পন্দ। তথাপি এশিয়ার সান্ত্বনা জলবায়ু; এশিয়ার সান্ত্বনা তাহার অতীতের অমর গৌরবময় ইতিহাস, সুখস্বাচ্ছন্দ্যহারা অধিকাংশ ইউরোপের হায়, এতটুকু সান্ত্বনাও যে নাই।"

স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীনতা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য; কিন্তু সে স্বাধীনতা নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত।

পররাজ্যলোভী ও যুদ্ধবাজ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার কুপ্রভাবে ভারতবর্ষ আজ তাহার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ভারতজননী আজ ক্রীতদাসী। অসঙ্কোচে আজ নিজ অন্তরের কথা বলিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। যে রাজশক্তির আধিপত্যের ফলে ভারতবর্ষ আজ পরাধীনা তাহার কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একটি কথাও তিনি বলিতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে আজ ভারতে শুধু বণিকবৃত্তিই আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জঘন্য আদর্শ হইতে ঘোরতর স্বার্থপরতার উদ্ভব হওয়ায় হিন্দুদের সুমহান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের মূল ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উৎকট বণিকবৃত্তি ও ঐহিক আধিপত্য-স্পৃহার নিকট আজ হিন্দুর সেই সরলতা ও মৈত্রীর আদর্শকে বলিদান করা হইয়াছে। আজ যাঁহারা যীশুখৃষ্টের ন্যায় পবিত্র ধর্মজীবন যাপন করিতে চেষ্টা করেন ইংলণ্ডের তথাকথিত সভ্যতার অগ্রগামী অধিকারিগণ তাঁহাদের সমস্ত বিষয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত করেন। আজ ইংরাজ শাসনের মহিমায় ভারতের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সুকুমার হৃদয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ঐহিক উন্নতি লাভের জন্য কুটিল বুদ্ধি ও কপটতা আজ হিন্দুর সেই মহান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শকে দূরে সরাইয়া দিতেছে। আজ ইংরাজ সভ্যতার চমৎকার প্রভাবে কশাইখানা, মদের দোকান, পান ভোজনের হল প্রভৃতি, বিদেশী রাজসরকারের আয়বৃদ্ধির জন্য আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা ও নানাপ্রকার মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় ভারতের চারিদিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাতে আজ ভারতের হিন্দুসমাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে একান্নবর্তী পরিবারের যে সুখ, ঐক্য, শান্তি ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ ছিল আজ তাহা বিলুপ্তপ্রায়। অবশ্য ইহাতে অন্ততঃ একটি সুফল হইয়াছে। ইহা হিন্দুদের জাতিগত পার্থক্য ও জাতিভেদের অনুদার বিধিব্যবস্থার কঠোরতা অনেক পরিমাণে শিথিল করিয়া দিয়াছে। তথাকথিত ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যের কুপ্রভাবে হিন্দুসমাজ জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কুপ্রভাব হইতে হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ মুক্ত হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কুলপুরোহিতদের অত্যাচারে হিন্দু সমাজ ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ করিতেছিল। আজ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে এই অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। আবার অন্য দিক দিয়া অনেক কুফলও ফলিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে হিন্দু সমাজে আচার-ব্যবহারে নিত্য নানা পরিবর্তন দেখা দিতেছে এবং ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই ধর্মে আস্থা হারাইয়া নাস্তিক সংশয়বাদী হইয়া পড়িতেছেন। ধর্মশিক্ষা বর্জিত নিছক জড় বিজ্ঞান-চর্চার ফলে যে সব দোষ দেখা দেয় এই সকল শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে এখন সেই সব দোষের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় তাঁহারা অনেকেই নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, উপযোগবাদী অথবা অধিকতম লোকের প্রভুততম সুখবাদী (Utilitariantist) হইতেছেন। প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উপাধি লাভ করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। মানুষের দেহ ছাড়াও আত্মা বলিয়া কোন অবিনাশী স্বতন্ত্র সত্তা যে থাকিতে পারে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইঁহাদিগের লক্ষ্য আর কোন বস্তুতে নাই, একমাত্র লক্ষ্য সাংসারিক জীবনে কৃতকার্যতা এবং সমাজে মান যশ ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তিলাভ। শুধু সদুপায়ে অর্থোপার্জন

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইলেই ইঁহারা মনে করেন জীবন সার্থক হইল। অন্নবস্ত্র সংস্থানের নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার ফলে ভারতবাসীর ক্রমশঃই নৈতিক অধঃপতন গভীরতর হইতেছে। জাতিবিভাগ অনুসারে একদা হিন্দুসমাজে বৃত্তি ও উপজীবিকা পৃথক পৃথক ছিল। এই নিয়ম প্রশংসনীয় না হইলেও তখন হিন্দুসমাজে আজিকার মতন এমন নৈতিক অবনতি হয় নাই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার চাতুরী ও কুট রাজনীতি ভারতে এখন স্থায়ী বাসা বাঁধিয়াছে। ভারতের শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ এখন জীবনে কোন পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ক্রমশঃ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িতেছেন। বালক যেমন বিপদে পড়িয়া নিজের প্রাণরক্ষার জন্য পিতাব আশ্রয় পাইবার চেষ্টা করে, শিক্ষিত হিন্দুরাও তেমনি বিপন্ন হইয়া বিদেশী রাজশক্তির সাহায্যের প্রত্যাশায় দৌড়াইয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষার জগতে অপরকে সাহায্য প্রদান আকাশ-কুসুমের মতন অলীক ও অসম্ভব ব্যাপার! সাহায্যের পরিবর্তে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের রক্তচক্ষু দেখিয়া ভারতবাসীদের হৃদয় নিরাশায় ও ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। ভারতে এখন সভ্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পদাঘাতে কত ভারতবাসীর ইহলীলা সাঙ্গ হইতেছে। এইভাবে নরহত্যার অপরাধে বৃটিশ সরকারের বিচারে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের হয়ত মাত্র পনের টাকা জরিমানা হইয়া থাকে। সভ্যতাগর্বী ইংরাজেরা আসামের চা-বাগানে কুলী-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রথা সেই পুরাতন ও বহুঘৃণিত দাস ব্যবসায়েরই সমতুল্য। কিন্তু বৃটিশ সরকার এ অপরাধে কোন ইংরাজকেই শাস্তি দেন না। আজকাল ভারতে এই সকল ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে।

যাহা হউক ইংরাজ শাসনকালে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবাসীদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে। দেশের সকলেই এখন

বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিদেশী রাজশক্তির শাসন জাতির উপর ঈশ্বরের অভিশাপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যে জাতি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য জাতির উপর যথেচ্ছাচার করে, হিন্দু সভ্যতার আদর্শ অনুযায়ী সে জাতিকে সভ্য বলিতে পারা যায় না। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করিতেছি যে, বৃটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ কোন কোন বিষয়ে উপকৃত হইয়াছে। দেড়শত বৎসর ধরিয়া যথেচ্ছাচার ও নির্যাতনের মধ্যে থাকিয়া হিন্দুরা এখন স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছেন—বিগত কয়েক শতাব্দী পূর্বে লুপ্ত জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমের ভাব এক্ষণে হিন্দুদের মধ্যে আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। অনেক শত বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীদের মনে নানা প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। বৃটিশ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও ইউরোপ এবং আমেরিকার সহিত সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের ফলে হিন্দু ভারতবাসীদের মন হইতে কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার ভাব ক্রমশঃই দূর হইতেছে। বাণিজ্যনীতির ব্যাপারে হিন্দুরা এখন পাশ্চাত্ত্য শাসক জাতিদের ছাত্রের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে তাঁহাদের কলা কৌশল ও চালচলন প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছেন। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুরা এবিষয়ে ইংরাজ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গজাতিদের সুযোগ্য শিষ্য হইতে পারিবেন! পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার রীতিনীতি ও কলা কৌশলে অভ্যস্ত হইয়া কিভাবে রাষ্ট্রীক ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে উন্নতি লাভ করা যায়, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপান তাহা প্রমাণ করিয়াছে। এক্ষণে এ বিষয়ে উন্নতি করিতে দারিদ্র্যজীর্ণ ও পরপদানত ভারতবর্ষই পরবর্তী দেশ। আমাদের ভাগ্যে হয়তো জাতির সেই উন্নতি দেখিবার সুযোগ নাও ঘটিতে পারে। কিন্তু যে স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতিরই একমাত্র লক্ষ্য, তাহা আমাদের পরবর্তী বংশীয়েরা অবশ্যই লাভ করিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার ফলে ভারতবাসী আর একটি বিষয়ে লাভবান হইয়াছে। সেটি হইতেছে জনসাধারণের কল্যাণকারী নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক বিষয়ে শিক্ষালাভ। ভারতবাসীর জন্য ইহা একটি নূতন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিপুল জ্ঞানলাভের শক্তিতে ভারতবাসীকে ইহা শক্তিমান করিতেছে। ভারতবর্ষে ছয়শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান বিজেতাদের শাসন চলিয়াছিল। কিন্তু এই দীর্ঘ ছয়শত বৎসর ভারতের জাতীয় ইতিহাস অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন তিমির যুগ ভিন্ন আর কিছুই নয়! এক্ষণে আধুনিক যুগে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদার জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় ভারতবাসীর চিত্ত হইতে মধ্যযুগের অজ্ঞতা কুসংস্কারের অন্ধকার ক্রমশঃই অপসারিত হইয়া যাইতেছে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের জন্য ভারতবাসী নানাবিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ইংলণ্ডের মারফতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আলোক ভারতে আসিয়া ভারতবাসীকে জ্ঞানের নব নব পথে পরিভ্রমণ করিবার জন্য উদ্দীপিত করিয়াছে। এই জন্য ভারতবাসী ইংলণ্ডের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে! এই সুযোগ হইতেই ভারতবাসী তাহাদের ভবিষ্যৎ গৌরব ও রাজনৈতিক নবজীবন লাভে সমর্থ হইবে বলিয়া সর্বদাই ঈশ্বরের নিকট নিজেদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবে। আধুনিক যুগে উন্নতি ও অভ্যুদয় লাভের জন্য একদিকে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের সহিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সমন্বয় অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয়। অন্য দিকে অপরের ধর্মমতে সহিষ্ণুতা, উদারতা ও মৈত্রীভাব ভারত হইতে শিক্ষা করা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, ভারতীয় সভ্যতার মুকুটমণি বেদান্তের সার্বভৌমিক ধর্মের যে মহোত্তম নীতি ও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা তাহার উপর ভিত্তি করিয়া পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা যাহাতে উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য পাশ্চাত্ত্যবাসীর উদ্বুদ্ধ হওয়া একান্ত কর্তব্য।

প্রথম পরিশিষ্ট

॥ ভারতবর্ষের শিক্ষা ও রাজনীতি ॥

(১৯০৬-১৯২৮)

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাসের ধারা এক সঙ্কটময় পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে। অতীত গৌরবের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে প্রবাহিত সেই ধারা যখনই রাজশক্তির সুদৃঢ় প্রতিবন্ধকে প্রতিহত হয় তখনই বিক্ষোভে স্ফীত হইয়া সে ভীষণ গর্জনে দুকুলপ্লাবী আপনার বিক্ষুব্ধ বেগ পরিব্যাপ্ত করে। তরুণ ভারত বুঝিতে পারিয়াছে যে, 'নিজ বাস ভূমে সে পরবাসী' এবং মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা ও তাহার সফলতা সম্পাদনের জন্য বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য উপকরণাদি তাহাকে লাভ করিতেই হইবে। কিন্তু বৈদেশিক রাজশক্তি তাহাতে অসম্মত। তাই অসহায় প্রজাশক্তির সহিত প্রবল রাজশক্তির প্রতিপদেই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয়, নানাবিধ আন্দোলন ও পরিবর্তনের সৃষ্টি করিতেছে। ইহাই উল্লিখিত সময়ের ইতিহাসের বিশিষ্ট ধারা। এক্ষণে প্রথমে আমরা শিক্ষা বিভাগে যাহা যাহা পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া পরে রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলির সামান্য আভাস পাঠকদিগকে দিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে শিক্ষার অভাব ও তাহার উদ্দেশ্যে ইংরাজ-শাসনের প্রতিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য দেশের তুলনায় বিদেশীয় শাসকসম্প্রদায় ভারতীয় জনসাধারণের

মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। বৃটিশ-ভারতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনাতে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি হাজারে মাত্র ৭২ জন ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে পারে এবং তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে হাজারে ১ শত ১২ জন পুরুষ ও ১৮ জন নারী। বলা বাহুল্য, এই অতি সাধারণ শিক্ষা-লাভও জনসাধরণের নিজেদের চেষ্টার ফল। দেশীয় করদ ও মিত্ররাজ্যসমূহের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, বিদেশী শাসনতন্ত্র জনসাধারণের অজ্ঞতার জন্য কি পরিমাণে দায়ী। একমাত্র ব্রহ্মদেশ ভিন্ন (যেখানে ফুঙি-চঙ্ বা প্রাচীন আমলের মন্দির পাঠশালাতেই বহু লোকের শিক্ষালাভ হইয়া থাকে) বৃটিশশাসিত ভারতের অন্য যেকোন প্রদেশ অপেক্ষা কয়েকটি দেশীয় মিত্ররাজ্যের অর্থের অকুলান প্রভৃতি নানাবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশী। ত্রিবাঙ্কুরে শতকরা ২৪ জন, বরোদাতে শতকরা ৭৫·৫ জন ও মহীশূরে ১৬ জন ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে পারে। আমেরিকার অধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেও গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৭০·৫ জন পুরুষ ও ৬১ জন নারী লিখন পঠনক্ষম ছিল। স্বাধীন জাপানে শতকরা ৯৮ জন পুরুষ ও ৯৬ জন নারী লিখিতে পড়িতে পারে। সুবিজ্ঞ ইংরাজ জাতির ১ শত ৫০ বৎসরের আন্তরিক চেষ্টার ফলে শিক্ষার উন্নতি ব্যাপারে আজ ভারতের স্থান কোথায়!

নিজ স্থাপিত শিক্ষাবিভাগের পরিচালনা ও অন্যান্য দিকে শিক্ষাপ্রসারের জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯০৫-১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিন কোটি টাকা, ১৯১৬-১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ছয় কোটি ও ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে তের কোটি টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয় করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বসমেত শিক্ষা বাবদ ব্যয় গভর্ণমেণ্টের মোট

ব্যয়ের ৪৭·৯ অংশ মাত্র। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের জন্য আর্থিক সম্বলহীন জেলা বোর্ড প্রভৃতি হইতে শতকরা ১৩·১ টাকা এবং ছাত্র-বেতন হইতে ২২·৪ টাকা এবং অন্যান্য দিক হইতে ১৬·৬ টাকা আদায় করিয়া রাজকোষে সঞ্চিত করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রজাবর্গ নানাপ্রকারে জন প্রতি ৫।৴০ রাজস্ব দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিয়া থাকেন জন প্রতি ৵০ আনা মাত্র। বলা বাহুল্য, জাপানে শিক্ষার জন্য জন প্রতি ৮৲ টাকা ও এমন কি, ডেনমার্কের মত ইউরোপের একটি অতি ক্ষুদ্র দেশেও শিক্ষা বাবদ জন প্রতি ১৭।৴০ আনা ব্যয়িত হয়। অপরন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে দেশীয় ও ইউরোপীয় ছাত্রের স্কুল শিক্ষার বাবদ সরকার কর্তৃক জন প্রতি ব্যয়ের তারতম্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট প্রতি বাঙ্গালী ছাত্রের জন্য ২৷৵০ আনা এবং প্রতি ইউরোপীয় ছাত্রের জন্য ১ শত ৩।০ আনা ব্যয় করিয়াছেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ব্যয়িত অর্থ প্রকৃত শিক্ষাপ্রদানের কার্যে সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয় না, ইহার অধিকাংশই অর্ধভুক্ত কুটীরবাসী গ্রাম্য ছাত্রদিগের প্রাসাদোপম ছাত্রা-বাসাদি ও বিদ্যালয়ের জন্য অট্টালিকাদি নির্মাণকার্যে এবং বিদেশীয় শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের কর্মচারীদিগের অত্যধিক বেতন প্রদানেই ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে।

এইরূপে শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ভারতবাসীকে সুশিক্ষিত করিয়া ভারতের প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে বণ্টন করা হয় না। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রচার অধিকর্তা জে. কোটম্যান বলেন: "শিল্পশিক্ষাও একপ্রকার অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে * *। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের সাড়ে সাতাশী হাজার ছাত্রের মধ্যে ৭০ হাজার আর্ট ও

সায়েন্স কলেজে এবং ৮ হাজার ছাত্র আইন অধ্যয়ন করিতেছে। মাত্র ৯ হাজার ৫ শত ছাত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, এঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য-বিজ্ঞান ও শিক্ষকতা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করিতেছে এবং মাত্র ৬ শত ৪১ জন কৃষি, ১ শত ১৯ জন জীবন-রক্ষা ও ২ শত ৭২ জন পশুচিকিৎসা শিক্ষা করিতেছে।"[১] ফলে এই শিক্ষার দ্বারা দেশের অন্ন-সমস্যার অথবা বেকার-সমস্যার কোন প্রকার সমাধান হইতেছে না। সেই কারণে বর্তমানে এই শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের জন্য দেশবাসী-দিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের সভায় মহামতি গোখলে দেশে অল্প-পরিমাণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তখন অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। তথাকথিত ব্যয় সংক্ষেপ সত্ত্বেও কয়েক বৎসর পরে ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে রাজস্বের শতকরা ২৮৲ টাকা সামরিক বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। কিছু দিন হইল গণপ্রতিনিধিগণ আটটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রবর্তন করেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই প্রদেশে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে বিহার ও উড়িষ্যায়, মে মাসে বাঙ্গলায়, জুন মাসে যুক্তপ্রদেশে, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আসাম প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন পাশ করা হয়, এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা-আইন প্রবর্তন করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশ নূতন শাসন-

১। *India in 1926* by J. Coatman, Director of Public Information, Government of India.

তন্ত্রের কতকগুলি আইন-কানুনের সুযোগ লাভ করিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিয়াছে। সরকার প্রথমতঃ নানাবিধ কারণ দেখাইয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে স্বীয় সামর্থ্যের অভাব ও অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন; কিন্তু অতঃপর তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবনে অনুমানে তাহার ব্যয়ভার বর্তমানে ক্রমশঃ স্থানীয় জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির উপর ন্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং সেজন্য প্রদেশসমূহে বিশেষ শিক্ষা-কর ধার্য করিবার আয়োজনও করিতেছেন। মোটের উপর দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচারের প্রতি বর্তমানে বিশেষভাবে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা এই সময়ের এক বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে নূতন কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করিবার প্রস্তাব পাশ করেন, কিন্তু দেশে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিকূল থাকায় তাহা কার্যে পরিণত করা হয় নাই। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্যার মাইকেল্ স্যাডলার-এর (লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার) সভাপতিত্বে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার জিয়াউদ্দীন আহম্মদ ও অপর চারি জন ইংলণ্ডদেশীয় সভ্য লইয়া 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' গঠিত হয়। তাঁহারা নানা স্থান পরিভ্রমণ ও নানা কলেজ পরিদর্শন ব্যাপারে রাজকোষের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া দুই বৎসর পরে তাঁহাদের কমিশনের একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তখন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে কলেজ ও ছাত্র-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা:

বিশ্ববিদ্যালয়	কলেজ-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
কলিকাতা	৫৮	২৮,৬১৮
মাদ্রাজ	৫৩	১০,২১৬

বিশ্ববিদ্যালয়	কলেজ-সংখ্যা	ছাত্র-সংখ্যা
বোম্বাই	১৭	৮,০০৯
এলাহাবাদ	৩৩	৭,৮০৭
পঞ্জাব	২৪	৬,৫৫৮

স্যাডলার কমিশন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, বর্তমানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং কলেজগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া বোর্ড (*Board of Secondary and Intermediate Education*) গঠিত করিতে হইবে, এবং কলেজের প্রথম দুই বৎসরের শিক্ষার পরিচালনা ও তাহার আয়-ব্যয়াদি সম্বন্ধে যাবতীয় কার্যভার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অপসারিত করিয়া সরকারের হস্তেই অর্পিত হইবে। তাঁহাদের মতে ইংরাজী ভাষাকে সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাবাহন রূপে (medium) ব্যবহার করিলে চলিবে না, কেবলমাত্র ইংরাজী সাহিত্য ও অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষা ইংরাজী ভাষার সহায়তায় প্রদত্ত হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সমুদয় বিষয় মাতৃভাষাতেই পড়াইতে হইবে এবং বেতনাদি বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষকদিগের অবস্থা ও পদমর্যাদা অধিকতর উন্নত করিতে হইবে।

সরকারের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া তাঁহারা সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি প্রস্তাব করেন এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির পরস্পরের মধ্যে অধ্যাপক আদান-প্রদানের পরামর্শ দেন। উপরন্তু মুসলমানদিগের জন্য বিশিষ্ট শিক্ষার কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহারা মোসলেম সভ্যতা ও সংস্কৃতি আলোচনার জন্য ঢাকাতে এক বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত করিবার ব্যবস্থা দেন। অতঃপর সরকার শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষার ভাষা পরিবর্তন বা অধ্যাপক আদান-

প্রদান প্রভৃতি কমিশনের সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত না করিয়া তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাবগুলিই কার্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্যাডলার কমিশনের জন্য এত অর্থব্যয় জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকাংশে দেশীয় খ্যাতনামা মনীষীগণের স্বাধীন মতানুসারে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ নেতৃত্বে স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের বদান্যতা ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের সমবেত চেষ্টায় বি. এ. উপাধির পর উচ্চতর শিক্ষা প্রদানের ভার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতেই অর্পিত হয়। তদবধি বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিদ্যায় উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রদান করিয়া ও প্রতিভাশালী ছাত্রদিগের মৌলিক গবেষণা কার্যে সহায়তা করিয়া দেশ ও জাতির জ্ঞানভাণ্ডার শ্রীসম্পন্ন করিয়া আসিতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকারী এক নূতন আইনের ফলে গভর্ণর জেনারেলের পরিবর্তে বাঙ্গালার গভর্ণর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শতকরা ৮০ জন মনোনীত সভ্য লইয়া বাঙ্গালার সরকারী দপ্তরের অধীন হইয়া পড়ে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়। মোসলেম সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়াও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় সরকারী অর্থে দিন দিন পুষ্টিলাভ করিতেছে। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার কার্যাবলীর বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াও সরকারের চিরন্তন অর্থাভাবের অজুহাত হইতে অব্যাহতি পাইতেছে না।

অবশিষ্ট চারটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দের এক আইনে পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ

বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের হাত হইতে তথাকথিত মুক্তিলাভ করিয়া স্যাডলার কমিশনের প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত হয়। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদের ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিজামের ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এক ফরমানের বলে গঠিত হয়। উর্দ্দূ এখানে শিক্ষার বাহন, কিন্তু ইংরাজী অবশ্যপাঠ্য বিষয়। মহীশূরে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রণালীতে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গৌরব বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সগৌরবে ইহার সর্বপ্রথম ভাইস্‌-চ্যান্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়জীর অপরিমিত উৎসাহ ও অক্লান্ত চেষ্টায় কাশীতে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, শুধু শিক্ষা-পরিচালনা নহে। এই কয়েক বৎসরে ইহা হিন্দু সভ্যতা আলোচনার কেন্দ্ররূপে জনসাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, অধিকন্তু মালবীয়জীর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি সমগ্র ভারতে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইতিমধ্যে আলিগড়ের মুস্‌লিম্‌ বিদ্যালয় স্যার সৈয়দ আহম্মদের য়্যাংলো ওরিয়েণ্টাল স্কুলের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মাননীয় আগা খাঁর চেষ্টায় মুস্‌লিম্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টাকা সংগৃহীত হয়, কিন্তু ভারতের অন্য কোন স্থানের কলেজকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব ভারতসচিব গ্রহণ করিলেন না। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-সভা (কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের মত) শুধু আলিগড়ের কলেজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে সম্মত হইলে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এক তদন্ত কমিটি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দলাদলি নিবারণের জন্য অধিকতর য়ুরোপীয় অধ্যাপক ও পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন।

সর্বশুদ্ধ ভারতবর্ষে আজ ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি গত কয়েক বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে ঃ

পাটনা (১৯১৭), রেঙ্গুন (১৯২০), [ব্রহ্মবাসিদিগের আন্দোলনের ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এক নূতন নিয়মানুসারে জনসাধারণ উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালনা করিবার ক্ষমতা লাভ করে] ঢাকা (১৯২০), দিল্লী (১৯২২) [প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পরিবর্তে ভারত গভর্ণমেণ্টই ইহার পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন], নাগপুর (১৯২৯), অন্ধ্র (১৯২৬) [তেলেগু ভাষাভাষীদিগের জন্য], ও আগ্রা (১৯২৬)। ২০ লক্ষ টাকার এক দানের উপর নির্ভর করিয়া "আল্লামা লইতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক-গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ই সরকারের অর্থ দ্বারা বাঁচিয়া আছে এবং অপর কয়েকটি শুধু সাধারণের দানের ভিত্তির উপর গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে এবং হইতেছে। সরকারের প্রদত্ত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে যে সকল প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে 'বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন', কনখলের 'গুরুকুল' ও 'সবরমতী'-র বিদ্যালয়ত্রয় এবং দাক্ষিণাত্য অধ্যাপক কেশব কার্ভের 'নারী-বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-শাসন-সংস্কার আইনানুসারে বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের ভার দেশীয় শিক্ষামন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু সরকার হইতে প্রয়োজনমত অর্থ না পাওয়ায় ও স্বকীয় চিন্তানুযায়ী স্বাধীনভাবে শিক্ষাপ্রসারের পশ্চাতে সরকারের আনুকূল্য না থাকায় তাঁহারা অতি সামান্য কার্যই করিতে পারিয়াছেন। ইহা ছাড়া য়ুরোপীয়দিগের শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থ সরকার নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন এবং বস্তুতঃ এদেশবাসীর শিক্ষার অর্থ দ্বারা বিদেশীয় ছাত্রেরাই জাঁক-

জমকের সহিত শিক্ষালাভ করিতেছে এবং দেশীয় ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে।

ভারতের জাতীয় নেতৃবর্গ মনে করেন, বর্তমান শিক্ষাসমস্যা দেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার সহিত এমনই ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, স্বরাজ-লাভ ভিন্ন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষাবিস্তার সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা সফল না হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, স্বরাজ ভিন্ন এ বিষয়ে জাতীয় উন্নতিসাধনের আশা সুদূরপরাহত। সেই জন্য কেহ কেহ এমনও বলিয়াছেন ঃ "শিক্ষা এখন থাকুক, আগে স্বরাজ লাভ করি" ('Education may wait, but Swaraj cannot') সুতরাং স্বরাজ লাভের জন্য এই কয়েক বৎসর ধরিয়া দেশে কিরূপ চেষ্টা হইয়াছে, এবার তাহারই পর্যালোচনা করিব।

রাজনীতিক্ষেত্রে এই কয় বৎসরে (১৯০৬-১৯২৮) ইতিহাস আপনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে। নব-জীবনের অভিমুখে এই মহাজাতির অগ্রগতি আমলাতন্ত্রের শাসনে নানাভাবে কেবল বাধাই পাইয়াছে। আমলাতন্ত্র 'অসার খেলনা' দিয়া একটা জাগ্রত জাতিকে ভুলাইতে চাহিয়াছেন। স্বাধীনতার সৈনিকদল নানাভাবে লাঞ্ছনা পাইয়াছেন এবং দমননীতির সহায়ক 'বে-আইনি আইন' ও কঠোর শাসনে একটা বিশাল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু জাগ্রত ভারত কিছুতেই নিরস্ত হয় নাই। সাম্প্রদায়িক কলহ, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ও সম্প্রদায় হিসাবে চাকুরী-বিতরণপ্রথা এই কয় বৎসরে ভারতের দেহে পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ়তর করিয়াছে এবং সরকারের তাঁবেদার মেরুদণ্ডবিহীন একদল ভারতবাসী অর্থ ও তথাকথিত সম্মানে প্রলুব্ধ হইয়া স্বাধীনতার সমরে জাতির প্রেরণাকে নিশ্চল করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আর ইহাই এই সময়ের নিতান্ত শোচনীয় ঘটনা!

লর্ড কার্জন তাঁহার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-আইনের জন্য ভারতবাসীর অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে যখন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করিয়া তিনি মুসলমানদের নূতন মুসলমান-প্রদেশের লোভ দেখাইলেন এবং তাহারাই যে সরকারের 'সুয়ো রাণী' এভাব প্রকাশ পাইলে সারা বাঙ্গালার সঙ্গে ক্ষুব্ধ ভারত এই অপমানের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া আবার এমন করিয়া দাঁড়াইলেন যে,'কর্জনী গর্জন' আকাশে মিলাইয়া গেল, বঙ্গভঙ্গ নিষেধ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত জন্মগ্রহণ করিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই মার্চ স্যার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলের এক বিরাট সভায় ভারতের ইতিহাসে প্রথম বার বড় লাটের উপর অনাস্থাজনক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ভারত-সচিবের বঙ্গভঙ্গে সম্মতির সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতী দ্রব্য-বর্জনের (boycott) আন্দোলনও প্রবল আকার ধারণ করিল এবং ৩০শে আশ্বিন তারিখে (সন ১৩১২) রাখিবন্ধন-উৎসবে জনসঙ্ঘের অভূতপূর্ব উৎসাহের পরিচয় পাওয়া গেল। বিলাতী সংবাদপত্রগুলিও বঙ্গভঙ্গের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সরকারের নীতির নিন্দা করিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরোজী সভাপতির অভিভাষণে স্বরাজের কথা উচ্চকণ্ঠে উল্লেখ করিলেন এবং তৎকালীন বিলাতের প্রধান মন্ত্রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানের কথায় বলিলেন: "সু-শাসন কখনও স্বরাজের সমান হইতে পারে না।" সিপাহী-বিপ্লবের পর প্রথমবার ভারত আবার ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বিপ্লব ঘোষণা করিল। তিলক, অরবিন্দ ও সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গদেশ ও মারাঠা এক হইয়া ভারতবর্ষে নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দেরসুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীরা (moderates) পৃথক্ হইয়া গেলেন এবং পর-বৎসরের কংগ্রেস হইতে বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদনের জন্য নরমপন্থীদের রাখিয়া, চরমপন্থীরা

(extremists) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। তরুণদল বাঙ্গালায় 'যুগান্তর' ও পুনায় 'কেশরী'র অনুপ্রেরণায় চরম বিদ্রোহের পথে গুপ্ত সমিতির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নিয়মানুবর্তীতে গঠিত দলের গুপ্তহত্যার কার্য ভারতে ও ভারতের বাহিরে কতকগুলি প্রতিভাশালী উচ্চ শ্রেণীর যুবকদের[২] লইয়া গঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে তিলক ও অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বাঙ্গালার ছয়জন নেতাকে সরকার তজ্জন্য নির্বাসনে পাঠাইলেন। ইহার পরেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কার-আইন বে-সরকারী সভ্যদের ভারতীয় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পথ খুলিয়া দিল ; এক জন ভারতীয়কে বড়লাটের শাসন-পরিচালনা-পরিষদে (Executive Council) সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইল এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে দুই জন ভারতীয়ের স্থান হইল। এই সামান্য ও অনুদার সংস্কারে ভারতের জাতীয় দল মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোলের কথায়—মর্লি-সংস্কার শুধু ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে সামান্য নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন দ্বারা প্রসারিত করে এবং তাহাদের অভিমত প্রকাশের (যাহা গ্রহণ করিতে সরকারের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না) ক্ষমতা দেওয়া হয়। যে আলোচনা কংগ্রেসেই শুধু করা হইত—তাহা এখানে করিবার সুবিধা করিয়া দেয়। কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলন থামিল না। কারণ, স্বাধীনতার প্রেরণা সহজে নিভিতে পারে না। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর মহাসমারোহে দিল্লীতে দরবার করিয়া সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীকে ভারতের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী বলিয়া ঘোষণা করা হইল ;

২। Sir Valentine Chirol : *India's Unrest.*

উদ্দেশ্য হইল—লোকের মনে রাজভক্তির উদ্রেক করা। কিন্তু দিল্লীর সমারোহের সময় অর্ধাহারী ভারতবর্ষ এদিকে দুর্ভিক্ষের অনাহারে জর্জরিত। সম্রাট্ বঙ্গভঙ্গ নিষেধ করিলেন বটে কিন্তু আসাম প্রদেশ বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং বিদ্রোহের কেন্দ্রস্বরূপ কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে সরাইয়া লইয়া গেলেন। গরমপন্থীদের ইহাতে কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মশক্তির গতি কমিল না। পরন্তু ১৯.২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান নেতৃগণ আবার একটি 'মুসলীম লীগ'-এর প্রবর্তন করিয়া কংগ্রেসের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে বঙ্গভঙ্গ নিষেধ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ অনেককে খুসী করিয়াছিল। মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হইল, তখন ভারতীয় সৈনিকেরাই ফ্রান্সের যুদ্ধে কামানের গোলা প্রথম বুক পাতিয়া লইয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড (তখন স্যার) সিংহ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিপদে ভারতকে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে বলিলেন এই মর্মে প্রতিদান স্বরূপ ইংরাজের ধর্মবুদ্ধি ভারতের ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে পারে। বিপদের সময় মুসলমান-দিগকে ইস্‌লামের ক্ষতিকর কিছু করা হইবে না এই আশ্বাস দিয়া এবং ভারতকে অনেক আশার কথা শুনাইয়া অন্য সমস্ত ইংরাজ উপনিবেশ বা প্রদেশের অপেক্ষা বেশী সৈন্য ও অর্থ ভারত হইতে ইংলণ্ড পাইয়াছিল; কিন্তু বিপদের পর ঐ সকল প্রতিজ্ঞা মোটেই রক্ষিত হয় নাই। এই সময় একদল হিন্দু ও মুসলমান দেশপ্রেমিক আন্তর্জাতিক গণ্ডগোলের সুবিধা লইয়া অন্য দেশের সাহায্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের সহায্যে ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন! কিন্তু সরকার ইহার সন্ধান পাইয়া নূতন আইনের সহায়তায় দোষী ও নির্দোষ বহু দেশ-প্রেমিককে নির্বিচারে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী য়্যাস্‌কুইথ আবার বলিলেন যে, এখন হইতে

ভারতীয় সমস্যাকে নূতন চোখে দেখিতে হইবে। ইহাতে ভারত প্রথমে আশ্বাম্বিত হইলেও যখন 'নূতন ইঙ্গিত'-এ সমস্যা সমাধানের কোনই লক্ষণ দেখা গেল না, তখন লোকমান্য তিলক তাঁহার 'স্বরাজ' কাগজে এবং মিসেস বেসান্ট তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া' কাগজে আবার প্রবলভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করিতে বলিলেন। এই সময়ে "কামাগাতা মারু" জাহাজে ক্যানাডাপ্রবাসী এক শিখদলের কয়েকজন ফিরিয়া আসিয়া বজ্‌বজে পুলিসের সঙ্গে দাঙ্গায় হতাহত হয় এবং এই ঘটনা ভারতকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। এক বৎসরের ভিতর ডক্টর অ্যানি বেসান্টের স্বায়ত্বশাসন-সভার (Home Rule League) পঞ্চাশটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। যুদ্ধে আর একটি দিকে ইংরাজ সজাগ হইয়া উঠেন। যুদ্ধের সময় ভারতের পাট ও অন্যান্য জিনিষ দিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগানর কার্য দেখিয়া শিল্প-কমিশন বলেন যে, ভারতবর্ষে যে শিল্প (Industry) বিদেশীরা ইচ্ছা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল তাহা সরকারী চেষ্টায় আবার বাঁচাইয়া তোলা দরকার। ইংলণ্ডও বুঝিতে পারিল যে, ভারতে বিলাতী মালের ব্যবহারের উপরই তাহার সাম্রাজ্যশক্তির দৃঢ়তা নির্ভর করিতেছে। জাতীয় আন্দোলনের ফলে ভারত শীঘ্র হাত ছাড়া না হয় যাহাতে, সেই জন্য ইংলণ্ড আর এক কিস্তি সংস্কারের কথা বলিয়া ভারতকে 'শান্ত' করিবার চেষ্টা করিলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট ভারত-সচিব মণ্টেগু পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতে ইংরাজশাসন নীতি হইতেছে শুধু রাজ্য-শাসনের সকল বিভাগে ভারতীয়দের সুবিধা দেওয়া নহে, পরন্তু ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এক অংশ হিসাবে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত-শাসনে শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে নিজস্ব-শাসনের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি নিজে ভারতে আসেন ও বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের

সহিত পরামর্শ করিয়া এক রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবমত আইন পার্লামেণ্টে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে যখন উপস্থিত করা হয়, তখন মিসেস অ্যানি বেসাণ্ট বলিলেন : "ভারতের জন্য চিরন্তন দাসত্ব শুধু বিদ্রোহেই যাহার অবসান সম্ভব এমন ব্যবস্থা হইতেছে।" বিলাতী পার্লামেণ্টে দুইটি সভার দ্বারা অদল-বদলের পর যখন আইন হইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'Diarchy' বা দ্বৈতশাসন আনিয়া দিল তখন ভারতের প্রদেশগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জিলা-বোর্ড, ইউনিয়ন-বোর্ড পরিচালনা প্রভৃতি বিষয় ভারতীয় মন্ত্রীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু অর্থ বিষয়ে এক দল সরকারী ও সরকার-মনোনীত সদস্যদের ভোটের নাগপাশ দিয়া এই মন্ত্রীদিগকে এমনভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইল যেন তাঁহারা সরকারের হুকুম তামিল ছাড়া বেশী নড়াচড়া না করিতে পারেন। যদিও মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড-রিপোর্ট বিশদভাবে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিষময় ফলের কথা বলিয়াছেন, তবুও নূতন আইনে ঐ বিষই ভারতের দেহে আবার সঞ্চারিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে গত কয়েক বৎসরে এক দল স্বার্থান্ধ চাকুরীমোহাচ্ছন্ন লোক বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান-দিগের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করিয়া ভারতকে হীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। নূতন সংস্কার-আইন 'কাউন্সিল অব ষ্টেট', 'লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসেম্‌ব্লি' ও 'চেম্বার অব প্রিন্সেস' নামে যে তিনটি সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে সরকার গলাবাজির সুবিধাই কেবল দিয়াছেন; কারণ যখনই এই সভাগুলির প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সুবিধাজনক হয় নাই, তখনই বড়লাট তাহা কলমের এক খোঁচায় রদ ও বাতিল করিয়া দিয়াছেন। আর এই আইনে সমস্ত বৃটিশ ভারতের ২৫ কোটি লোকেরভিতর মাত্র ৭৪ লক্ষ লোকপ্র তিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা পাইয়াছেন। এই আইন পাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার আবার 'রাউলাট কমিটি' নামক

বিদ্রোহ তদন্তের এক কমিটীর প্রস্তাবমত তুইটি আইন পাশ করেন—যাহাতে বিনা বিচারে যাহাকে ইচ্ছা অনির্দিষ্ট কালের জন্য গবর্ণমেণ্ট আটক (interned) করিয়া রাখিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধী এই সময় তাঁহার সত্যাগ্রহ মন্ত্র লইয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় অপূর্ব নৈতিক শক্তি দেখাইয়াছিলেন এবং ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনক্ষেত্রে তাহার পরই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল সত্যাগ্রহ-মন্ত্রের দীক্ষা লইবার দিন ধার্য হয় এবং রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার জন্য শিখ-উৎসবের দিনে আহূত অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত এক নিরস্ত্র জনসঙ্ঘকে ইংরাজের একজন সেনাপতি জেনারেল ডায়ার উপযুক্ত লক্ষ্যস্থল মনে করিয়া গুলি করিয়া নৃশংসভাবে (সরকারী হিসাবে ৩ শত ৭৯ জনকে খুন এবং ১ হাজার ২ শত ব্যক্তিকে) জখম করেন! শুধু তাহাই নহে, তাহাদের কোন ডাক্তারের সাহায্য দিবার দরকারও ডায়ার মনে করেন নাই! তাহার পর পাঞ্জাবের বহু নর-নারীর উপর যে অকথ্য লাঞ্ছনা করা হয়, তাহা ভারত কখনও ভুলিতে পারিবে না। সরকারের তদন্ত-সমিতি অবশ্য ডায়ারের কার্যের নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এক মানহানির মোকদ্দমায় (Tilak Vs. Chirol) এক বিলাতী জজ ডায়ারকে সমর্থন করেন—যদিও বৃটিশ মন্ত্রিসভা আবার তাঁহার কার্যের নিন্দাও করিয়াছিলেন। কিন্তু যে অপমান ও অনাচার পাঞ্জাবের বুকে হইয়াছিল তাহার প্রতিকার কখনও হইল না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, ঠুনকা শাসন-সংস্কারের পুতুলখেলা এবং খিলাফতের উপর অত্যাচার ভারতকে আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে স্বরাজের জন্য উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। কিন্তু ইংরাজের আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ এবং বিলাতী বস্ত্র ও অন্যপ্রকার পণ্য বর্জন ও স্বদেশী চরকা গ্রহণ—এই চারি মন্ত্র লইয়া মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু এবং লালা লাজপত রায় প্রভৃতির সহযোগিতায় নিজ প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগনীতি দ্বারা ভারতে এমন আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন যে, সরকার একটি গোল টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) ডাকিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ভারতের নেতারা তাহা গ্রহণ করিলেন না, বরং আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ করিবার জন্য দেশকে যখন তৈয়ারী করিয়া আনিয়াছেন, তখন মহাত্মা গান্ধী চৌরিচৌরার দাঙ্গার সংবাদে মর্মাহত হইয়া এ সব বন্ধ করিয়া দেন। পরে বার্দোলী আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধের প্রথম প্রচেষ্টা করেন। সরকার কিন্তু তাহা বন্ধ করিয়া দেন এবং মহাত্মা গান্ধীকে ছয় বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মহাত্মাজীর ছোট বড় বহু অনুগামী সরকারের দণ্ডনীতির কল্যাণে তাঁহার পূর্বেই বন্দী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রাজপিতৃব্য ডিউক অব কনট যখন দিল্লীর তৃতীয় সভার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন তখন দিল্লীর সমস্ত পথ জনহীন এবং বহু দিল্লীবাসী ছয় মাইল দূরে যাইয়া মহাত্মার বাণী শ্রবণ করিতেছিল। নির্জন রাজধানীতে রাজপিতৃব্য তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করেন। তৎপরে ইংরাজ যুবরাজ (বর্তমানে ডিউক অফ্ উইণ্ডসর) এ দেশে জনগণের অভ্যর্থনা না পাইয়াই ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রথম তিন বৎসর কোন অসহযোগী সংস্কারমূলক এই সভাগুলিতে যান নাই ; কেবল এক দল স্বার্থান্ধ অদূরদর্শী লোক লইয়া যন্ত্রের মত এই সভাগুলি সরকারের কথামত চালিত হইতে থাকে। কিন্তু ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গবর্ণমেণ্টের সভাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবিরত বাধা প্রদান ও বাহিরে দেশকে স্বরাজ অভিযানের জন্য প্রস্তুত করার প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেসকে স্বরাজ্যদলের কর্মপদ্ধতিতে রাজী করাইয়া লন। সমস্ত দেশ উৎসাহের সহিত তাঁহাদের কথামত কাজ করে এবং ব্যবস্থা-পরিষদে বিশেষতঃ

বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সহিত আইন-বিতর্ক-যুদ্ধে বার বার হারিয়া গিয়াও দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতের বিরুদ্ধে আপনাদের মত বহাল রাখিয়া সংস্কারের অলীকতা দেখাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের 'মুডিম্যান সংস্কার-তদন্ত-কমিটী'-তে যে সব মন্ত্রীরা লোক-মতের বিরুদ্ধে সংস্কার-শাসনের কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, শুধু মেকী সংস্কারের ব্যবস্থায় যে কোন কার্য করা অসম্ভব তাহা নহে, পরন্তু সরকার স্বায়ত্ত-শাসন দিবার নাম করিয়া নিজ হাতে আরও বেশী ক্ষমতা লইয়াছেন; কেননা সাধারণতঃ গভর্ণরগণ তাঁহাদের শাসন-পরিচালন-সভার (Executive Committee) মতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু কলমের এক খোঁচায় তাঁহারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারীদের মত কার্য করিবার ক্ষমতা সংস্কার আইন অনুসারে পাইয়াছেন। স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য অবশ্য সফল হইয়াছে এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক অধিবেশন হইতে কংগ্রেস আবার প্রবলবেগে দেশে তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিল এবং কিছুকাল হইল— বার্দোলী তালুকে আবার ট্যাক্স অনাদায়ের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে অনেকবার অনেক উপায়ে বন্ধুত্ব রক্ষার সুবিধা দিয়াছে, কিন্তু ইংলণ্ডের নির্বুদ্ধিতা ও দণ্ডনীতি ভারতের সহযোগিতার ভাব হরণ করিয়া লইয়াছে। বিশেষ করিয়া সরকার বিনাবিচারে বাঙ্গালার প্রায় দুই শত স্বদেশ-প্রেমিককে আটক করিয়া রাখিয়া এবং তাঁহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া দিয়া গত কয়েক বৎসরে ভারতের ঘরে ঘরে এবং যুবকদের ভিতর যে অসন্তোষ জাগাইয়া দিয়াছেন, তাহা সহজে নিভিবে না, বরং এই বহ্নি ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রলয়ের দিন ডাকিয়া আনিতে পারে।

কংগ্রেসের মতে—ইংলণ্ড মুখে "রাজ্যশাসনের সকল বিভাগে ভারতীয়-দের সুবিধা প্রদানের" কথা বলে, আর সেনাদলে, নৌবহরে এবং রেলওয়ে বোর্ডে ভারতীয়দের কোন অধিকারই কখনো দেয় না। ব্রিটিশ মুখে তাহার সাম্রাজ্যের একত্ব ও সাম্রাজ্যপ্রস্তুত জিনিষের আদরের প্রস্তাব করেন, কিন্তু কাজে সাম্রাজ্যের বহু অংশে, এমন কি, বিলাতেই বহুস্থানে ভারত-সন্তানদের অপমান করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক কলহের মীমাংসার জন্য জাতীয় নেতারা সভা ও আলোচনা দ্বারা অবিশ্রান্ত চেষ্টা না করিলে ভারত এত দিনে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইত। কংগ্রেসদল আরও বলেন, ইংলণ্ড ভারতকে দারিদ্র্যের চরমে লইয়া আসিয়াছে এবং বিদেশের সহিত ব্যবসায়ের দেনা-পাওনার হিসাবে বিলাতের ব্যবসায়ের সুবিধাজনক নিয়ম ও ব্যবস্থা করিয়া ইংলণ্ড ভারতকে শোষণ করিবার নব নব উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত আছে। আর ইহার উপরে সেদিন সরকার পার্লামেণ্টের সাতজন সভ্যকে (সাইমন কমিশন) ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা বিচার করিতে পাঠাইয়া ভারতকে যে অপমান করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়দল কংগ্রেসের পতাকার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেস শুধু যে এই সাইমন কমিশনকে চাহে না—তাহা নহে, ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য ইংরাজ সৈন্যদল ভারতে থাকে ইহাও কংগ্রেস চাহে না। ভারতবর্ষের 'উন্নতি'র জন্য ইংরাজের শাসন ও ইংরাজবণিকের শোষণেকংগ্রেস একান্ত বিরোধী। দাস-তৈয়ারীর যন্ত্র স্বরূপ বর্তমান 'শিক্ষা' সে চাহে না। ইংরাজের সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য শ্বেতাঙ্গ সৈন্যের পিছনে বার্ষিক ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে কংগ্রেস অনিচ্ছুক। যে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ইংরাজ এঞ্জিনিয়ার[৩] বলিতে

৩। Sir William Willcocks at the British Indian Association on 7th March, 1928.

বাধ্য হন—গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য কাজ করিয়া অসংলগ্ন ব্যবস্থার দ্বারা ম্যালেরিয়া ও মৃত্যুতে দেশকে ছারখার করিয়া দিতেছে, সেইরূপ জলসেচের জন্য ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করিতে কংগ্রেস অসম্মত এবং যে রেলওয়ে-নীতির ফলে ভারতকে অনাহারী করিয়া ভারতের সামগ্রী বিদেশে সহজে যাইতে পারে এবং বহু শ্বেতাঙ্গ ভারতের অন্নে পুষ্ট হইয়া ভারতীয় যাত্রীর অপমান এবং ভারতীয় ব্যবসায়ের ক্ষতিসাধন করিতে পারে, সেই রেলওয়ের পিছনে কংগ্রেস ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে চাহে না। তাহার পর যে জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) সভায় অনুপাতে অনেক বেশী খরচ দিয়াও ভারতবাসীরা নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা পায় নাই এবং ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক খাজনা জোগাইয়াও লীগের আফিসে ইংরাজের জন্য ২ শত ১৭টি চাকুরী নির্দিষ্ট হইয়াছে ও ভারতীয়দের জন্য মাত্র ২টি রক্ষিত হইয়াছে, কংগ্রেস ভারতকে সে জাতিসঙ্ঘের সভ্য হইতে দিতে চাহে না ; এক কথায় —জাগ্রত ভারত পূর্ণস্বরাজ দাবী করিতেছে। সেজন্য গত ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেস সঙ্কল্প করিয়াছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতালাভই ভারতের একমাত্র লক্ষ্য।

কংগ্রেস ইংলণ্ডকে ভুল সংশোধনের নানাবিধ সুবিধা দিয়াও অবশেষে ইহার ধর্মবুদ্ধি ও রাজনৈতিক শুভদর্শিতা সম্বন্ধে যে নিরাশ হইতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বর্তমান বিবর্ত্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায়। যাহা হউক, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবকে যে কংগ্রেস নিজের অনুসৃত কার্যনীতি বলিয়া নির্ধারিত করে তাহা হইল এই ঃ ভারতের জাতীয় মহাসভার উদ্দেশ্য হইতেছে—বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনপ্রাপ্ত দেশগুলির ন্যায় ভারতে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয়দের সুযোগ সুবিধা পাওয়া। ভারতীয়রা নিজেদের দায়িত্বে অন্যান্য দেশগুলির সমান অধিকার ভোগ

করিবে এবং এই উদ্দেশ্য আইনসঙ্গতভাবে বর্তমান শাসনযন্ত্রের ক্রমিক সংস্কারসাধন করাইয়া জাতীয় একত্বসাধন ও গণবুদ্ধিকে সচেতন করিয়া তাহাদের মানসিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইবে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আরও সংক্ষেপে "ভারতবাসী দ্বারা সকল বৈধ এবং শান্তিসঙ্গত উপায়ে স্বরাজলাভ" এই নীতি মানিয়া লন। আবার ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেও কংগ্রেস ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতালাভই ভারতবাসীর উদ্দেশ্য।

পুনরায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, ভারতের সকল রাষ্ট্রীয় দল 'সাইমন কমিশন' বর্জনের উপলক্ষে একত্র হইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কংগ্রেস আবার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অধিনায়কত্বে লক্ষ্ণৌয়ে 'সর্বদল-সম্মেলন'-এ (All Parties Conference) ভারতের স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করিয়া আবেদন করেন যাহাতে জগতের সকল ন্যায়শক্তি তাহার এই স্বাধীনতা-সমরে একত্রিত হইয়া স্বাধীন ভারত আনয়ন করিতে সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

॥ প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতা ॥

মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা নামক নগরী দুইটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ভারতের ইতিহাস একদল আদিম অধিবাসীকে লইয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। এই আদিম অধিবাসিগণের গাত্রবর্ণ ছিল কাল, চুল কোঁকড়ান, নাসিকা চেপ্‌টা ও শরীর খর্ব। এই সকল আদিম অধিবাসিদের পরাজিত করিয়া আবার একদল কটাচুল ও কটাচক্ষু-বিশিষ্ট শ্বেতকায় অশ্বারোহী মানব সিন্ধু-উপত্যকায় (Indus valley) বাস করিতে আরম্ভ করে। ঐ শ্বেতকায় অশ্বারোহীদলকে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিতে হইত। পাশ্চাত্ত্য মনীষীগণের এবং তাঁহাদের অনুবর্তী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতানুসারে বেদে যে দস্যু, অসুর ও দাস প্রভৃতি জাতির কথা পাওয়া যায় ইহারা সেই আদিম অধিবাসীদেরই মৃতাবশেষ।

মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার ধ্বংসস্তূপ খননের পর হইতে পাশ্চাত্ত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁদের পূর্ব অভিমত পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন—এই খননের ফলে দেখা যাইতেছে যে, 'আরিয়ান'-দের ভারতে আসিবার কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে একটি অতি প্রাচীন সুসভ্য জাতি সিন্দু-উপত্যকায় বাস করিতেছিল এবং ইহারা 'আরিয়ান' ছিল না। আরিয়ানরা প্রকৃতপক্ষে ২০০০-১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের ভিতরে ভারতে আগমন করে এবং সিন্ধু-উপত্যকার ঐ সকল আদিম অধিবাসীদের হয় দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া—না হয় সমূলে উচ্ছেদ করিয়া শস্যশ্যামলা

সিন্ধু-উপত্যকায় বাস করিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঐ অশ্বারোহী আরিয়ানদের নিজেদের কোনপ্রকার সভ্যতা ছিল না ; তাহারা যে-দেশে গমন করিত সেই দেশের সভ্যতাকেই গ্রহণ করিত ।

মহেঞ্জোদড়ো নগরীর আবিষ্কার যেমন আকস্মিক তেমনি অভাবনীয়। মহাবীর আলেকজাণ্ডার মগধরাজের অজেয় সৈন্যবাহিনীর সংবাদে ভীত হইয়া মগধ আক্রমণ (৩২৭-৩২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ) না করিয়াই পশ্চাদপসরণ করেন এবং গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি কয়েকটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। এই সংবাদের সত্যতা যাহাই হউক না কেন এবং পলায়নপর আক্রমণকারী কর্তৃক এইরূপ বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিবার সময় কতটুকু পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্বতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯১৭-১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটি শীতঋতুতে শতদ্রু (Sutlej) ও সিন্ধুর (Indus) শুষ্ক খাত নানাস্থানে পরীক্ষা করিতে থাকেন। এইরূপ পরীক্ষারত থাকার কালে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হরিণ শিকারে বহির্গত হইয়া তিনি লারকানা জেলার গভীর জঙ্গলের ভিতর পথ হারাইয়া ফেলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে মহেঞ্জোদড়োতে উপনীত হন ও চকমকি পাথরের একটি ছুরি দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হন। ঐ স্থানটি যে অতি প্রাচীন, তাহা তিনি অনুমান করেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে মহেঞ্জোদড়োর খনন-কার্য আরম্ভ হয় এবং প্রথমেই তিনি বৌদ্ধস্তূপ হইতে খনন করিতে আরম্ভ করেন। যদিও বৌদ্ধস্তূপটি ১৫০ হইতে ৩০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি এই স্থান হইতে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, সেইস্থানেই একটি অতি প্রাচীন নগর ভূগর্ভে

প্রোথিত রহিয়াছে। তাহার পর যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক-শৃঙ্গধারী জন্তুর মূর্তিও পাওয়া গিয়াছিল। এই মূর্তিটিকে শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'Unicorn' আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত সেই নামেই ঐ জন্তুটি এখনও পরিচিত।

এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ হইতে সুন্দর সমান্তরাল ও সরল বিভিন্ন রাজপথসমন্বিত একটি নগরী আবিষ্কৃত হইল। এই নগরীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত রাস্তাগুলি নগরটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ও আয়তক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। ইষ্টকে নির্মিত ও আবৃত পয়ঃপ্রণালী, বড় বড় স্নানের গৃহ, কূপ ও শৌচাগার নগরীর সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও কৃষ্টির পরিচয় দান করিতেছে।

এই নগরীর অধিবাসীরা সোনা, রূপা ও তামার কাজ জানিত। তাহারা কুলাল-চক্র সাহায্যে মাটির হাঁড়ি, কলসী ও খেলনা প্রভৃতি নির্মাণ করিতে জানিত। শ্রমশিল্প (Industry) ও কারুকার্যে এই নগরীর অধিবাসীরা সে যুগে অদ্বিতীয় ছিল। তাহাদের হস্তলিখিত (ক্ষোদিত হস্তী, গণ্ডার, গরু, কুমীর প্রভৃতি জন্তুর) নিখুঁৎ চিত্রগুলিই শিল্প-দক্ষতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই প্রাচীন নগরীর অধিবাসিগণ তাহাদের লিপিসমূহ (scripts) এক প্রকার চিত্রাক্ষরের (pictograms) সাহায্যে প্রকাশ করিত। এই চিত্রাক্ষরমালার সহিত পৃথিবীর অন্য কোন চিত্রলিপির উচ্চারণ-শব্দের (sound value) সহিত কোনও প্রকার সাদৃশ্য নাই বলিয়া ইউরোপীয় এবং ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের অভিমত।

এই প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি যাহারা করিয়াছিল, তাহাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় লইয়া বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে তাহারা যে 'আরিয়ান' (Aryan) নহে এ বিষয়ে কাহারও

মতভেদ নাই। ইহার কারণ স্বরূপ স্যার জন. মার্শাল বলিতে চান যে, 'আরিয়ানরা' (Aryans) ভারতে ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে আসিয়াছে, সুতরাং তাহারা কিরূপে এই তিন হাজার বৎসরের পুরাতন জাতি হইতে পারে।

সুতরাং বুঝা গেল এই জাতি 'আরিয়ান' নহে। কিন্তু তাহা হইলে ইহারা কাহারা? এই প্রশ্নের উত্তরে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলেন ঃ মহেঞ্জোদড়ো বৈদিক অসুর 'পণি-দের নগরী।' রেভারেণ্ড ফাদার হেরাস্ (Father Heras) বলেন ঃ "এই নগরী দ্রাবিড়দের," এবং অপর অপর পণ্ডিতরা বলিতে চান ইহা সুমেরিয়ানদের (Summarians) নগরী। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নর-করোটি (human skull) পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, সিন্ধু-উপত্যকায় ভূমধ্য-সাগরীয় লোকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর একদল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে ভূমধ্যসাগরীয় লোকেরাই আর্যভাষার বাহক। সুতরাং আর্যভাষাভাষী লোকেরা যে সিন্ধু-উপত্যকায় ছিল না, তাহা বলা যায় না, বরং তাহাদের অস্তিত্বই প্রমাণিত হইয়া থাকে। অতএব নর-করোটি (human skull) পরীক্ষা করিয়া ডক্টর ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অন্যান্য বিচিত্র জাতির লোকের সঙ্গে সঙ্গে আর্যভাষাভাষী লোকেরও অস্তিত্ব পাওয়া যাইতেছে ইহাই ঠিক। প্রকৃতই মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা সীমান্ত-নগরী বলিয়া এই দুইটি নগরীতে বিভিন্নজাতীয় লোকের সমাবেশ হওয়াই স্বাভাবিক। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সিন্ধু-উপত্যকার নাগরিকগণের শব-সৎকার-প্রথারও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই নগরী-সমূহের অধিবাসিগণ তিন প্রকার পদ্ধতিতে শব-সৎকার করিত ঃ (১) সম্পূর্ণ সমাধি ((complete burial), (২) অর্ধদগ্ধ করিয়া সমাধি

(fractional burial) এবং (৩) দগ্ধ করিয়া সমাধি দেওয়া (post-cremation burial)।[১] ডক্টর দত্ত ঋগ্বেদ (১০।১৮।১১, ১০।১৮।১০-১৩,১০।১৬।১), শতপথ-ব্রাহ্মণ (১৩।৮।১-৯), অথর্ববেদ (১৮।৩৬), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (৪।৪।১, ৪।৫।১, ৪।৫।৫-৬, ৪।৫।৭-১০) প্রভৃতি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই তিন প্রকারের শব-সৎকার পদ্ধতি বৈদিক আর্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি বলিয়াছেনঃ "In going through the Vedic literature we find principally two modes of the disposal of the dead: *Anagnidagdha* (without cremation) and *Agnidagdha* (with cremation). As regards the former one it was the custom of complete burial that was in vogue in Rigvedic period (Rv. X. 18. 11). In the Brahaman period of the Vedic age the same custom was in practice, we find reference of each in Satapatha Brahamana (13.8.1-9).[২] সুতরাং তিনি বলিয়াছেন যে, সিন্ধু-সভ্যতায় আর্যদের বিদ্যমানতা অস্বীকার করা যায় না।

নৃতত্ত্ববিদ্ (Anthropologist) ও সমাজতাত্ত্বিকদের (Sociologist) মধ্যে আরও অনেকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার নর-কঙ্কাল ও শব-সৎকার প্রথায় বৈদিক প্রভাব বিদ্যমান আছে। যাহারা দ্রাবিড়ীদের সভ্যতা বলিয়া মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতাকে প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, দ্রাবিড়গণ বিশ্বামিত্রের বংশসম্ভূত।

১। Sir John Marshall : *Mohenjo-daro and Indus Valley Civilization,* Vol. I. pp. 79-81, 89.

২। Foreward to *The Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus, Vol. I.* p. *XXVIII.*

ইহাদের আর এক নাম 'দস্যু'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং মনুসংহিতায় ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা ছাড়া 'দ্রবদিড়ম্-সাম' যাহারা গান করিতেন, তাঁহারাই কালক্রমে 'দ্রাবিড়ম্' হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ আবার 'পণি' বা বৈদিক 'অসুর'-কে অবৈদিক জাতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চান। প্রকৃতপক্ষে 'পণি'-রা বৈদিক সমাজেরই লোক। 'পণি'-রাই সমাজের বৈশ্যশ্রেণী এবং ইহারাই বর্তমানে বণিক্ নামে পরিচিত। 'পণি'-র 'প' স্থানে 'ব' আদেশ হইয়া 'বণিক্' হইয়াছে। এখনও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় 'পণ্য' 'পণ' 'আপণ' 'আপণিক' 'বিপণি' ও 'কার্ষাপণ' প্রভৃতি শব্দ 'পণি' এবং 'বণিক' শব্দ দুইটির একত্ব প্রমাণ করিতেছে।

সুমেরিয়ানগণ গর্দভবাহিত গাড়ীতে চড়িত; কিন্তু সিন্ধু-উপত্যকায় গর্দভের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সুমেরিয়ান সভ্যতা যে মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতারও অনেক পরবর্তীকালের—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুমেরিয়ানগণের জাতীয় ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায়, তাহারা 'পূর্বদেশ' হইতে গিয়াছে। অতএব ইহা অনুমান করা যায় যে, সুমেরিয়ানগণ মহেঞ্জোদড়ো হইতেই সুমেরিয়ায় (Summaria) গিয়াছিল এবং সেখানকার সভ্যতা ও কৃষ্টির সমবায়ে নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

স্যার জন্. মার্শাল ও তাঁহার অনুবর্তিগণ সিন্ধু-সভ্যতায় বৈদিক দেবতাদের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পান নাই। সেইজন্য তাঁহারা মনে করেন যে, এই সমস্ত দেবতা দ্রাবিড়দের; কেননা মহেঞ্জোদড়োর খননে নাকি দ্রাবিড়দের বৃক্ষ, প্রস্তর, লিঙ্গ ও যোনি প্রভৃতি পূজার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখিয়াছি দ্রাবিড়গণ আর্যদেরই একটি শাখা মাত্র; সুতরাং তাহাদের ধর্মে নিশ্চয়ই বেদের প্রভাব লক্ষিত হইবে। যাঁহারা আবার বলেন যে, বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতির

উপাসনা অবৈদিক, আমাদের মনে হয় বৈদিক উপাসনা সম্বন্ধে তাঁহারা অতি অল্পই জানেন, কারণ বেদে বৃক্ষ ও পর্বতের উপাসনার উল্লেখ স্পষ্টই দেখা যায়। বেদে বৃক্ষকে বলা হয় 'বনস্পতি'। 'বন' শব্দের অর্থ 'জ্যোতি', সুতরাং 'বনস্পতি' শব্দের অর্থ 'জ্যোতির্বৃক্ষ' হওয়াই সঙ্গত। আবার প্রস্তর-উপাসনা পর্বত-উপাসনা হইতে আসিয়াছে এবং বৃক্ষকে যে কারণে 'জ্যোতির্বৃক্ষ' বলা হয় ঠিক সেই কারণেই মেরুগিরির কল্পনা করা হইয়াছে। ইহারা উভয়েই কিন্তু সূর্যেরই কল্পিত আসন। 'শিবলিঙ্গ' নামে অভিহিত কোণাকৃতি (conical) পদার্থসমূহ মেরুগিরিরই প্রতীক মাত্র। সুতরাং বৃক্ষ ও প্রস্তর-উপাসনা বৈদিক আর্যদের মধ্যেও ছিল বলিয়া জানা যায় এবং মহেঞ্জোদড়োর বৃক্ষ ও প্রস্তর উপাসকগণের মধ্যে যে আর্যরা উপস্থিত ছিলেন না, তাহা বলা যায় না। বরং বর্তমান ভারতে পর্বতশৃঙ্গের মত যে সমস্ত শিবলিঙ্গ উপাসিত হয়, তাহারা বৈদিক পর্বতোপাসনারই প্রতীক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই সকল প্রতীক শিশ্নোপাসনার নিদর্শন নহে।

'শিব' ও 'শিবলিঙ্গের' উপাসনার প্রচলন যে, সিন্ধু-উপত্যকায় ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই—'শিব' কে? তন্ত্রে শিবের বীজমন্ত্র দেওয়া আছে এবং তাহা হইতে জানা যায় 'শিব' বৈদিক সূর্যেরই ছদ্মরূপ। এই শিব বাস করেন আবার হিমালয়-শিখরে; সুতরাং এই দিক দিয়াও বলা যায় যে, মেরুগিরিতে অবস্থানকারী 'সূর্য' এবং কৈলাস-শিখরবাসী 'শিব' একই। শিবলিঙ্গ মেরুগিরি বা কৈলাস-শিখরেরই প্রতীক মাত্র।

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত একটি সীলে (Seal) অঙ্কিত আছে— নারী-মূর্তির জনন-যন্ত্র হইতে বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই নারী পৃথিবীরই প্রতিকৃতি। বেদে ইহাকেই 'অদিতি' বলা হইয়াছে। তাহার পর এই বৃক্ষও 'জ্যোতির্বৃক্ষের'-ই প্রতীক এবং এই বৃক্ষের উপর

আরোহণ করিয়াই সূর্য পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন—ইহাই কল্পিত হইয়া থাকে। এই নারীমূর্তি অথবা 'অদিতি'-র কল্পনা হইতেই গৌরীপট্ট-সংযুক্ত শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা বলিতে পারা যায়। তবে এই শিবলিঙ্গে বৃক্ষের গুঁড়িটাই (trunk) মাত্র দেখানো হইযাছে এবং ইহা যেন যোনি বা পৃথিবী হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে। লিঙ্গপুরাণে এই শিবলিঙ্গকেই 'সুরতরু' বলা হইয়াছে; যেমন 'তস্মাৎ লিঙ্গং সুরতরুং স্থাপয়েৎ।'

সিন্ধু-উপত্যকায় স্তম্ভ এবং তাহার মাথার উপরে পক্ষী—এরূপ প্রতীকও পাওয়া গিয়াছে। বেদে এই প্রকার স্তম্ভের উল্লেখ আছে এবং তাহাকে 'যূপ' বলা হয়। যূপ-উপাসনা এখনও হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে; যেমন বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ইহার ব্যবহার রহিয়াছে। গরুড়চিহ্নিত স্তম্ভ এখনও ভারতের বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে 'গরুড়ধ্বজ' অথবা 'গরুড়স্তম্ভ' বলে। ইহা কিন্তু সিন্ধু-নগরীর 'পক্ষীস্তম্ভে'রই বর্তমান রূপ। বেদে 'শ্যেন'-পক্ষীরূপী সূর্যের উপাসনা বিহিত আছে। এই শ্যেনই বর্তমানে 'গরুড়' নামে পরিচিত; সুতরাং স্তম্ভ এবং পক্ষীসংযুক্ত স্তম্ভ যে বৈদিক প্রতীক তাহা অনুমিত হয়।

'যূপ' নামক বৈদিক স্তম্ভ আবার নানা আকারের ছিল। ইহাদের অনেকগুলি অষ্টকোণযুক্ত; (octagonal) এবং কতকগুলি গোলাকার। অষ্টকোণবিশিষ্ট যূপের আবার তিনটি অংশ ছিল; যেমন, (১) মাটির নীচে চতুষ্কোণ, (২) মধ্যে অষ্টকোণ, (৩) শীর্ষে গোলাকার। গোলাকার স্তম্ভগুলি হইতে পরবর্তীকালে গরুড়ধ্বজ, কপিধ্বজ, বৃষভধ্বজ, সিংহধ্বজ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই সকল বৈদিক স্তম্ভই আবার বৌদ্ধযুগে সম্রাট অশোক তাঁহার অনুশাসন-লিপিসমূহ (Inscriptions) ক্ষোদিত করিবার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া

মনে হয়। তাহার পর ইহাও অনুমিত হয় যে, যে সকল স্থানে এই স্তম্ভসমূহ বর্তমান আছে, বুঝিতে হইবে সেইস্থানে কোনও সময়ে সুরম্য হিন্দুমন্দির ছিল এবং সহস্র সহস্র পূজার্থী নরনারী সেই স্থানে সমবেত হইত; এবং সেইজন্যই বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণের উদেশ্যে ঐ সকল জনবহুল স্থানের স্তম্ভে অশোক তাঁহার অনুশাসনলিপি ক্ষোদিত করাইয়াছিলেন।

শিবলিঙ্গগুলির মধ্যে কতকগুলি অষ্টকোণবিশিষ্ট শিবলিঙ্গও আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রদ্ধেয় গোপীনাথ রাও তাঁহার *Hindu Iconography*-তে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, এই শিবলিঙ্গের নিম্নতম অংশ চতুষ্কোণ এবং তাহা ব্রহ্মভাগ, মধ্য-অংশ অষ্টকোণ এবং তাহা বিষ্ণুভাগ এবং শীর্ষদেশ ত্রিকোণ এবং তাহা শিবভাগ। সুতরাং বেদের অষ্ট-কোণযুক্ত যূপ ও পরবর্তী অষ্টকোণবিশিষ্ট শিবলিঙ্গে মূলতঃ কোনও প্রভেদ নাই। অষ্টকোণযুক্ত যূপ কিন্তু বৃক্ষের প্রতীকরূপেই ব্যবহৃত হইত। সেজন্য অষ্টকোণ-সমন্বিত যূপ হইতে উদ্ভূত অষ্টকোণযুক্ত শিবলিঙ্গ ও বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন শিবলিঙ্গ একই। এই দুই প্রকার শিবলিঙ্গের সহিত অদিতির প্রতীকরূপ গৌরীপট্ট সংযুক্ত আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে মনে হয় শিবলিঙ্গ বৈদিক (১) বৃক্ষো-পাসনায় 'জ্যোতির্বৃক্ষে'র প্রতীক, অথবা (২) পর্বতোপসনায় 'মেরুগির'-র প্রতীক', অতএব বলা যায়, শিবলিঙ্গের উপাসনা বৈদিক বৃক্ষ বা গিরি উপাসনারই নামান্তর। আর সেজন্যই ইহা যে বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে ইহা অনুমান করা অসমীচীন নহে। তাহার পর ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতায় বৈদিক আর্যদের কৃষ্টির প্রভাব বড় কম ছিল না।

মহেঞ্জোদড়োয় পরশু-র উপাসনাও (Axe-cult) প্রচলিত ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। বেদে যেমন 'হিরণ্যশৃঙ্গ' সূর্য বা সাপের

কথা পাওয়া যায়, সিন্ধু-উপত্যকায় তেমন দেবতা ও উপাসকদের মাথায় শৃঙ্গের উল্লেখও আমরা দেখিতে পাই[৩] যদিও তাহা রূপকে বর্ণিত আছে। একশৃঙ্গ জন্তুটিই (Unicorn) তাহার নিদর্শন।

সুতরাং এই সব দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় সিন্ধু-সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার যোগসূত্র নষ্ট হয় নাই। তাহা ছাড়া সিন্ধু সভ্যতার উপাসনাপ্রণালী ও উপাস্যের প্রতীক সমূহ হইতে অনুমান করা যায় যে, বৈদিক আর্যগণই সিন্ধু-সভ্যতার মূল প্রবর্তক এবং সিন্ধু-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বৈদিক আর্যদেরই সভ্যতা ও সংস্কৃতি।

এক্ষণে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যদি আর্যদিগের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে ১৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে 'আরিয়ান' (Aryans) নামক যে জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহারা কাহারা? বেদে আমরা দেখিতে পাই 'আর্য' শব্দের দ্বারা 'ভদ্র' 'পূজ্য', 'সভ্য' (civilized) প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে এবং ইহা হইতে বুঝা যায় বৈদিক আর্যগণ 'সভ্য'জাতি ছিলেন। কিন্তু 'আরিয়ান' (Aryans) নামক জাতি মহা-অসভ্য ও বর্বর অবস্থায় ভারতে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়দেশীয় ঐতিহাসিক মনীষীগণের অভিমত। সুতরাং এই সম্পূর্ণ বিপরীত কৃষ্টিসম্পন্ন দুইটি জাতি কখনও এক হইতে পারে না; অর্থাৎ 'আরিয়ান' (Aryans) শব্দাদ্বারা বৈদিক আর্যকে মোটেই বুঝায় না।

তাহা ছাড়া আমরা দেখিতে পাই, যে-উপাসনাপ্রণালী বেদে ছিল এবং মহেঞ্জোদড়োতেও প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও বর্তমান হিন্দুসমাজের ভিতরে রহিয়াছে; অতএব বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত

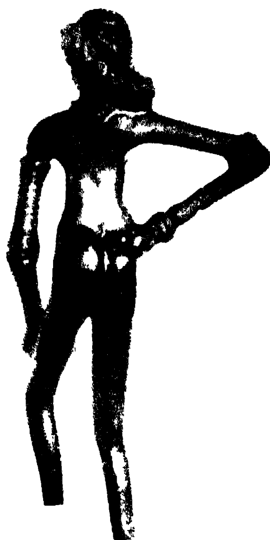
৩। দেবতার মস্তকে যেমন শৃঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, পূজাকালে তেমনি উপাসকগণের শৃঙ্গযুক্ত মুকুট পরিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা কখনও ব্যাহত হয় নাই। যদি 'আরিয়ান' (Aryans) বলিয়া কোনও জাতি সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতাকে উচ্ছেদ করিয়া ভারতে বাস করিত, তাহা হইলে অবশ্যই বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ধারা কখনই অবিচ্ছিন্ন থাকিত না। সেজন্য এই বর্বর অসভ্য 'আরিয়ান'-রা (Aryans) যে আমাদের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ। বরং এই অসভ্য 'আরিয়ান' (Aryans) জাতি আর্য-সমাজেরই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইল যে, আমরা ভারতবাসী কখনই এই আগন্তুক 'আরিয়ান'-দের বংশধর নহি; আমরা সিন্ধু-সভ্যতার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির স্রষ্টা আর্যদেরই বংশধর। সভ্যতাসমৃদ্ধ মহেঞ্জোদড়ো নগরী যে ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার কারণ অনাবৃষ্টি এবং সিন্ধুনদীর গতির পরিবর্তন। বৃষ্টিপাত কমিয়া যাওয়াতে ঐ স্থানটি কৃষিকার্যের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেইজন্যই মহেঞ্জোদাড়ো অধিবাসিগণ দলে দলে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে গোচারণ ও কৃষিকার্যের অনুকূল স্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর এইভাবে অধিবাসীদের দ্বারা ক্রমশঃই পরিত্যক্ত হইয়া মহেঞ্জোদড়ো গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ ও মৃত্তিকা প্রোথিত হইয়াছিল। যাহারা সর্ব-প্রথমে সিন্ধু-উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণই একণে দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে বাস করিতেছে। সেইজন্যই দক্ষিণ-ভারত ও পূর্ব-ভারতে এই দুই স্থানের অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যও বহুলাংশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পাটনা কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সুবিমল সরকার মহাশয় বলেন—কিছুদিন পূর্বে পাটনার সরকারী দপ্তর-খানার পশ্চাদ্‌ভাগে প্রায় ত্রিশ ফুট গভীর একটি খাদ খনন করা

শিয়াছিল। সেই খাদ হইতে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাপ্ত মাটির মূর্তির ন্যায় অনেক-গুলি মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মূর্তির অনেকগুলি এখনও পাটনা মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে। ডক্টর সরকারের অভিমত যে, প্রতি একফুটে একশত বৎসর করিয়া ধরিলেও এই মূর্তিগুলির বয়স তিন-হাজার বৎসরের কম হইবে না। সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে, এখন হইতে তিনহাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১১০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে একদল লোক সেইস্থানে নিশ্চয়ই বাস করিত যাহাদের ভিতর সিন্ধু-উপত্যকার সংস্কৃতির প্রচলন ছিল। ত্রিবাঙ্কুরেও একটি খাদ খনন করিবার সময় সিন্ধু-উপত্যকার অনুরূপ শব-সৎকারপ্রথার নিদর্শনসমূহও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব-ভারতবাসীরা যে একই দলের লোক ছিল—এ সিদ্ধান্তই ইহাতে সমর্থিত হয়।

পরিশেষে ইহাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, মহেঞ্জোদড়ো বা হারাপ্পা নগরীদ্বয় ধ্বংস হইয়া গেলেও তাহাদের আর্য ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতির এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; বরং তাহাই নূতন নাম ও রূপে বর্তমান হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে বিদ্যমান রহিয়াছে।









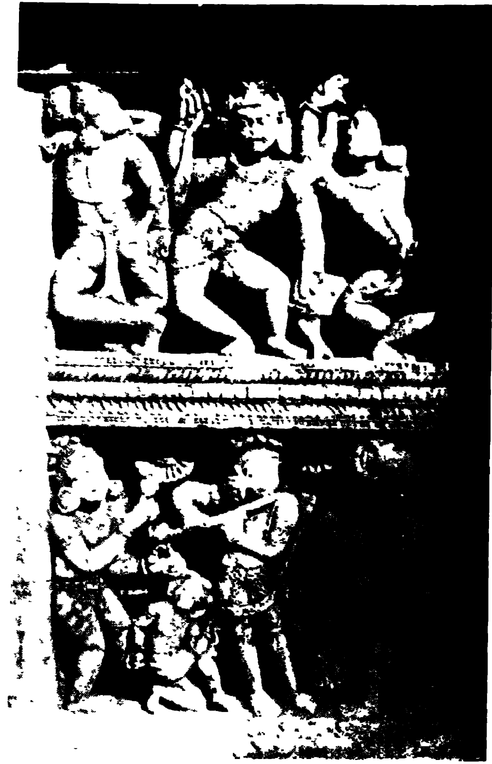
শিবের ভৈরবমূর্তি
তামসিক
(এলিফেণ্টা)
৮ম শতাব্দী



নটভৈরব
(কোনার্ক)







বৃন্দবাদ্য ও নৃত্য
(ভুবনেশ্বর)



নৃত্য-সরস্বতী
(হালেবিদ্)

কাশ্মীর ও তীব্বতে

স্বামী অভেদানন্দ

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে চিররহস্যাবৃত এবং চিরতুষারাবৃত তিব্বতের পথে স্বামীজীর ভ্রমণ-কাহিনী। সিন্ধুনদের তীর দিয়ে বহু পথ চড়াই-উৎরাই অতিক্রম ক'রে অবশেষে লামাদের দেশে হাজির হয়েছেন। আড়ম্বর-শূন্য এমনি সহজ সাবলীল বর্ণনা যে, মনে হয় আমরাও স্বামীজীর সঙ্গী হয়ে সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চলেছি! তিব্বতের ও কাশ্মীরের ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, লামাদের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, আহার-বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা এবং কয়েকটি প্রয়োজনীয় তিব্বতী ভাষায় বাংলা প্রতিশব্দ এই পুস্তকে আছে।

হিমিস্ গুম্ফায় গুপ্তভাবে রক্ষিত আছে যিশুখৃষ্টের অপ্রকাশিত জীবনের ঘটনাবলী। যীশুখৃষ্ট যে সিন্ধুদেশ হয়ে এ দেশে পুরী ও কাশীতে গিয়ে বেদ, বেদান্ত অধ্যয়ন করে মন্দির প্রবেশের হরিজনদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন এবং তারপর পুনরায় ক্রুশবিদ্ধ হবার পর কবর থেকে উঠে তিব্বতে এসে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন তাহা স্বামীজী তিব্বতীভাষা হ'তে অনুবাদ ক'রে দেখিয়েছেন এই পুস্তকে। পরিশিষ্টে নিকোলাস নাটোভিচের "The Uuknown Life of Jesus Christ" এই দুষ্প্রাপ্য বইখানি হ'তেও কতকাংশ উদ্ধৃত আছে সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য : পাঁচ টাকা।

॥ অর্চনা ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যান, আরতির স্তোত্র।

মূল্য : ছয় নয়া পয়সা।